সৌরভ

নাই:

১/৬, চৈত্র ১৩১৯

১/৭, বৈশাখ ১৩২০

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

প্রথম বর্ষ

কার্ত্তিক ১৩১৯ হইতে আশ্বিন ১৩২০।

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

PUBLISHED FROM.

RESEARCH HOUSE—MYMENSINGH.

সূচী

চিত্র-সূচী।

লেখকগণের নাম।

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম. এ. বি. এল.
২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি
৩। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় বি. এল.
৪। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম. এ বিএল.
৫। ,, অবিনাশচন্দ্র রায়
৬। ,, অমরচন্দ্র দত্ত
৭। শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা
৮। মৌলবী আবদুল করিম
৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ. বি. এল.
১০। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
১১। শ্রীমতী কুলদা দেবী
১২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত সেন চৌধুরী
১৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ
১৪। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস
১৫। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন
১৬। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়
১৭। " জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত
১৮। " জলধর সেন
১৯। " জিতেন্দ্রনাথ খাঁ
২০। " জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
২১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম. এ.
২২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা
২৩। রাজা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি. এ.
২৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২৫। " নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
২৬। " পরমেশপ্রসন্ন রায় বি.এ.
২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ.
২৮। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
২৯। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

৩০। শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
৩১। " বিরজাকান্ত ঘোষ বি. এ.
৩২। " বীরেশ্বর সেন
৩৩। ৺ মনোমোহন সেন
৩৪। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৩৫। " যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি. এ.
৩৬। " যদুনাথ সরকার
৩৭। " যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি. এ., এফ. আর এইচ্. এস.
৩৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৪০। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৪১। " রমণীমোহন ঘোষ বি.এল.
৪২। " রসিকচন্দ্র বসু
৪৩। " রামপ্রাণ গুপ্ত
৪৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বিদ্যাভূষণ
৪৫। শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ এম. এ. বিএল.
৪৬। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
৪৭। রাজা শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ সিংহ
৪৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি এম. এ.
৪৯। শ্রীযুক্ত শুধাংশুকুমার চৌধুরী
৫০। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
৫১। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী
৫২। শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ
৫৩। কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি. এ.
৫৪। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত
৫৫। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত
৫৬। " হৈমবতী দেবী
৫৭। সম্পাদক—প্রভৃতি

—•—

ASUTOSH PRESS, DACCA.

মর্ম্মরশৈল—নর্ম্মদা, জব্বলপুর।

সৌরভ।

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩১৯ সাল। { ১ম সংখ্যা।

আভাষ।

ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজের অন্তরে অন্তরে থাকিয়া যে দেবী সাহিত্য-চর্চ্চার প্রেরণা করিতেছেন, আমরা তাঁহারই আদেশ শিরোধার্য্য এবং তাঁহারই কৃপা ভরসা করিয়া আগমনীর আনন্দ উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে এই "সৌরভ" লইয়া উপস্থিত হইলাম। বঙ্গ-সাহিত্য-কাননে বহু কুসুম বিকশিত হইয়াছে; কত কুসুম সৌরভ বিতরণ করিতেছে। এ কুসুম ক্ষুদ্র এবং ইহার সৌরভ স্বল্প হইতে পারে, কিন্তু ভরসা— সরস্বতী অকিঞ্চনকে কখনও উপেক্ষা করেন না।

সাহিত্য জাতীয় জীবনে এক নব-শক্তি সঞ্চার করে। প্রকৃতির শিক্ষা এবং লৌকিক শিক্ষা সাহিত্যের প্রধান সহায়। ময়মনসিংহের প্রকৃতি সাহিত্য চর্চ্চার অনুকূল। যবুনা এবং ব্রহ্মপুত্র প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় ময়মনসিংহের পরিচর্য্যা করিতেছে; মেঘনার নীলাম্বু কত গভীর ভাব জাগাইয়া থাকে। উত্তরে উন্নত শৈলমালা, দক্ষিণে নিবিড় অরণ্যানী— ময়মনসিংহের অপূর্ব্ব শোভা এবং সম্পদ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে চন্দ্রকান্ত এবং আনন্দমোহন—দুই উচ্চ গৌরব-স্তম্ভ। প্রাচীন সাহিত্যিকগণের জীবনী ময়মনসিংহের এক অধ্যায়কে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইঁহাদিগের পুণ্য-স্মৃতি শিক্ষিত সমাজকে সাহিত্যের অনুশীলন জন্য নিয়ত আহ্বান করিতেছে। তাঁহাদের আহ্বান অবহেলা করিবার উপায় নাই।

সরস্বতীর বীণা ঝঙ্কারের এ অতি উত্তম স্থান। সাহিত্যে ইহার গৌরব করিবার অনেক আছে; সাহিত্য-সম্মিলনের বিরাট অধিবেশনে তাহা

প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা সেই সম্মিলন-ক্ষেত্রে সাহিত্য এবং ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব এবং জীবন-চরিতে বাণীর যে কৃপাকণা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, উহা হইতেই সৌরভের উদ্ভব।

ময়মনসিংহে সাহিত্য চর্চ্চার জন্য একটী সুহৃদ সমাজের প্রতিষ্ঠা, সৌরভের অন্যতম উদ্দেশ্য। এক-প্রাণ এক-নিষ্ঠ একটী সুহৃদ সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যের উন্নতি একসূত্রে গ্রথিত। কাব্যই হউক, আর ইতিহাসই হউক, দর্শনই হউক, আর বিজ্ঞানই হউক, ভাবের বিনিময় না হইলে হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হয় না, তত্ত্বের অনুসন্ধান হয় না, এবং সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট হইতে পারে না। সাহিত্যের সৌরভে, ময়মনসিংহের সাহিত্যসেবকগণ যদি সমবেত হইতে পারেন, তাহা হইলে উহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?

ময়মনসিংহ জেলা বিস্তৃত, জনসংখ্যা অগণ্য, ইহার ঐশ্বর্য্য প্রচুর। "সৌরভের" প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য-চর্চ্চার যে উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা সফল হইলে আমরা আমাদের যত্ন সার্থক জ্ঞান করিব।

রামায়ণী সমাজ

রাজা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্।
রাজা মাতা পিতাচৈবরাজা হিতকরোনৃণাম্ ॥৩৪

অযোধ্যাকাণ্ড - ৬৭ সর্গ

হিন্দুর হৃদয়ে রাজা মাতা, পিতা এবং দেবতা স্বরূপ। রাজার প্রতি হিন্দু নরনারীর এইরূপ ভক্তি-বিশ্বাস হিন্দু-সভ্যতার উন্মেষ কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। রামায়ণী যুগে হিন্দু নরনারী প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতেন— "রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই মানীর সম্মান; রাজাই সকলের পিতা, রাজাই সকলের মাতা এবং রাজাই সকলের হিতকারী।"

"রাজা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্।
রাজা মাতা পিতাচৈব রাজা হিত করোনৃণাম্।"

মধ্যযুগে জর্ম্মনী প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও রাজ-দেবত্বের ভাব প্রবল হইয়াছিল। সার্লেমান ও পেপিন প্রভৃতি সম্রাটগণ আপনা-দিগকে দেবতার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চ-সম্মানে বিভূষিত করিয়া গিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইউরোপীয় ফিউডাল প্রথার

অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়দিগের মন হইতে রাজার প্রতি দেবত্ব ভাবের স্পৃহা উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দুর মনে রাজার প্রতি ভক্তি এবং বিশ্বাস আজ পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজিত আছে।

রামায়ণী যুগে রাজার প্রতি প্রজার ভাব ও প্রজার প্রতি রাজার ভাব কিরূপ আদর্শ স্থানীয় ছিল, তাহা রামায়ণ হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

রামায়ণে রাজার সংজ্ঞা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

> ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ কালে যস্তু নিষেবতে।
> বিভজ্য সততং বীর স রাজা হরিসত্তম ॥২১ (কিষ্কিন্ধ্যা—৩৮সর্গ)

যিনি ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে সময়োচিত সেবা করিয়া থাকেন তিনি রাজা। ইহার মধ্যেও যিনি—

> অমিত্রাণাং বধে যুক্তো মিত্রাণাং সংগ্রহে রতঃ।
> ত্রিবর্গ ফল ভোক্তাচ রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥২৩ (কিষ্কি—৩৮)

"যে রাজা শত্রু বধ ও মিত্র বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃত সময়ে এই ত্রিবর্গ—(ধর্ম্ম-অর্থ-কাম) উপভোগ করেন তিনিই ধার্ম্মিক রাজা।"

রাজার কতকগুলি সাধারণ গুণ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। সেগুলি—শম, দম, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বল, বিক্রম ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান। এইগুলি রাজোচিত গুণ। (১) হিন্দুর শাস্ত্র রাজাকে পঞ্চদেবতার স্বরূপ জ্ঞানে তাঁহাকে পঞ্চ প্রকৃতির বা উপাদানের আশ্রয় স্থল বা আধার বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা—অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ এই পঞ্চদেবতার স্বরূপ; সুতরাং রাজাতে অগ্নির উগ্রতা, ইন্দ্রের বিক্রম, চন্দ্রের স্নিগ্ধতা (দয়া), যমের নিগ্রহ (পাপীর দণ্ড বিধান) এবং বরুণের প্রসন্নতা এই পঞ্চগুণও বিদ্যমান আছে। (২) এই দেবগুণ সমূহের অস্তিত্ব হেতু রাজাকে মনুষ্যরূপী দেবত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

---

(১) অন্যত্র—সাম দানং ক্ষমা ধর্ম্মঃ সত্যং ধৃতিপরাক্রমৌ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ॥২৯—১৭—কিষ্কিন্ধ্যা।

(২) পঞ্চরূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ।
অগ্নেরিন্দ্রস্ত সোমস্ত যমস্ত বরুণস্ত চ ॥ ১২
ঔষ্ণ্যং তথা বিক্রমঞ্চ সৌম্যং দণ্ডং প্রসন্নতাম্।
ধারয়ন্তি মহাত্মানো রাজানঃ—ইত্যাদি—আরণ্য ৪০।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও রাম আহত বালীকে বলিতেছেন—

দুর্লভস্য চ ধর্মস্য জীবিতস্য শুভস্য চ।
রাজানো বানরঃশ্রেষ্ঠ প্রদাতারো ন সংশয়ঃ॥
তান্নহিংস্যান্নচাক্রোশেন্নাক্ষিপেন্নাপ্রিয়ং বদেৎ।
দেবা মানুষরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে। ৪০—১৮ সর্গ

"রাজারা দুর্লভ ধর্ম্ম এবং কল্যাণকর জীবন দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে হিংসা, নিন্দা এবং অপমান করা অথবা অপ্রিয় কথা বলা, কদাপি উচিত নহে। দেবতারাই মনুষ্য বেশে রাজা রূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।"

হিন্দু, রাজাকে কেবল দেবতার স্বরূপ বলিয়াই মনে করেন নাই। দেশের সমস্ত ধন রত্নের স্বামিত্বও রাজাতে অর্পণ করিয়াছেন। হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস রামায়ণ—হিন্দুকে রাজভক্তি সম্বন্ধে এইরূপ মহীয়ান্ উপদেশই প্রদান করিয়া গিয়াছে।

হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস রামায়ণ রাজাকে শুধু দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই যে ক্ষান্ত রহিয়াছে তাহাও নহে। রাজার বহু গুরুতর কর্ত্তব্যও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

রাজা কেবল বসুন্ধরা ভোগ করিয়াই যাইবেন না। প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রতিও তাহার গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। যিনি লোক রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন—প্রজা রক্ষার্থে তাঁহাকে কি নৃশংস, কি পাপকর, কি অপযশস্কর, —সকল কার্য্যই করিতে হইবে। (৪)

আরণ্য কাণ্ডে মুনিগণ সমবেত হইয়া রঘুনন্দন রামকে বলিতেছেন—রাজা যেমন সতর্কতার সহিত স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিবেন, তাহা অপেক্ষাও অধিক সতর্কতার সহিত পুত্রোপম প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষায় যত্নবান হইবেন। তাহা হইলেই তাঁহার যশঃ ও কীর্ত্তি অবিনশ্বর হইবে। এবং তিনি অন্তে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া সম্মানিত হইবেন। (৫)

রাজাকে প্রতিদিন রীতিমত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। মনুষ্য পাপাচরণ করিয়া রাজদণ্ড ভোগ করিলে পাপ-মুক্ত হয়। কিন্তু রাজার ত্রুটীতে পাপী অব্যাহতি লাভ করিলে সে পাপীর পাপ রাজাকে স্পর্শ করিয়া থাকে। (৬) রাজা ঐ যথার্থ পাপীর পাপ-স্বভাবের জন্য পুনঃ পুনঃ

(৪) আদি ২৫ সর্গ। (৫) আরণ্য—৬ সর্গ। (৬) কিষ্কিন্ধ্যা ১৮ সর্গ।

ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং পাপীর দণ্ডবিধান এবং নিরপরাধের রক্ষা বিধান, রাজার প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য।

রাজার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মে মতিমান হওয়া প্রয়োজন।

পক্ষিরাজ জটায়ু সীতাহরণ-পরায়ণ রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

অর্থং বা যদি বা কামং শিষ্টাঃ শাস্ত্রেষণাগতম্।
ব্যবস্যন্ত্যনু রাজানং ধর্ম্মাং পৌলস্ত্যনন্দন॥ ৯ (আরণ্য—৫০)

"হে পৌলস্ত্য নন্দন, শিষ্ট প্রজারা শাস্ত্র-সঙ্গত ধর্ম্ম অর্থ বা কাম সম্পাদন কার্য্যে রাজার অনুকরণ করিয়া থাকেন।"

রাজা ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ দ্রব্যাণাঞ্চোত্তমো নিধিঃ।
ধর্ম্মং শুভং বা পাপং বা রাজমূলং প্রবর্ত্ততে॥ ১০

"রাজা সর্ব্ব বিষয়ে নিধি স্বরূপ এবং প্রজাদিগের পক্ষে ধর্ম্ম ও কাম বিষয়ে আদর্শ স্বরূপ—এরূপ স্থলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রাজার দৃষ্টান্তানুসারেই আচরিত হইয়া থাকে। সুতরাং রাজার পক্ষে ধার্ম্মিক ও সংযত-কামী হওয়াই উচিত।

প্রজাকে সুখে রাখাই রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং রাজ্য শাসনের মূল মন্ত্র। কিরূপ আদর্শে প্রজা পালন ও রাজ্য শাসন করিলে রাজার ধনাগার পূর্ণ থাকিবে, প্রজাও নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিবে, এইরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ রামায়ণে প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা যথা সময়ে তাহার বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। এস্থলে রামের প্রতি দশরথের একটী মাত্র উপদেশের উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন—

"পুত্র, তুমি স্বভাবতঃ অতিশয় গুণবান হইয়াছ। তথাপি তোমার মঙ্গল কামনায় আমি আরও দুই একটী কথা বলিতেছি। তুমি আরও বিনয় অবলম্বন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইবে, তুমি কাম ক্রোধ জনিত সর্ব্বপ্রকার ব্যসন পরিত্যাগ করিবে। তুমি দূত দ্বারা রাজ্যের প্রকৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া অমাত্য এবং প্রজাবর্গকে অনুরক্ত রাখিবে। যে নরপতি ধনাগার ও অস্ত্রাগার পূর্ণ রাখিয়া প্রকৃতিবর্গকে অনুরক্ত রাখিতে পারে, তাহার সেই অনুগত প্রজাগণ বা মিত্রগণ (মিত্রাণি) সুরগণের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে আনন্দ

ভোগ করিয়া কাল যাপন করে। সেই রাজার অধীন থাকিয়া তাহাদের কোন বিষয় চিন্তা থাকে না। সুতরাং বৎস, তুমি ঐরূপ আচরণ করিবে, যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জ তোমার চিরানুগত থাকে।”

বাস্তবিক যে রাজা ধর্ম্মানুসারে আপনার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেন, তিনি প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মভাগী হন। সুশাসন ও কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁহার যশঃ ও প্রশংসা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। আরণ্যকাণ্ডে মুনি ঋষিগণও এই অর্থে রামকে বলিয়াছেন--

যৎকরোতি পরং ধর্ম্মং মুনির্মূল ফলাশনঃ।
তত্ররাজ্ঞশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষতঃ। ১৪ (আরণ্য ৬ষ্ঠ সর্গ)

অন্যত্র—অধীতস্য চ তপ্তস্য কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য চ।
ষষ্ঠং ভজতি ভাগন্তু প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্। ৩১ (উত্তরা—৮৭ সর্গ)

প্রাচীন ভারতে রাজা দেবতাস্বরূপ ছিলেন বটে কিন্তু প্রজা উপেক্ষণীয় ছিলেন না। তখন প্রজার ইচ্ছায় রাজা মনোনীত হইতেন। রাজকার্য্য এবং রাজ্য-শাসন ও প্রজার সম্পূর্ণ স্বার্থ এবং সুবিধা অনুসারে পরিচালিত হইত। প্রজা যেমন রাজাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিতেন, রাজাও সেইরূপ প্রজা কর্ত্তৃক দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উপযোগী নীতিপরায়ণ ও সৎবিচারক হইয়া সুনিয়মে কার্য্য করিতেন। তখন প্রজার প্রতি রাজার যেমন বিশ্বাস ছিল, রাজার প্রতি এবং তাহার অমাত্যগণের প্রতিও প্রজার সেইরূপ বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল। তখন রাজা প্রজা সকলেই একধর্ম্মের অনুশাসনে শাসিত হইতেন। প্রজা সমৃদ্ধিশালী হইলে রাজ্যের মঙ্গল, ইহা রাজা যেমন বিশ্বাস করিতেন, রাজকোষ পূর্ণ থাকিলে প্রজাপুঞ্জের সুখ, ইহা প্রজাপুঞ্জও তেমনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন। এইরূপ নিয়মে রাজ্য শাসন পরিচালিত হইলে, তাহা আদর্শ শাসন হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি শাসন এইরূপ আদর্শ নিয়মে পরিচালিত হইত। প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনার্থে রাজা স্বীয় প্রিয়তম পুত্র (১) এবং অর্দ্ধাঙ্গিনী ভার্য্যা প্রভৃতিকেও দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ দৃষ্টান্তও রামায়ণে বিরল নহে।

---

(১) অযোধ্যাকাণ্ডে অসমঞ্জের বিবরণ দেখুন।

হিমাদ্রি।

তুষার কিরীট শিরে, হে শ্রেষ্ঠ সম্রাট্!
উষার কনক করে উজলিয়া প্রভা,
আবরি পাষাণ, বর্ম্মে মূরতি বিরাট,
বিরাজিছ অঙ্গে পরি'প্রকৃতির শোভা।

অম্বর রয়েছে ধরি রাজ-ছত্র শিরে,
ধরণী ধরেছে বক্ষে চরণ দুখানি,
জলদ করিছে সিক্ত অভিষেক নীরে,
গরজে গভীর মন্দ্রে বজ্র জয়-ধ্বনি।

উচ্ছ্বসিয়া স্নেহ-স্রোত নিত্য অবিরল,
ঝরিছে নির্ঝর অই; হে সৌম্য, সুন্দর!
একি ভাব, একি চিত্র, কঠোরে কোমল
পাষাণে প্রেমের উৎস! পূর্ণ কলেবর!

আধেক পুরুষ পুনঃ আধেক প্রকৃতি,
পৌরুষ প্রীতির যেন যুগল মূরতি।

বদরিকাশ্রম। শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

আবদুর রজকের দৌত্য।

১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে সমরখণ্ডের প্রখ্যাতনামা নরপতি শাহরুখ স্বীয় অমাত্য ঐতিহাসিক আবদুর রজককে ভারতবর্ষের অন্যতম রাজ্য বিজানগরের (বিজয়নগর) দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আবদুর রজক রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া বাণিজ্য বন্দর হোরমুজ হইতে সমুদ্র পথে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার প্রবল পীড়া উপস্থিত হয়; তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়েন; এই অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হয়। অতঃপর তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া মস্কট নামক বন্দরে

অবতরণ করেন। এই স্থান হইতে রজক করিয়াত নামক নগরে উপনীত হইয়া তত্রত্য শাসন-কর্ত্তা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। অতঃপর আবদুর রজক বহুকষ্টে সেস্থান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সমুদ্র পথে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রাকরেন এবং সপ্তদশ দিবারাত্রি অর্ণবযানে অতিবাহিত করিয়া ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে উপনীত হন।

ভ্রমণকারী কালিকট বন্দর সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—কালিকট সুরক্ষিত সমুদ্র বন্দর; এইস্থানে সকল দেশ ও সকল নগর হইতে বণিকগণ পণ্যদ্রব্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের মন্দির অর্থাৎ মক্কা ও হেজাজ প্রভৃতি স্থান হইতেও সময় সময় বাণিজ্য পোত উপনীত হয়। কালিকট নগরের অধিবাসীরা বিধর্ম্মী; অতএব আমরা ন্যায়তঃ এই নগর জয় করিতে পারি। কালিকটে অনেক মোসলমান বাস করেন। তাঁহারা উপাসনার জন্য দুইটি জুম্মামসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কালিকট নগরে শাসন সংরক্ষণের এরূপ সুবন্দোবস্ত যে ধনী বণিকগণ নানাদেশ হইতে বহুমূল্য পণ্য দ্রব্যরাশি আনয়ন করেন এবং তৎসমুদয় রাজপথের পার্শ্বে অথবা বাজারে রাখিয়া দেন; এই সকল দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকজনের নিয়োগ নিষ্প্রয়োজন; কারণ শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারিগণ পণ্যদ্রব্য সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী; তাঁহারা তজ্জন্য অহোরাত্র উপযুক্ত সংখ্যক লোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন। দীর্ঘকাল পণ্যদ্রব্যরাশি বন্দরে থাকিলেও অপহৃত হওয়ার অথবা অন্য কোনও প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইলে কর্ম্মচারিগণ শতকরা আড়াই টাকা শুল্ক গ্রহণ করেন। এক বন্দরের পণ্যদ্রব্য দৈব-দুর্ব্বিপাকে অন্য বন্দরে নীত হইলে বন্দরবাসীরা তৎসমুদয় অবাধে লুণ্ঠন করিয়া থাকে; তাদৃশ লুণ্ঠনের হেতু এই যে এইরূপ ঘটনায় তাহাদের বিশ্বাস জন্মে যে দৈব অনুকূল হইয়া বন্দরবাসীদিগের জন্যই ঐ সমুদয় দ্রব্য আনীত হইয়াছে। কালিকট নগরে কিন্তু এইরূপ কোন নিয়ম নাই; তথায় সমস্ত দ্রব্যই নিরাপদ ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে।

আবদুর রজক কালিকট বন্দরের বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রাগুক্তরূপ প্রশংসাবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু কালিকটের অধিবাসীদের যে বর্ণনা তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহা মসী-বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ধর্ম্ম বিশ্বাসই কালিকটের অধিবাসী সম্বন্ধে আবদুর রজককে প্রতিকূল করিয়াছিল। আমরা রজকের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমি বাণিজ্য পোত হইতে অবতরণ করিয়া যে জাতীয় লোকের সাক্ষাৎ লাভ করি, তদনুরূপ আকৃতির লোক স্বপ্নেও কখন দেখি নাই।

নহে নর, নহে দৈত্য, জাতি অপরূপ;
হেরি যারে চমকিত ইন্দ্রিয় সকল।
স্বপ্নেও এহেন কিছু হেরিতাম যদি,
বহুবর্ষ চিত্তমম রহিত বিকল।
শশিমুখী সুন্দরী এক বাসিতাম ভাল,
কিন্তু প্রতি কৃষ্ণাঙ্গীতে পারিনা মজিতে।

এই দেশের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীরা নগ্ন দেহে রাজপথে গমনাগমন করিয়া থাকে; তাহারা কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত লেঙ্গট নামক বস্ত্র পরিধান করে। রাজা এবং ভিক্ষুক, সকলেরই পরিচ্ছদ একরূপ। এই দেশের অধিপতির উপাধি সামুরী। রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় ভগিনীর পুত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েন। বাহুবলে রাজসিংহাসন অধিকার করিতে দেখা যায় না। বিধর্ম্মী অধিবাসীরা নানা শ্রেণীভুক্ত; যথা, ব্রাহ্মণ, যোগী ইত্যাদি। কিন্তু সকলেই একাধিক দেবদেবীর এবং মূর্ত্তির উপাসক। প্রত্যেক শ্রেণীর আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র। একশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যাধিপতি সামুরি এই শ্রেণীভুক্ত।"

যে সময় মোসলমান দূত রাজ্যাধিপতি সামুরির সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তৎকালে দুই তিন সহস্র নগ্ন দেহ হিন্দু রাজসভায় উপস্থিত ছিল। প্রধান প্রধান মোসলমান অধিবাসীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সমরখণ্ডের রাজলিপি পাঠ করিয়া আব্দুর রজককে পরিচিত করিয়াদিলেন। অতঃপর তিনি সমরখণ্ডের উপঢৌকন সমূহ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু সামুরি তাঁহার দৌত্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখাইলেন। এজন্য তিনি রাজসভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভবনে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি রাজসভায় উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া অশান্তচিত্তে কালিকটে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় একদা তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, শাহরুখ উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতেছেন, "তোমার কষ্টের অবসান হইয়াছে।" পরদিন প্রাতঃকালে আব্দুর রজক শয্যা-পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপাসনা অন্তে এই স্বপ্নের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া সুখানুভব এবং তদর্থ পরিগ্রহ জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; এমন সময় একজন লোক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া

জানাইল যে বিজানগরের অধিপতি তাঁহাকে স্ব-দরবারে প্রেরণ করিবার জন্য সামুরিকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সামুরি স্বাধীন নরপতি ছিলেন, কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত বিজানগরের অধিপতিকে ভয় করিতেন। তাঁহার রাজ্যে কালিকটের ন্যায় তিনশত সমুদ্র বন্দর ছিল; তঁাহার সমগ্র রাজ্য পরিভ্রমণ করিতে তিন মাস অতি-বাহিত হইত। সামুরি বিজানগরের রাজার অনুরোধ অনুসারে আব্দুর রজককে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিলেন।

আব্দুর রজক কালিকট পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"কালিকট এবং সমুদ্রকুলবর্ত্তী অন্যান্য বন্দর মালবার প্রদেশ-ভুক্ত। কালিকট হইতে যে সকল বাণিজ্য পোত মক্কাভিমুখে যাত্রা করে, তাহা সাধারণতঃ গোল-মরিচ পূর্ণ থাকে। কালিকটের অধিবাসীরা নৌপরিচালনে দক্ষ, এজন্য তাহারা চৈনিক পুত্র নামে বিখ্যাত। জলদস্যুরা কালিকটের অর্ণবযান সকল লুণ্ঠন করে না। কালিকট বন্দরে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই পাওয়া যায়। গো-হত্যা অথবা গোমাংস ভোজন তথায় নিষিদ্ধ। যদি কেহ গো-হত্যা করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। তাহারা গোজাতিকে এরূপ ভক্তি করে যে, গোবর ভস্ম কপালে লিপ্ত করিয়া থাকে।

আব্দুর রজক কালিকট পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্যাঙ্গালোরে উপনীত হন। ম্যাঙ্গালোরের নিকটে তিনি একটি মন্দির দেখিতে পান, তাদৃশ সুদৃশ্য মন্দির পৃথিবীর আর কোন স্থানে তাঁহার দৃষ্টি গোচর হয় নাই। সমস্ত মন্দিরটি পিতল নির্ম্মিত এবং ইহার ভিতরে মনুষ্য পরিমিত দিব্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। আব্দুর রজক এই মূর্ত্তির কারু-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কালিকট এবং বিজয়নগরের মধ্যবর্ত্তী পথের বর্ণনায় তাঁহার বৃত্তান্তের অনেক স্থান পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা তৎসমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎ-প্রদত্ত বিজানগরের বর্ণনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

"বিজানগর সুবৃহৎ এবং জন পূর্ণ। বিজানগরের আধিপত্য বহুদুর বিস্তৃত। রাজ্যের সীমা স্বর্ণ দ্বীপ হইতে কুলবর্গ এবং বঙ্গদেশ হইতে মালবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি সুকর্ষিত এবং উর্ব্বরা। বিজানগর রাজ্যে সমুদ্র বন্দরের সংখ্যা তিনশত। সৈন্য-সংখ্যা এগার লক্ষ। সৈন্যগণ চারিমাস অন্তর বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তথায় পর্ব্বত সদৃশ এক সহস্র হস্তী বিদ্যমান রহিয়াছে। সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজন্যকুলে বিজানগরের নরপতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। তিনি ব্রাহ্মণকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিয়া থাকেন।

বিজানগর এরূপ নগর যে তাদৃশ নগর সমগ্র পৃথিবীতে আর কখনও চক্ষু বা কর্ণের বিষয়ীভূত হয় নাই। এই নগর সপ্ত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রাচীরের অভ্যন্তরে শস্য ক্ষেত্র, উদ্যান এবং লোকালয় দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম প্রাচীর অভ্যন্তরস্থ স্থান পণ্যশালা, বাজার এবং দুর্গদ্বারা পরিপূর্ণ। রাজ প্রাসাদের অদূরেই বাজার চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত রহয়াছে। উত্তর দিকস্থ অট্টালিকায় রাজা বাস করেন। বাজার গুলি দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। সুগন্ধ পুষ্প সর্ব্বদা এই বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। এক এক শ্রেণীর দোকানী বাজারের এক এক অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মণিকারগণ প্রকাশ্য ভাবে বাজারে মণিমুক্তাদি বিক্রয় করিয়া থাকেন।

রাজ প্রাসাদের অনেক কক্ষের নিম্নে গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তাহা স্বর্ণ-পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজ্যের উচ্চ, নীচ, সকল লোকেই শরীরের নানা স্থানে মণিমুক্তা এবং অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে।"

বিজানগরে কতিপয় দিবস বাস করিলে, রাজা আব্দুর রজককে স্বীয় সভায় আহ্বান করেন। তিনি দরবারে উপনীত হইয়া রাজাকে পাঁচটি অশ্ব এবং অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করেন। তৎকালে রাজা সবিশেষ আড়ম্বর সহকারে উপবিষ্ট ছিলেন; ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য পারিষদ্ বর্গ তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজা বহুমূল্য শাটিনের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছিলেন, তাঁহার কর্ণে এরূপ মহার্ঘ মুক্তার মালা শোভা পাইতে ছিল যে, মণিকারগণও তাদৃশ উৎকৃষ্ট মুক্তার মূল্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ ছিলেন।

আব্দুর রজক রাজাকে প্রিয় দর্শন, অল্প বয়স্ক, দীর্ঘবপু, কৃশাঙ্গ এবং শ্যাম বর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দরবারে উপনীত হইয়া অবনত মস্তকে রাজাকে অভিবাদন করিলে রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং উপবিষ্ট হইতে আদেশ দেন। অতঃপর রাজা সমরখণ্ডের রাজলিপি দ্বিভাষীকে পাঠ জন্য অর্পণ করিয়া বলেন, মহিমান্বিত নরপতি আমার দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছেন, এজন্য আমি স্যাতিশয় আনন্দলাভ

করিয়াছি। আব্দুর রজক নানাবিধ পোষাক পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন; এজন্য গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে ছিল, রাজা দয়া পরবশ হইয়া নিজ হস্তস্থিত পাখাখানাই তাঁহাকে প্রদান করেন। অতঃপর কর্ম্মচারিগণ একটি বাক্স আনয়ন করেন এবং তাহা হইতে দুইটি পানের খিলি, ৫০০ মুদ্রা (ফনম) পূর্ণ থলি, ও কিঞ্চিৎ কর্পূর তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি রাজ প্রসাদ লাভ করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন। আব্দুর রজক যতদিন রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ততদিন প্রত্যহ দুইটি মেষ, চারিজোড়া মুরগি, পাঁচ মণ চাউল, একমণ মাখন, একমণ চিনি ও দুইটি স্বর্ণমুদ্রা রাজ সরকার হইতে প্রাপ্ত হইতেন এবং সপ্তাহে দুইবার সন্ধ্যাকালে রাজসকাশে নীত হইতেন। এই সময় রাজা তাঁহাকে সমরখণ্ডের অধিপতি সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রত্যেকবার রাজদর্শন কালেই তিনি এক খিলি পান, এক থলি মুদ্রা (ফনম) এবং কিঞ্চিৎ কর্পূর প্রাপ্ত হইতেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ।

আমাদের প্রাচীন দেবতা সূর্য্যদেবের সম্বন্ধে ঠাকুরমার নিকট অনেক কথা শুনিতাম। ঠাকুরমা বলিতেন, সূর্য্যঠাকুর দেবতা শ্রেণীর মধ্যে এক-জন উচ্চশ্রেণীর কুলীন। কিন্তু সেই সত্যযুগে অসুর যুদ্ধে সময় সময় তাঁহাকেও ইন্দ্র-চন্দ্রের ন্যায় একাদিক্রমে বহুদিন পাট ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে বাস ও নির্জ্জলা একাদশী করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাহু নামক একটা অজ্ঞাত-কুল-শীল চণ্ডালের নিকটও তাঁহাকে রীতিমত আত্ম-সমর্পণ করিতে হইয়াছিল। এ সব সত্যযুগের কথা।

ত্রেতাতেও যে তিনি নিশ্চিন্ত মনে শাসন-পাট পরিচালন করিতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। লঙ্কার রাবণের হস্তে তাঁহাকে নাকি বিস্তর "নাকানি চুবানি" খাইতে হইয়াছিল। সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস যখন তখনই ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগের দ্বারা যাহা খুসি করাইয়া লইত। প্রতিবাদ করিবার কাহারও সাহস কিম্বা

অধিকার ছিল না। সেই সময় সূর্য্য ঠাকুরকে 'চৌপর' দিন সমভাবে লঙ্কার সিংহাসন পাহারা দিতে হইত। একটু উন্নিশ, বিশ করিবার জোটী ছিল না। সুধুই কি তাই? রাত নাই, মধ্যাহ্ন নাই, উদয় হইতে হইবে—'কুড়ি চক্ষু বিশ হাত' রাবণের আদেশ—উপায় নাই। সূর্য্যদেব রাত্রি দ্বিপ্রহরেই উদয় হইতে গেলেন। তাতেই কি ছাই বিপদ যায়? উদয়-পথে আসিয়া দাঁড়াইল পবন নন্দন হনুমান। আহা! সে গোঁয়ার গোবিন্দ মুখ পোড়ার হাতে পড়িয়া সূর্য্যঠাকুরের যে কি পর্য্যন্ত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, কৃত্তিবাস ঠাকুরের কৃপায় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সেই বানর বেটার বগলতলির বোটকা গন্ধে সূর্য্যদেবের অন্ন-প্রাশনের অন্নজল পর্য্যন্ত বাহির হইবার যোগাড়!

ঠাকুরমার মুখের এই সকল বিচিত্র গল্পের আবেশে বাল্যকালের বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্যের দুঃখে সময় সময় ঠাকুরমার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া- ফুঁফাইতে ফুঁফাইতে বলিয়াছি—তারপর, তারপর।

তারপর বড় হইয়া পুরাণে পাঁজিতে ঠাকুরমার কথার সত্যতার প্রমাণ পাইয়া এবং সেই অজ্ঞাত রাহুচণ্ডাল বেটার অত্যাচার ও স্পর্দ্ধা প্রত্যক্ষ করিয়া ঠাকুরমার অভিজ্ঞতার প্রতি যেমন ভক্তি এবং বিশ্বাস হইয়াছে—সূর্য্য ঠাকুরের দুঃখে তেমনি দুঃখও সহানুভূতি হইয়াছে।

যাহাহউক, "নিয়তি কেনবাধ্যতে"—কেহই ফিরাইতে পারে না। বিশেষ সেই সত্য, ত্রেতায় দেবতারা যখন সময় সময় অবকাশ ভ্রমণে আসিয়া মর্ত্ত-মানবের সহবাস করিতেন, তখন মানবীয় সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার প্রভাব তাঁহাদিগের উপরও সংক্রামিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে?

কিন্তু সেই সত্য-ত্রেতা ত আর এখন নাই! এখন যে নিরেট কলি যুগ! মর্ত্ত-মানব বহু তপস্যা করিয়া এখন আর দেবতার দেখা পায় না। এহেন নিরেট যুগে যে আমরা বিমানচারী সূর্য্যদেবকে পুনরায় মর্ত্ত-মানবের চক্রান্তে বিপদগ্রস্থ দেখিব, তাহা কি কেহ কখনো কল্পনাও করিতে পারিয়াছেন?

সূর্য্যদেব কিন্তু পুনরায় বন্ধন দশাগ্রস্থ হইয়াছেন। সেই ত্রেতায় হইয়াছিলেন লঙ্কায়—রাবণের গৃহে; আর এই কলিতে হইয়াছেন—তৎ-পুত্র মহীরাবণের গৃহে—পাতালে।

আমাদের পাতাল পুরী আমেরিকার কালিফর্ণিয়াতে সহস্র রশ্মি সূর্য্য-দেব কুড়ি চক্ষু বিশ হস্ত বৈজ্ঞানিক সমাজের অদ্ভুত কৌশলের নিকট পুনরায় আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই বৈজ্ঞানিক সমাজ এই প্রাচীন দেবতাটীকে কবলে পাইয়া লঙ্কার রাবণের ন্যায় তাঁহার দ্বারা দিনকে রাত, রাতকে দিন করিবার জল্পনা কল্পনা করিতেছেন।
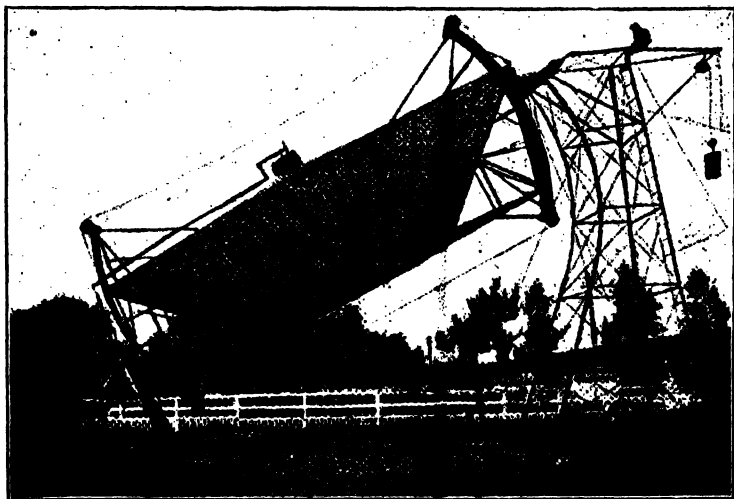
সবিতা দেবের বন্ধন চিত্র আমরা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। যে ভীষণ নাগ পাশে তিনি আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতি-হাস না জানা থাকিলে তাঁহাকে এ চিত্রের ভিতর হইতে খোজিয়া বাহির করিতে যাওয়া সহজ ব্যাপার হইবে না। সূর্য্যদেবের এই নূতন বিপদের সহিত আমাদেরও অদূর-ভবিষ্যতের গার্হস্থ্য কোলাহলের বেশ একটু সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাই আমরা আমাদের প্রাচীন দেবতার এই নূতন বিপদের ইতিহাসটুকু অতি যত্নের সহিত সংকলন করিয়া দিলাম।

ঠাকুরমা, দিদিমা প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন সচল অস্থাবর পদার্থগুলি যে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে, সেই পল্লি-গৃহের নূতন আমদানী বধূকুলের এবং সহরের সিমন্তিনীকুলের অবগতির জন্য ইহা প্রকাশ করা বোধ হয় খুব ধৃষ্টতার বিষয় নহে যে, সে কালের এই ঠাকুরমা & দিদিমা Co. যখন স্ব স্ব পল্লিগৃহে ঘোমটা টানা বধূটী ছিলেন, তখন গৃহ-পশ্চাতের ঘন

সন্নিবিষ্ট বংশ কুঞ্জ হইতে কঞ্চি কাটিয়া ও নিবিড় ঝোপান্তরাল হইতে শুষ্ক শাখা সংগ্রহ করিয়া উনুন ধরানকে তাঁহারা তাঁহাদের বধূ জীবনের একটী দৈনন্দিন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এবং এইরূপ পুরুষোচিত সংগ্রাম করিয়াও বধূ জীবনের শীলতা (?) ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন। তাঁহাদেরই বর্ত্তমান বংশধরগণের "পরিবারগণ" ঐরূপে ইন্ধন কাষ্ঠের অভাব নিবারণ করিবেন দূরের কথা—শ্রীকর-কমলে স্পর্শ করিয়া গৃহ কোণের কাষ্ঠখণ্ড উনুনে পূরিয়া দিতেও তাঁহারা অসম্মান বিবেচনা করিয়া থাকেন।

সে যাহাহউক, প্রকৃত কথা এই যে, সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে অচেতন কাষ্ঠখণ্ডেরও সঙ্কোচ, সম্প্রসারণ, কম্পন, স্পন্দন প্রভৃতি শক্তি আছে এবং সেই শক্তিবলে তাহারা সম্মান অসম্মান, সুখ-দুঃখ, আদর অনাদর প্রভৃতিও নাকি অনুভব করিয়া থাকে। এখন জানি না, এই সম্মান, অসম্মানের অথবা আদর অনাদরের হেতুতেই কিনা, প্রাচীনা লক্ষ্মীদিগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের সহচর কাষ্ঠ নামক এই যে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ টী, এটিও নাকি ক্রমে আমাদিগের রন্ধনশালা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে; কোন কোন স্থানে বা একেবারেই করিয়া ফেলিয়াছে। শুনিতেছি ইহার কারণ— পৃথিবীতেই নাকি ক্রমে বন জঙ্গলের অভাব দেখা যাইতেছে।

"আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর" যেমন নিষ্প্রয়োজন, আমাদের পক্ষে পৃথিবীর খবরটা তেমন নিষ্প্রয়োজন কিনা বুঝিতে বা বিচার করিতে না পারিলেও, স্বচক্ষে যতদুর প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার বিচার আমরা করিবার অধিকারী। সেই অধিকারে, ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে বাস্তবিকই আমাদের বৃক্ষবহুল পল্লিগ্রামগুলি বৃক্ষবিরল ধূ ধূ প্রান্তরে পরিণত হইতেছে। এবং তাহারই ফলে, আমাদের সেই নিত্য পরিচিত ইন্ধন কাষ্ঠের স্থানে কয়লা নামক ভূগর্ভস্থ কোন অদৃশ্য স্থান নিবাসী অজ্ঞাত-কুল-শীল এক অঙ্গারক আসিয়া, সহর বন্দরের পাকশালাগুলি ত অধিকার করিয়াছেই, এমন কি, সুদূর পল্লিগ্রামের জীর্ণ কুটীর কোণেও প্রভাব বিস্তার করিতে উঁকি ঝুঁকি দিতেছে। এবং আমাদের ক্ষীণ মস্তিষ্ককে ক্ষীণতর করিয়া ক্রমেই আমাদিগের মুক্তিমার্গ পরিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

উপায় নাই। সুপরিচিতের অভাবে অপরিচিতের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বোধ হয় কোন

ব্যক্তিই উপদেশ দিবেন না সুতরাং "নাই মামা অপেক্ষা কানা মামাই যে ভাল" এই নীতি প্রবাদ মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়াই লইতে হইবে। কিন্তু এ 'কানা মামার' ও যে পরমায়ু সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে! এখন কঃ পন্থা!

পৃথিবীর অরণ্য সম্পদ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকায়, সর্ব্বত্রই ইন্ধন কাষ্ঠের স্থান কয়লা অধিকার করিয়াছে। ফলে পৃথিবীতে প্রতিদিন যে পরিমাণে কয়লা ব্যয় হইতেছে, জগতের চিন্তাশীল নরগণ বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই পরিমাণে কয়লার ব্যবহার অপ্রতিহত গতিতে চলিলে, আর পাঁচ ছয় শত বৎসর মধ্যেই পৃথিবীতে কয়লা সম্বন্ধে যে শ্রেষ্ঠ ভুভাগ, সেই ভূভাগের নরনারীকেই কয়লা বিরহে কল কারখানা বন্ধ করিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক জনগণের এইরূপ সাংঘাতিক ভবিষ্যৎ বাণী বঙ্গলক্ষ্মীগণের ভীতি সঞ্চারে কৃতকার্য্য হইবে না বটে, কিন্তু এই বার্ত্তা সভ্য জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজে নূতন চিন্তা জাগাইয়া দিয়াছে। কেহ কেহ এই সমস্যার সমাধান চিন্তায় এখন হইতেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন; কেহ কেহ বা কাল প্রভাবের সহিত "যুদ্ধং দেহি" ঘোষণা করিয়াছেন। আবার কেহ বা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবী কয়লা শূন্য হইয়া গেলে, জলপ্রপাত ও নদী স্রোতের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতঃ তাহা হইতে সৌদামিনীর উদ্ভব দ্বারা কল কারখানা পরিচালন করা যাইতে পারিবে। কাহারও কাহারও বা চিন্তাশক্তি আরও উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশে সৌধ রচনা করিতেছে—সেই সংগৃহীত সৌদামিনী প্রভাবে তাঁহারা মঙ্গল গ্রহ পর্য্যন্ত রেল লইয়া যাইবার আশা কল্পনা করিতেছেন!

প্রথমোক্ত কল্পনা কোন কোন স্থলে কার্য্যকরী হইয়াছে বটে কিন্তু এইরূপ শক্তি কয়লার স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আধুনিক রসায়ণ তত্ত্ববিদ অধ্যাপক রামজে (William Ramsay) কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তিনি এই সকল কল্পনাকে অদূর-দর্শীর কল্পনা বলিয়া মনে করিতেছেন। অধ্যাপক রামজে ভূগর্ভাস্থিত উত্তাপকে কেন্দ্রীভূত করিয়া কয়লার স্থান পূরণ করা যাইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়—মঙ্গল গ্রহের কল্পনাটীতে "গুলির প্রভাব" আছে কি না, তাহা জগতের বৈচিত্র্য দেখিয়া সাহস করিয়া বলা যায় না।

স্বর্গরাজ্য ইয়ুরোপে যখন এইরূপ কল্পনা জল্পনা ও যুক্তি পরামর্শ চলিতেছিল, পাতাল পুরী আমেরিকায় তখন অবিরাম কার্য্য চলিতেছিল। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ তখন আমাদের প্রাচীন দেবতা সবিতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করাইয়া লইবার জন্য এক বৈজ্ঞানিক জাল বিস্তার করিলেন। সবিতা এখন সেই জালে আবদ্ধ হইয়া বৈজ্ঞানিক সমাজের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন।

ঐ যে বৃহৎ ছত্রের ন্যায় ইস্পাৎ নির্ম্মিত পদার্থটী, ইহাই সেই বৈজ্ঞানিক জাল। ইহার অভ্যন্তরে ১৭৮৮ খানা দর্পণ সন্নিবিষ্ট, এক এক খানা দর্পণ ৩ ফিট দীর্ঘ ২ ফিট প্রস্থ। এই দর্পণ গুলি সোজা ভাবে সূর্য্য রশ্মি আকর্ষণ করিয়া ছাতার হাতার ন্যায় এক একটী একশত গেলান জল পূর্ণ দীর্ঘ নলের উপর সে রশ্মি প্রতিফলিত করে। এই শৃঙ্খলিত সূর্য্যো-ত্তাপে জল বাষ্পে পরিণত হইয়া মিনিটে চৌদ্দশত গেলন জল উত্তোলন ক্ষম বৃহৎ ইঞ্জিনকে পারিচালন করিতে পারে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে শীতল জল হইতে ১৫০ পাউণ্ড বাষ্প চাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বাষ্পস্থালী ইস্পাত নির্ম্মিত এবং উত্তাপ গ্রাহী পদার্থে আবৃত। সেই বাষ্পস্থালী যন্ত্রের সাহায্যে অনবরত জল সরবরাহ হইতেছে ও সেই জল বাষ্প চাপ অধিক হইলেই নিঃসরণ প্রণালী দ্বারা বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

আমাদের সবিতা দেব রাবণ রাজ্যে যেমন শীত গ্রীষ্মে সমভাবে service দিতেন, আমেরিকার কালিফর্ণিয়ার আকাশেও তিনি সেইরূপ—শীত গ্রীষ্মে সমান উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। সিংহলের ন্যায় সেখানেও শীত নাই, বারমাস প্রখর রৌদ্র থাকে। সুতরাং যন্ত্রবিদ্ধ সূর্য্যদেব বার মাস সমানে কার্য্য করিতেছেন। প্রতিদিন উদয়ের এক ঘণ্টা পর হইতে অস্তগমনের এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত যন্ত্রে অবিশ্রান্ত তাপ সংগৃহীত হয়। এই রূপে এই যন্ত্র প্রতিদিন এত শক্তি সঞ্চয় করে যে, ইহা দ্বারা পৃথিবীর যে কোন কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করা যাইতে পারে।

কয়লা ও কাষ্ঠের স্থান পূরণ জন্য আমেরিকায় এইরূপ যন্ত্র আরও প্রস্তুত করা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কালিফর্নিয়ার এই যন্ত্রটীর ন্যায় বৃহৎ যন্ত্র এপর্য্যন্ত আর নির্ম্মিত হয় নাই। এই যন্ত্রটী এখন প্যাসিডোনার উষ্ট্র পক্ষীর কারখানায় রক্ষিত আছে। এই সকল যন্ত্রে মরুভূমিতে কূপ খনন করিয়া তাহা হইতে জল উত্তোলন করতঃ সেই উসর ভূমিকে উর্ব্বরা করা

হইতেছে। আমেরিকার বহু মরুপ্রান্তর এই রূপে শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। শুনাযায় ভীষণ সাহারাকেও শস্য শ্যামলা উর্ব্বরা ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা আরম্ভ হইবে। কোন কোন স্থানে এই যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলো, ট্রামগাড়ী ব্যোম যান, রেলগাড়ী প্রভৃতি ও পরিচালিত হইতেছে। তবে আর মঙ্গলগ্রহ কত দূর?

প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে কেবল যে সাবিতাদেবই বিপদ গ্রস্থ হইয়াছেন, তাহা নহে, সূর্য্যের ন্যায় বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অনেকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছেন। এইবার পালা দেখা যাইতেছে মঙ্গল গ্রহের। মঙ্গল দেবতা তাহার প্রাচীন সহচরগণের অবস্থা দৃষ্টে ভয়পাইয়া নাকি সেদিন আমেরিকায় এক দূত পাঠাইয়াছিলেন—সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশিতও হইয়াছিল। সে মিসনের তত্ত্ব বারান্তরে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

দান পত্র।

প্রফুল্ল বাবু শেষে অপ্রস্তুত ভাবে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন "বেলা, শেষ কালে তোমার সঙ্গে আমার যে এমনতর একটা নিষ্ঠুর সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে, তাতো আগে ভাবিনি!"

বেলা খানিকক্ষণ এমনি নিরুপায় ভাবে বাহিরের সবুজ পাতার কচি ঝালর দেওয়া দেবদারু গাছটার পানে চাহিয়া রহিল, যেন তা দেখিয়াই ডালে বসা দয়েল পাখীটা সহসা শিশ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনির মত প্রাণহীন স্বরে সে উত্তর করিল—"তা এক রকম আঁচ কত্তে পাচ্চি বই কি!"

জানালার সাসির ভিতর দিয়া, বৈকালের সোনালি রোদ বেলার মুক্ত, হিল্লোলিত, কেশের উপর একটী আলোর মুকুট পরাইয়া দিয়া হাসিতে ছিল।

বেলার কথার ছন্দে বেদনার চিরন্তন সুরটাই যেন মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতে ছিল। সে যে চাঁদের হাট বসাইয়া স্বপ্ন দেখিতে ছিল, সেযে শুধুই স্বপ্ন, আর কিছুই নয়; প্রফুল্ল যেন আজ তাকে সেই নিরাশার কথাই বলিতে আসিয়াছে। যে বোঁটায় ফুলটীর মত তার জীবনের পাঁপড়ি গুলি এমন সুন্দর ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল, সেই কি আজ তারে বিদায় দিতে চায়!

যে জ্যোৎস্না তারে এত দিন এমন করিয়া হাসাইয়াছে, সেই কি আজ তারে কাঁদাইতে আসিয়াছে? চাঁদনি রাতে আমাদের এই কর্ম্ম-মুখর বাস্তব জগৎটা যেমন অলীক, স্বপ্নের মত ঠেকে, বেলার চোখের সামনে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই তেমনি অত্যন্ত ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। নিলীমার হৃদয়ছিন্ন তারাটীর মত, নিয়তি আজ তারে কোথায় নিঃশেষ করিয়া দিতে চলিয়াছে, কে জানে! বেলার হৃদয়ে যে ঝড় বহিতেছিল, তাহার একটা হিল্লোল আসিয়া প্রফুল্লের হৃদয়কে কোমল আলোড়নে ব্যথিত করিয়া তুলিল। বেলার নয়ন-পুষ্প-পাত্রেও অশ্রুর কোমল অর্ঘ্যভার রচনা করিয়া দিল। বেলা ধীরে ধীরে মাটীর পানে চাহিয়া বলিল—"সত্যি কথা বলতে অত লজ্জা কর্‌লে চল্‌বে কেন, প্রফুল্ল বাবু! সে তো চাপা থাকবার নয়! তুমি খুলে না বল্লেও আমি সব কথা বেশ বুঝতে পাচ্চি! তবে কি তুমি আমায় এক্‌খুনি তোমার বাড়ী থেকে চলে যেতে বল্‌ছ?"

বেলার হৃদয়-ভেদী শর প্রফুল্লকে বিদ্ধ করিল। তিনি শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন—"চলে যেতে বল্‌ছি! বল কি বেলা? তুমি যদ্দিন ইচ্ছে, থাক না। এও তো, তোমারি বাড়ী!"

বেলা চকিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"না—না, প্রফুল্ল বাবু আর আমার থাকা হচ্চে না! আর আমি কষ্টকে ভয় করি না। কষ্ট সইবার জন্যই তো ভগবান আমায় নারী জন্ম দিয়েছেন!" প্রফুল্ল বাবু বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—"ও সব হচ্চে না, বেলা। তোমায় কোথাও যেতে দিচ্চি না আমি! আমি তোমায়—(এইখানে প্রফুল্ল বাবুর হঠাৎকাশি পাইল, পরে ভাঙ্গা গলায় বলিলেন)—ঠিক নিজের বোনের মত ভালবাস্‌ন! এই যে তোমায় একরকম বেদখল করে, আমায় মামার সংসারে ঢুকতে হয়েচে, তাই আমার ভাল লাগেনি। তুমি যদি মামার দেওয়া দানপত্র, কি তাঁর লেখা কিছু একটা দেখাতে পাত্তে, তবে এতে আমি কখনো হাত দিতাম না। এখনো তোমায় খানিকটা অংশ লিখে দিতে রাজি ছিলাম, কিন্তু"—চাকার রবার টায়ার হইতে বাতাস ফুস্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেলে, বাইসিকল যেমন হঠাৎ থামিয়া পড়ে, তেমনি হঠাৎ একটা প্রবল কিন্তুর ধাক্কা খাইয়া প্রফুল্ল একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। তা এই কিন্তুর গোলযোগটা সংক্ষেপতঃ এই যে তাঁর বাগদত্তা ভাবীপত্নী শ্রীমতী হেনা, বেলাকে অংশ দেওয়ার প্রস্তাবটাকে একেবারে "সামারিলি ডিস্‌মিস্‌" করিয়া দিয়াছে!

বেলা কিছু গাঢ়স্বরে বলিল —"আপনাদের বিঘ্ন হব না, আমি শীগ্‌গীর যাচ্চি চলে, শুধু জিনিষপত্র-গুলো-গুছিয়ে নিতে যা একটু দেরী! না হয়, স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কায করে খাব। এক পেটের জন্য আমার ভাবনা! একরকমে দিন কেটে যাবে!" কথাটা শেষ করিতে না করিতে বেলা কাঁদিয়া ফেলিল! তখন বেলার মুখখানি নীহারের চুনি বসানো, দুটী ভ্রমর-লীন রক্ত কমলের মতো দেখাইতেছিল!

এবার প্রফুল্ল বাবু একেবারে নরম হইয়া বলিলেন "পাগলামো করো না লক্ষ্মীটী! এ সংসার তো তোমার আমার দুজনারই!"

প্রফুল্ল বাবুর কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া যে স্নেহ ব্যক্ত হইয়া পড়িল, তাহাতেই তিনি একরকম ধরা পড়িয়া গেলেন।

মুখ না ফুটিতে মনের কথা ধরিয়া ফেলা ব্যাপারে মেয়েদের অশিক্ষিত পটুত্ব অতি অসাধারণ! এ নূতন আবিষ্কারের রহস্যে তখনই বেলার ভিজা মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে—সে যেন ভিজা স্বর্ণচাঁপায় রক্ত চন্দনের চিহ্ন অথবা বৃষ্টির পরে ভিজা তরুলতার উপর অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রক্তিম চুম্বন!

২

কালীপ্রসাদ বাবু কলিকাতায় ওকালতী করিয়া বড়মানুষ হইয়াছিলেন। তিনি কি পরিমাণ নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, বাজারে সে সম্বন্ধে নানারূপ রূপকথার চলন ছিল। কালীপ্রসাদ বাবু নিঃসন্তান থাকাতে, তাঁর বিষয় আসয় সমুদয় তাঁর ভাগিনেয় প্রফুল্লকেই দিয়া যাইবেন, এইরূপ মনন করিয়াছিলেন এত বড় ষ্টেটের যে মালীক হইবে, তার মানুষ হওয়া দরকার, এই মনে করিয়া কালীপ্রসাদ বাবু কলিকাতা সহরে সাহেব মাষ্টার রাখিয়া প্রফুল্লকে মানুষ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রফুল্ল যখন কলিকাতায়, তখন কালীপ্রসাদ বাবুর বিপত্নীক বন্ধু রামকমল বাবুর সহসা মৃত্যু হয়। তিনি একটী শিশু-কন্যা রাখিয়া যান,—ত্রিকুলে তার আর কেউ ছিল না। নিঃসন্তান কালী-প্রসাদের হৃদয় অপত্য-স্নেহে ভরিয়া গেল। তিনি রামকমলের শিশু কন্যাকে বুকে করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই শিশু কন্যাই বেলা। প্রফুল্ল যখন কলিকাতায়, তখন বৃদ্ধ কালীপ্রসাদ এই বেলার উপরই তাঁর সমুদয় হৃদয়ের রুদ্ধ স্নেহ ঢালিয়া দিয়া তাঁর বালুকা পূর্ণ প্রাণ সরস করিয়া তুলিলেন। বেলাকে

তিনি বাড়ীতে মেম রাখিয়া অতি যত্নে শিক্ষা দিয়াছেন। কালীপ্রসাদ বাবু বেলাকে প্রফুল্লের হাতে সমর্পণ করিতে পারিলেই তাঁর জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্যপালন করা হইল বলিয়া মনে করিতেন। এই খানেই প্রজাপতি ঠাকুর গোল বাঁধাইয়া দিলেন। প্রফুল্ল এক ব্রাহ্ম কুমারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। এই লইয়া প্রফুল্লের সঙ্গে কালীপ্রসাদ বাবুর চিরবিচ্ছেদ ঘটে। কালীপ্রসাদ বাবু বলিলেন, "কেন, রূপে-গুণে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, বেলা কম কিসে? তারে তো প্রফুল্লের যোগ্য করেই গড়েছি!" প্রফুল্লের পক্ষে বলা হইল—এ সব ব্যাপারে বাপ মায়েরও autocracy খাটে না। অন্যের তো কথাই নাই। কালীপ্রসাদ বাবু বলিয়া পাঠাইলেন, "তবে আর আমার বিষয়ে তোমার কোন দাবী দাওয়া থাকিবে না।" প্রেমমুগ্ধ প্রফুল্ল বলিলেনঃ—তথাস্তু। কালীপ্রসাদ সাশ্রুনয়নে বেলার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'মা, আমার যা বিষয় আশয় আছে, সব তোমায় লিখে দিয়ে গেলাম। দানপত্র লেখা হয়েছে সময় মত রেজেষ্টরী করে দিয়ে যাব।" বেলা কাঁদিয়া বলিল "আমি বিষয় চাই না, বাবা, তুমি প্রফুল্ল বাবুকে বঞ্চিত করোনা!"

বুড়া ভাবিলেন "ছুঁড়ীটা এ কি পাগলামি জুড়িয়া দিল!" বুড়ারা স্ফুটোন্মুখ তরুণ-হৃদয়ের সে রহস্যের কি বুঝিবে!

এদিকে কালীপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে যে তার বিরোধ ঘটিয়াছে, সে কথা প্রফুল্ল তার প্রেম-জগতে প্রকাশ করিল না। সে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জগতে দুঃস্বপ্নের স্থান নাই। প্রফুল্লের সঙ্গে ব্রাহ্মকুমারী হেনার বিবাহ যখন ঠিক্‌ঠাক্, এমন সময় ভগ্ন-হৃদয় কালীপ্রসাদ দ্বন্দ্ব ও দুঃখের জটিলতার ঊর্দ্ধে এক চিরশান্তি বিরাজিত গভীর নিদ্রার অতলগর্ভ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, আইন-ব্যবসায়ীগণের বুদ্ধির সহায়তা লাভ করিয়া কালীপ্রসাদের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে দখল লইবার জন্য, প্রফুল্ল রণবেশে কালীপ্রসাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

প্রফুল্ল যখন বেলার পক্ষ হইতে একটা বিদ্রোহ সূচক প্রবল বাধার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তখন বেলা হাসি মুখে প্রফুল্লের পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সহসা প্রফুল্লের চোখে বেলার আত্ম-বিসর্জ্জনের মহিমা, অস্তগামী সূর্য্যের বিচিত্র রশ্মি ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, প্রফুল্লের হৃদয় স্বভাবতই বেলার দিকে শ্রদ্ধার সহিত নত হইয়া পড়িল! তখনই

আবার তাঁর মনে পড়িল, যেন তিনি হেনার উপর অবিচার করিতেছেন। তারি মূলধন ভাঙ্গিয়া যেন তিনি আজ চুরি করিয়া আর কাহাকেও ঘুষ দিতে আসিয়াছেন। তাই সহসা শক্ত হইয়া উঠিয়া প্রফুল্ল বলিলেন ঃ—

"তুমি যদি হেনার সঙ্গে এ বাড়ীতে থাক, হেনা তা হ'লে কত খুসী হবে।" প্রফুল্লের কথা শুনিয়া বেলার মুখখানি ভয়ঙ্কর সাদা হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া থাকিল। প্রফুল্ল সোজাসুজি বলিয়া ফেলিলেন ঃ—"দেখ বেলা, হেনার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে! বিয়ের পর তুমি যদ্দিন ইচ্ছা এবাড়ীতে থাক্‌তে পার। তবে এবিষয়ে হেনার কি মত, তাই বুঝে আমায় সব ব্যবস্থা কত্তে হচ্চে।"

বেলা তেমনি মাথা নীচু রাখিয়াই বলিল—নিশ্চয়! তুমি ঠিক বলেচ—আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি!"

৩

প্রফুল্ল শুভ বিবাহের পরেও বেলাকে তাদের বাড়ীতে রাখা যাইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে হেনার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হেনা সংক্ষেপে 'রায়' দিয়া বলিল "অনাথ-আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেই হয়!" তবু প্রফুল্লের একান্ত অনুরোধে সে বেলাকে দেখিতে আসিয়াছে। সে শুধু মন-রাখা-গোছের দেখা!

আলুলায়িত কুন্তলা বেলা যখন বনদেবীর মত সৌন্দর্য্য বৃষ্টি করিতে করিতে হেনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনই হেনার মন ভয়ানক শক্ত হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, সে কখনও প্রফুল্ল ও তার মাঝে এমন প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্থান দিতে পারে না। তবু ভদ্রতার অনুরোধে হেনা কথাটা যথাসাধ্য নরম করিয়াই পাড়িল ঃ—

"তোমার খুব ভাগ্যি যা হোক্ বেলা! মিসেস্ রায় একটী শিক্ষয়িত্রী চাচ্ছেন—তাঁর মেয়েদের পড়াতে। তাঁদের বাড়ীতেই থাকতে পাবে। তার উপরে মাইনে মাসিক ২০৲ টাকা!"

কথাটা বেলা বেশ বুঝিয়াছিল, তথাপি জিজ্ঞাসা করিল,—"কার কথা বল্‌চ ভাই হেনা?"

হেনা একটু তীব্র স্বরে বলিল ঃ—"আর কার কথা হবে বেলা; এ বাড়ীতে যে আর তোমার বেশীক্ষণ থাকা ভাল দেখায় না। তোমার পক্ষেও দৃষ্টিকটু; প্রফুল্ল বাবুর পক্ষেও তাই!"

হেনা এমন ঝঙ্কার দিয়াই কথাটা বলিল, যেন এরি মধ্যে হেনা প্রফুল্লের সমুদয় বিষয় আশয়ের উপর তার নিজের "সর্ব্ব স্বত্ব রক্ষিত" ছাপটা দিয়া বসিয়াছে। হেনার কথা শুনিয়া বেলাও উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল :—

"আমার আর এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার দরকার হবে না। দানপত্র পাওয়া গেছে, কালীপ্রসাদ বাবু তাঁর সব বিষয় আশয় আমায় লিখে দিয়ে গেছেন!"

হেনার মুখ প্রভাতের চাঁদের মত সাদা হইয়া গেল। সে কথাটার মধ্যে একটা জোর করা দম দিয়া বলিল :—"মিছে কথা!"

বেলা প্রতিধ্বনির ন্যায় বলিয়া উঠিল, "মিছে কথা?—এই দেখ সে দানপত্র!" এই বলিয়া কাপড়ের আঁচল হইতে বাহির করিয়া দানপত্র খানি হেনার হাতে দিল।

৪

হেনা ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলে, বেলার মনে হইল, সে এমন হঠাৎ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কাজটা ভাল করে নাই। হেনা তার আহত বুকে এমন করিয়া খোঁচা না দিলে সে হেনাকে কখনও এমন নিষ্ঠুর ভাবে জব্দ করিয়া দিত না। এইবার বেলার মনে হইল, হেনা যদি এখন বাঁকিয়া বসে, আর প্রফুল্লকে বিবাহ করিতে না চায়, তবে যে তার প্রফুল্লই অসুখী হইবে! বেলাকে লইয়া তো প্রফুল্ল কখনো সুখী হইবে না! বেলা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে কেন! তবে আর কেন!" বেলা ধীরে ধীরে উঠিল। একবার জানালার কাছে গিয়া আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া লইল। তারপর, তার যথা-সর্ব্বস্ব সেই দানপত্র খানা জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষেপ করিল! প্রথম একটু পোড়া গন্ধ—তার পর খানিকটা ধোঁয়া—তার পর সেই দানপত্র দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ছাই হইয়া গেল!

দলিল খানা ভস্মীভূত হইয়া গেলে, বেলা প্রফুল্ল বাবুকে সংক্ষেপে এক খানা পত্র লিখিল, তাহা এইরূপ :—প্রফুল্ল বাবু, আমি যে আজ আপনার ভাবী স্ত্রীকে বলিয়াছি—দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, সে মিথ্যা কথা। আমার এরূপ বলা ভয়ানক অনুচিত হইয়াছে। আশা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। এক সপ্তাহের ভিতরে আমি আপনাদের সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। শুধু সাত দিনের সময় ভিক্ষা চাই। এর মধ্যে আমার

জিনিষ পত্র গুছাইয়া লইতে পারিব। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের ভবিষ্যৎজীবন সুখের হোক।

চিঠি লিখিয়াই বেলার মনে হইল, সে চিঠির মর্ম্ম কি ভয়ানক! সে কি লিখিয়াছে! মুক্ত আকাশতল ভিন্ন এ পৃথিবীতে এখন আর তার যাইবার স্থান রহিল কোথায়? বেলার চোখে জল আসিল। তবু সে জোর করিয়া চোখের জল মুছিয়া লইয়া ভাবিল—আমি যারে ভালবাসি, তারে সুখী করিবার জন্য আমিতো করিবার কিছু বাকী রাখি নাই; সেইতো আমার সুখ!"

(৫)

"বেলা।" পিছনে ফিরিয়া বেলা দেখিল প্রফুল্ল। কি লজ্জা! বেলা ভাবিল কি লজ্জা, তবে কি প্রফুল্ল বাবু আজ চুরি করিয়া তার অন্তরের গোপন কথাটা শুনিয়া ফেলিয়াছেন!

প্রফুল্ল কাষ্ঠ হাসি হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন:—

"দান পত্তর খানা একবার দেখাবে বেলা?"

বেলা অত্যস্ত চাপা গলায় জবাব দিল:— "দান পত্র! কৈ না! আমি তো পাইনি!"

মিছে কথাটা তার মুখ দিয়া যেন স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইল না।

"তবে যে তুমি হেনাকে বল্লে, তুমি দান পত্র পেয়েছ?"

বেলা, রক্তহীন শুষ্ক মুখে বলিল —"মিছে কথা বলেছি!"

প্রফুল্ল অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—"তবে তুমি তাকে দান পত্র দেখালে কি করে?"

বেলা অস্থির ভাবে ছলছল চোখে, জোরে বলিয়া উঠিল!—"মিছে কথা, প্রফুল্ল বাবু,—মিছে কথা। আমি কোনো দানপত্র পাইনি! তাকে আমি জাল কাগজ দেখিয়েছিলাম! আমার কাছে কোনো দানপত্র নাই, ওরূপ কথা তাকে বলা আমার ভারি অন্যায় হয়েচে, বলবার কোনো কারণও ছিল না! তুমি তোমার বিষয় আশয় বুঝ, সুঝ্ করে নেও—আমি ইহার কোনো অধিকারের অধিকারী নই!"

বেলা হঠাৎ সাফাই করিতে গিয়াই এমন নাকাল ভাবে ধরা পড়িয়া গেল। প্রফুল্ল বাবু তার দুর্গের অতি দুর্ব্বল স্থানটী অতি অতর্কিত ভাবেই

আক্রমণ করিয়াছিলেন। নচেৎ মেয়েরা নিজেদের মনোমত সাফাই গড়িতে খাঁটী কারিকরদিগের চাইতে কোন অংশে খাটো নয়।

প্রফুল্ল তাই বেলার সাফাই অবিশ্বাস করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি যেন আজ হাসির ফোয়ারা! বেলার সাফাইর মধ্যেই আজ প্রফুল্লের অপ্রত্যাশিত রণজয়ের বিপুল আনন্দ নিহিত ছিল।

হাসিতে হাসিতেই প্রফুল্ল বলিলেন :- "জান বেলা, সে দানপত্র দেখে গিয়ে হেনা আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছে?"

বেলা নীরবে তার নীল চোখ দুটী তুলিয়া প্রফুল্লের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। প্রফুল্ল তার হাতে একখানা চিঠি দিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—তুমি আর কালীপ্রসাদ বাবুর উত্তরাধিকারী নও—বিষয় সব বেলার। বেলাকেই সব তিনি দান করে গেছেন। সে দানপত্র আজ আমি স্বচক্ষে বেলার কাছে দেখে এসেছি। আর এতদিন তুমি আমায় বলে আসছিলে, তুমিই কালীপ্রসাদের উত্তরাধিকারী—বেলা কেউ নয়! ভালবাসার মধ্যেই এত বড় চালাকি—ডিপ্লোমেসির স্থান আছে? ঠিক জেনো, যে পথের ভিখারী, হেনাকে বিবাহ করার আশা—তার পক্ষে দুঃস্বপ্ন মাত্র। চোখ মুছে ফেল, স্বপ্ন ভেঙ্গে যাক!"

বেলার চিঠি পড়া শেষ হইলে পর, প্রফুল্ল হাসিয়া বলিলেন :—হেনা ভালবাসিত আমাকে নয়—আমার বিষয় সম্পত্তিকে, দেখতে পাচ্ছি!

বেলা একটু কাশিয়া লইয়া ভীতস্বরে কহিল—"সে দানপত্র তো আর নেই, এখন বোধ করি, সে আবার তোমায় চাইতে পারে!"

বেলার কথার ভিতর দিয়া তৃষিতা চাতকিনীর নিরাশার রাগিণী খানিই যেন ব্যক্ত হইয়া পড়িল। প্রফুল্লের হৃদয়াকাশ তখন প্রেমের জলদ-জালে মোহন নীলকান্তরূপ ধারণ করিয়া তৃষিতা চাতকিনীর উৎক্ষিপ্ত শুষ্ক চঞ্চু-পুটের দিকে আপনি নামিয়া আসিল। তিনি আবেগপূর্ণ মধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"না না বেলা, আর আমায় ভুল বুঝো না—আমাকেও আর ভুল বুঝতে দিয়ো না। জীবনে একটা মস্ত ভুল প্রায় করে বসেছিলাম আর কি! কিন্তু ভগবান বড় দয়া করে আজ আমায় কাচ ও কাঞ্চনের ভেদ বুঝিয়ে দিয়েছেন। বেলফুলই আমার কণ্ঠের হার—হেনার ঝাঁজালো গন্ধ আমার সইবে কেন? সে যাক্—এখন বল দেখি বেলা, দানপত্রখানা কোথায় রেখেছ?"

বেলা মুখ নীচু করিয়া প্রচুর শিশিরপাতে হেলান নব-মল্লিকাটীর মতো, গাঢ়স্বরে, নিজকে নিজে সে তার হৃদয় দেবতার নিকট ধরা দিয়া বলিল—"তোমার ও হেনার মিলনের অন্তরায়—সেই দানপত্র! তাই তাকে পুড়িয়ে ফেলেছি!"

প্রফুল্ল প্রতিধ্বনির মত বলিয়া উঠিলেন :‒"পুড়িয়ে ফেলেছ?" বেলা কথা কহিল না! প্রফুল্ল অবাক হইয়া যেন দেখিতে পাইলেন—বেলা তো মানুষ নয়, সে যেন বিসর্জ্জনের প্রতিমা খানি! তাই প্রফুল্লও নিঃশব্দে বেলার মুখের পানে মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন! সে দৃষ্টি ভরিয়া কৃতজ্ঞতার অমৃত-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল!

সে সুন্দর অমৃতক্ষণে আকাশ হইতে ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি হইল না বটে, কিন্তু নীল আকাশ ভরিয়া তারকার স্বর্ণবৃষ্টি হইয়া গেল! শুক্লা নবমীর সুধা-চন্দ্র তখন মুক্ত বাতায়নের পাশে বঙ্কিম প্রেমের ছন্দে হেলিয়া পড়িয়া মুগ্ধ প্রেমিকযুগলকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। বাহিরের সবুজ দেবদারু গাছটা আজ সোণালি চাদনির পোষাক পরিয়া যেন একখানি মধুর স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, আর তার নিবিড় পত্রান্তর হইতে একটা নিদ্রাহীন সুকণ্ঠ পাপিয়া কোন পুরাকালের এক পারস্য রাজকুমারীর প্রেম-কাহিনী সম্বলিত একটা সুখ দুঃখ মাখা গজল গাহিয়া যেন সেই প্রেম-মুগ্ধ নব-দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিল!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

পিতা।

অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ ধর্ম্ম অর্থ কাম,—
হে তাত, তুমিই মহা সাধনা আমার!
তোমার আশীষে ক্ষরে সুধা অবিরাম,
তব পদ সন্তানের সর্ব্বতীর্থ সার।
তোমারি এ অস্থি মজ্জা, তোমারি এ প্রাণ
পূত সঞ্জীবনী-ধারা দিয়াছ কৃপায়,
তুমি ধাতা,—এই দেহ তোমারি তো দান,
তব প্রেম মন্দাকিনী বহিছে হিয়ায়।
লহ পদে তবদত্ত প্রেম অর্ঘ্যভার;
হোক্ এ মানব জন্ম সফল আমার!

আনন্দ-স্মৃতি।

মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর কথা লিখিয়া লইতে চাও, ভাল। তাঁহার অনেক কথা স্মৃতিপুস্তকে লেখা আছে; অনেক কথা স্মরণ করিয়া বলিতে হইবে। স্মরণ করিয়া বলিব, তাই বলিয়া কোন কথাই ভুলিয়া যাই নাই। বৃদ্ধের এ ছেঁড়া কাঁথা ছিঁড়িয়া যাইতে বসিয়াছে। এ হৃদয়ের পরতে পরতে তাঁহার উৎসাহের কথা, উপদেশের কথা, নূতন তালির ন্যায় তেমনি নূতন রহিয়াছে। আজ মহাত্মার মৃত্যু দিন, তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সহিত শেষ-দেখার কথাটীই বলিব।

১৯০৪ সনের কথা বলিতেছি। তিনি ৬ই এপ্রিল একবার এখানে আসেন। দুই এক দিন মাত্র ছিলেন। তখনই দেখিলাম, তাঁহার শরীর বড়ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চলিতে, বলিতে, দাঁড়াইতে আর যেন আগের মতন বল পান না। মনে কেমন একটা আশঙ্কা হইল। তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

কলিকাতা হইতে সংবাদ পাইলাম—ক্রমেই তাঁহার রোগ বাড়িতেছে। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে আর ঘরের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অধিক কথা বলিতে দেন না। আনন্দমোহন—লোকে বারণ মানে না; তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক—আসিতেছে, আর—যাইতেছে। এই অবস্থায় ডাক্তারগণ তাঁহাকে আর কলিকাতায় থাকিতে দিলেন না; দমদমায় যাইয়া থাকিতে বলিলেন। তাহাই হইল।

ক্রমে সংবাদ পাইতে লাগিলাম, তাহার ব্যারাম আরো বাড়িয়া যাইতেছে। বড়ই দুশ্চিন্তা হইল।

১৭ই ডিসেম্বর। কলিকাতা আসিয়া সংবাদ পাইলাম আনন্দমোহন একটু ভাল আছেন। দমদমায় যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম।

১১ টার পর সেখানে পৌঁছি। সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি উপরে ডাকিয়া লইলেন। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কত যে আনন্দ হইল, বলিতে পরিতেছিনা—কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অন্তরে বড় বিষাদের ছায়া পড়িল। ঘন ঘন কাশিতেছেন। কাছে বসিলাম, কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথম কথা ৺ শরৎ বাবুর সম্বন্ধে—তাঁহার জীবন-চরিত লিখা হইয়াছে কি না এবং তাঁহার স্মৃতি স্থাপনের জন্য

কি করা হইয়াছে ?—শরৎ বাবুর কে আছেন এবং তাঁহার ঋণ গুলি পরিশোধ হইয়াছে কি না ?

আমি একে একে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তিনি বলিলেন —"জীবন চরিত ছাপার ব্যয় ত আমি দিতে চাহিয়া ছিলাম, যত শীঘ্র পারেন ছাপা করিয়া ফেলুন।"

তারপর তিনি "চারুমিহির"ও চারুমিহিরের সহিত শ্রীযুক্ত জানকী বাবুর সংশ্রব ত্যাগের কথা তুলিলেন।

তিনি ময়মনসিংহের জল কষ্টের কথা তুলিয়া বলিলেন—"এ বিষয় ছোটলাট বাহাদুরের সহিত তাঁহার অনেক কথা হইয়াছিল। দেশের লোক এ সম্বন্ধে কি করিতে পারেন, তাহা তিনি শ্যামাচরণ বাবুকে এক পত্র লিখিযাছিলেন।" আমি বলিলাম জল-কষ্ট নিবারণ জন্য আমাদের দেশের লোকে অতি অল্পই করিতেছেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নানা কারণে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিত পারিতেছেন না। তিনি বলিলেন—"পূর্ব্বে ধনী লোকেরা পুষ্করিণী খনন করা ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন তাহাতে জল-কষ্ট দূর হইত, এখন স্থানে স্থানে কুপ খনন করিয়া জল কষ্ট নিবারণ করা যায়না কি ? আপনারা সহরে কলের জল পাইবেন, আর মফস্বলের লোকেরা একটু পুকুরের জলও পাইবে না, ইহা অতি অন্যায় কথা।"

ইহার পর তিনি কলেজ এবং ব্রাহ্মসমাজের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন—"কলেজের জন্য যে দান স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কলেজ রক্ষার পক্ষে উহা প্রচুর নহে। যেরূপ আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে অনেক টাকা না হইলে কলেজ চালান দায় হইবে। স্বাক্ষরিত চাঁদা শীঘ্র শীঘ্র আদায় করিতে যত্ন করিবেন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর কি কিছু করিতে পারেন না ?"

কিরূপে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি বাড়ে এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের অনুরাগ জন্মে, সে বিষয়ে অনেক সদুপদেশ দিলেন।

* * * * * *

এই সকল কথা হইতে হইতে রাত্রি হইল ; তখন খাবার প্রস্তুত হইয়া আসিল। আমি খাইতে বসিলাম, তিনি কাছে বসিয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি এখন আর অধিক কিছু খাইতে পারেন না। তাঁহার
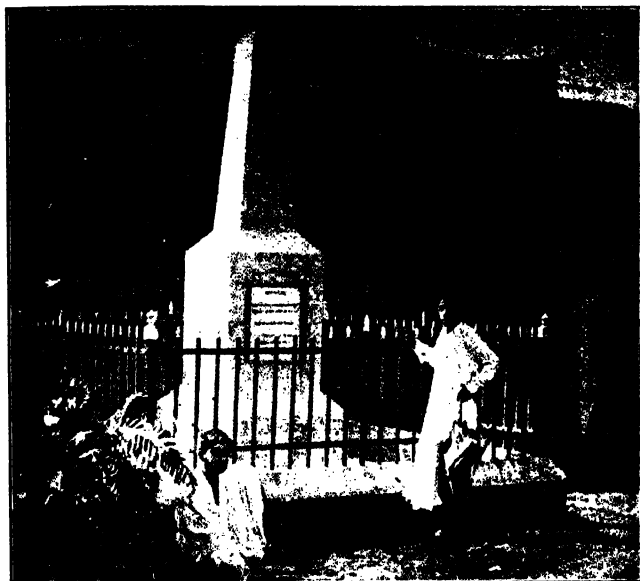
Here in the Premises

OF

The City Collegiate School, Mymensingh Branch

which were the town residence of his father

AND

Where commenced his brilliant career

AS A STUDENT

Lie the sacred ashes of illustrious

Ananda Mohan Bose.

Born August, 1847. *Died August, 1906.*

ASUTOSH PRESS, DACCA

উত্তর শুনিয়া মনে হইল, যখন খাওয়া কমিয়া গিয়াছে, তখন যাওয়ার সময়ের আর দেরী নাই।

এই আনন্দমোহন—মনে আছে, একবার ময়মনসিংহ আসিয়া একদিন অপরাহ্নে বাসায় বাসায় কি জল-যোগই না করিয়াছিলেন! তখন এক মোকদ্দমায় ময়মনসিংহ আসিয়াছিলেন। কাজের ভিড়ে বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা করিতে পারেন নাই; কিন্তু আনন্দমোহন কাহারও সহিত দেখা না করিয়া যাইবার লোক নহেন। কাজ শেষ করিয়া বিকালে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। তিনি যে বাসায় গেলেন সেখানেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা ও জল-যোগের আয়োজন। প্রথম এক বাসায় যাইয়া যখন তিনি উত্তমরূপে জলযোগ করিলেন, তখন মনে করিলাম অন্য বাসায় রেকাবের মিষ্টান্ন তেমনি রেকাবেই পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইল না। ক্রমে ক্রমে ৭।৮ খানা বাসায় জলযোগ করিয়া তিনি তাঁহার এক কুটুম্বের কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাগণ উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। সেখানে আহারের আয়োজন প্রচুর। আটখানি বাসায় ভোজনের পরও বিনা আপত্তিতে তিনি এখানে নানা প্রকারের পিষ্টক ও অন্যান্য সামগ্রী ভোজন করিতে লাগিলেন। পুরুষ সিংহ গ্লাডষ্টোনের সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম—He eats like a lion এখানেও তাহাই দেখিলাম।

রাত্রি হইল। শুক্লা দশমী। তাঁহার দমদমার বাড়ী ও বাগান চন্দ্রালোকে হাস্য করিতে লাগিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, মনে হইতে লাগিল, আনন্দমোহন—হায়, এই বিস্তীর্ণ বাগানে, প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে, রুগ্ন সিংহের ন্যায় দিন কাটাইতেছেন!

বিদায় লইয়া রাত্রি ১১টার সময় কলিকাতার বাসায় ফিরিলাম। এই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলাম, এ জীবনে আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল না। আজ তাঁহার মৃত্যুদিন, তোমাকে আজ তাঁহার এই কথা ক'টী বলিয়া হৃদয়ে তবু একটু সান্ত্বনা পাইতেছি।

———

নর্ম্মদা বক্ষে।

তখন বেলা অবসান। গোধূলির স্বর্ণ-কিরণচ্ছটা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমরা ধীরে ধীরে প্রকৃতির রম্য-নিকেতন মর্ম্মর-শৈলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। পশ্চিমাকাশের সেই কিরণ আমাদের পদতলে, নর্ম্মদা সলিলে প্রতিফলিত হইয়া উভয় তীরবর্ত্তী শুভ্র মর্ম্মরশৈলকে এক আনন্দ-সুন্দর সুবর্ণ খনিতে পরিণত করিয়াছে। কি সেই সুন্দর দৃশ্য! ঊর্দ্ধে অনন্ত উদার নীল আকাশ, নিম্নে স্বচ্ছ শীতল সুবর্ণ সলিলা নর্ম্মদা, মর্ম্মরশৈলের মধ্য দিয়া কল-কল-তানে প্রবাহিতা।

দূরে, অতি দূরে—প্রপাতের অবিরাম ঝম্ ঝম্ শব্দ কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। নৌকা ধীরে ধীরে চলিয়া নিরাপদ দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। একাদশীর চাঁদ আকাশে দেখা দিয়াছে। কৌমুদীর কোমল কিরণে সেই শুভ্র মর্ম্মর-শৈল কি যে এক অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়, মহান্ এবং গম্ভীর দৃশ্য লইয়া আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা যিনি উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই সুধু অনুভব করিতে পারিবেন। সেই কিরণ-আদ্র শৈলে হিল্লোলিত হইয়া বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে প্রতিক্ষণে যে কি এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিতেছিল ভাষায় তাহা বর্ণনা করা না। সে সুধু নয়ন ভরিয়া দেখিবার, আর প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিবার।

প্রপাতের দৃশ্য ও অনির্ব্বচনীয়। সেই ঊর্দ্ধে নর্ম্মদার জল স্রোত স্তরে স্তরে বাধা পাইতে পাইতে আসিয়া ভীম-নাদে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া নিয়ত নিপতিত হইতেছে; জল-চূর্ণ উড়িতেছে এবং তৎক্ষণাৎ বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে মিশিয়া যাইতেছে; সে দৃশ্য কি চমৎকার। বহু বৎসর পর আজও থাকিয়া থাকিয়া সেই প্রকৃতির মহান চিত্র মনে পড়িতেছে। আর মনে পড়িতেছে—অবিরাম গীতি-নিরত নদীর কলধ্বনি, আর এই অভ্রভেদী শুভ্র প্রাচীর মালা। এই উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া যে এক উন্মাদক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সৌন্দর্য্যে এক দিন বাস্তবিকই জগতের কর্ম্ম কোলাহল ভুলিয়া গিয়া অনন্ত পুরুষের মহান সত্তা ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ সেই মর্ম্মর শৈলের চিত্র-পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

ণ আর র

(ললাটিকা—পূর্ব্বে এদেশে বর্ণপরিচয়কালে লোকে মূর্দ্ধন্য ণকে 'আণ' পড়িত। এই কবিতায় যেইখানে মূর্দ্ধন্য ণ পৃথক্ আছে সেইখানে "আণ" পড়িতে হইবে, নতুবা ছন্দ পসন্দ হইবে না, অর্থ বোধও হইবে না। "আণ" অর্থ, আন, নিয়ে এস। রকে 'অন্তস্থ' বা বয়ে শূন্য' এইরূপ বিশেষণ দিয়া না পড়িয়া সুধু র পড়িতে হইবে কিন্তু একটু জোরে। 'র' অর্থ রও,- রহ, অপেক্ষা কর। ইতি বঙ্গচন্দ্রঃ

গিন্নীর বিদ্যা ধায়নি কখনো
বর্ণাবলীর বাইরে,
সে-টা যে তেমন কম নয় কিছু
বোঝাব তোমায়, ভাইরে!
দুই কুড়ি আর ছয়টা অক্ষর
বাদ দিলে দীর্ঘ ৯,
করে দিন রাত মগজে গিন্নীর
হিলি-হিলি কিলি-ক্লী।
দীনা সে শিক্ষায়, কেবলে একথা?
কার কাছে কবে হীনা?
পথ চেয়ে আছি কখন বাগ্দেবী
হাতে দিয়ে যান্ বীণা।
সকল অক্ষর লাগেনাকো কাজে
একটী করেছে সার।
শয্যাত্যাগ হ'তে শয্যাগ্রহণে
'ণ' 'ণ' চমৎকার।
নাই চাল 'ণ' নাই ডাল 'ণ'
ণ তেল, নুণ 'ণ'।
বিষম ফাঁফরে পড়িয়া শর্ম্মা
কসে ধরেছেন 'র'।
'ণ' শাঁখা সাড়ী, 'র' 'র' দেরী,
'ণ' বালা, 'ণ' মালা,
'র' 'র' কিছুকাল একিরে জঞ্জাল,
কাণ হ'ল ঝালাপালা!

হায়রে বরাত, দীর্ঘ দিন রাত
অক্ষর কাটাকাটি।
ভীষণ আনন্দে চলেছে আমার
সংসার পরিপাটী।
বেদাধ্যায়ী দাদা, দেখ একবার
ভাণ্ডারে কি কিছু আছে,
অক্ষর শিক্ষার মতন উপাধি
যুতে দিতে পার পাছে?
"ভাবতীর" তরে করিনে কাকুতি
"রত্ন-প্রভা" কাজ নাই,
'অক্ষরচঞ্চু' কিম্বা 'ণ নিধি'
দুয়ের একটা চাই।
রস জানা তার আছে চতুর্ব্বিধ,
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়।
অংলঙ্কার শাস্ত্রে বিলক্ষণ জ্ঞান
সকল নারীর শ্রেয়।
আমি জানি গিন্নী জানে "মেঘনাদ"
বুঝি "ণ" উচ্চারণে
"বধ" না হলেও "বধের" আস্বাদ
সদা টের পাই রণে।
"বৃত্র সংহার" নাহি জানে যদি
বেত্র সংহার জানে,
পিঠে ছালাবেঁধে থাকি রাত দিন
কি জানি কখন হানে।
'কবি কঙ্কণের' বোঝে সে 'কঙ্কণ'
'চণ্ডী'—সে প্রচণ্ডা নিজে।
এক মুখে আর বুঝাইব কত
বিদ্যা তাঁহার কি-যে।
'অক্ষরচঞ্চু'—কিম্বা 'ণ-নিধি'—
দুয়ের একটা চাই,
গিন্নি দেবীর দেড়গজী নাম
জন্মান্তর হোক্ ভাই।

পরশুরামগীর সন্ন্যাসীর নবরত্ন মন্দির।   মধুপুর, ময়মনসিংহ।

শ্রীনাথ প্রেস, ঢাকা

সৌরভ

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল। { ২য় সংখ্যা।

ইতিহাসের উপকরণ।

(দলিল পত্র)

বিংশ শতাব্দীর এই নবযুগে প্রাচীনের আদর ও সম্মান বহু পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে। প্রাচীনকে দেখিয়া নবীন আর তেমন নত হইয়া চলেন না ; প্রাচীন আদব-কায়দা সমাজ হইতে বিদায় লইতেছে ; প্রাচীন পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্র সমাজে স্থান পাইতেছে না। সেকালের বিচার, ব্যবস্থা, রীতি-নীতি—এক কথায় সমাজের বহু প্রাচীন সম্পদ সমাজ দেহ হইতে একে একে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে।

প্রাচীনের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞার ভাব সকল ক্ষেত্রে সমীচীন নহে। বাঙ্গালার পল্লি-গৃহে বহু প্রাচীন দলিল-পত্র আবর্জ্জনার ন্যায় স্তূপীকৃত থাকিয়া কীট ও মূষিক কুলের অত্যাচারে লয় পাইতেছে। শিক্ষিত সমাজ অনেক স্থলে ঐ সকল আবর্জ্জনা দুরীভূত করিয়া স্ব স্ব গৃহকে মূষিকাদির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতেছেন। অশিক্ষিত গৃহস্থ পিতৃপিতামহপরম্পরাগত ঐসকল পৈত্রিক সম্পত্তি তৈল-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া গৃহ-কোণের আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিতেছে। ফল উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় তুল্য হইতেছে। উহাদের উপযোগিতার প্রতি আস্থাবান লোকের সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং সমাজের ঐ সকল মহামূল্য সম্পদ অনেক স্থলেই অনাদরে ও উপেক্ষায় বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

একজন বর্ষীয়ান্ স্থবিরের সম্মুখে বসিলে তাঁহার শুষ্ক জীর্ণ দেহের ভিতর দিয়া যেমন অতীতের একটা অজ্ঞাত অবস্থার আভাস উপলব্ধি হয়, তাঁহার

প্রতি নিশ্বাসে যেমন তাঁহার অতীত জীবনের ইতিহাস সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়; তাঁহার প্রতি অতীত কাহিনীর ভিতর যেমন তদানীন্তন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত দৃষ্ট হয়; প্রাচীন কীট-দষ্ট দলিল-পত্র এবং বিবিধ লেখ্য-গুলিতেও সেইরূপ—ঐ সকল প্রাচীন লিপির এক এক খানির জীর্ণ ও ক্ষীণ অস্তিত্বের ভিতর আমাদের প্রাচীন সমাজের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বিচার-ব্যবস্থার একটী প্রকৃত সত্য চিত্র জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে তদানীন্তন রাজ-নৈতিক, সমাজ-নৈতিক, অর্থ-নৈতিক—নানাবিধ তত্ত্বই ঐসকল জীর্ণ-পত্রের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই মহামূল্য উপকরণগুলি যে অযত্নে ও উপেক্ষায় দিনে দিনে কালের কুক্ষিগত হইতেছে ইহা নিরতিশয় পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

এই প্রবন্ধে আমরা ঐ প্রকারের কতকগুলি দলিল দস্তাবেজ ও চিঠি-পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিব, তদ্দ্বারা যে কেবল ঐসকল লিপি ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া এক শ্রেণীর মানবের কৌতূহল পরিতৃপ্তির কারণ হইবে তাহা নহে; আশা আছে উপযুক্ত জহুরী উহা হইতে অনেক রত্নোদ্ধার করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধনেও সমর্থ হইবেন।

এই প্রবন্ধে আমরা যে সকল দলিল পত্রাদি উপস্থিত করিতে পারিব, তাহাদের কাহারও বয়স ১৩০ বৎসরের অধিক নহে। ইতিহাসের হিসাবে একশত ত্রিশ বৎসর সময় কিছুই নহে। কিন্তু এই সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই আমাদের দেশে ও সমাজে এক মহা বিপ্লবের অবতারণা হইয়াছে। সুতরাং যে সকল সাক্ষীর মুখে ঐ বিপ্লব-কালের যথার্থ ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইবে তাহাদের “জবান বন্দী”র মূল্য অকিঞ্চিৎকর নহে।

তখন ইংরেজ রাজত্ব নব স্থাপিত, মোসলমান-রাজ্যতান্ত্রিকগণ কয়েক শত বৎসর এ দেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে. তাঁহাদের তখনকার দুর্ব্বল ও অক্ষম হস্ত হইতে যখন রাজদণ্ড স্খলিত হইতেছিল এবং হিন্দু রাজন্যগণ নানা বিভাগে প্রাধান্য লাভ করিয়া যখন সাম্রাজ্য লাভের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সেই সময় অদম্য শক্তিশালী মহা-উদ্যমশীল ইংরেজ যেন সকলকে উপহাস করিয়া পলাসির আম্র-কানন হইতে রাজদণ্ড কুড়াইয়া লইলেন। ইংরেজের বিপুল শক্তিমত্তায় আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গবাসী যে সময়ে সেই বৈদেশিক জাতির হস্তে সর্ব্বথা আত্মসমর্পণ করিয়াছে

আমাদের উপস্থিত দলিল পত্রাদির কার্য্যকাল সেই সময় হইতে সূচিত। সুতরাং পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে আসিয়া আমাদের এই বঙ্গীয় সমাজ যে কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল তাঁহার অনেক আভাস এইরূপ জীর্ণ দলিল-পত্রে প্রতিফলিত দৃষ্ট হইবে।

১ম দলিল—একখানা কাপপত্র—বোধ হয় ক্ষতিপূরণ পত্র।

এক ভদ্রলোকের নফর অপর ভদ্রলোকের ঘরে চুরি করিয়াছিল, প্রভু নফরের চুরির ক্ষতি পূরণ করিতে যাইয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিতেছেন। দলিলখানা কীটদষ্ট, সকল কথা পড়া যায় না। সে সময়ে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাসও ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে! দলিলখানা এইরূপ—

৭ ইআদি কীর্দ্দ শ্রীরাম * * চৌধুরী সদাশয়েষু—লিখিতং শ্রীরাম শঙ্কর উম কশ্য কীপ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমার নফর আপনের ঘর চুরি করিয়া জিনিষ আনিয়া ছিল * * * তাহার মাহাফিক * * সম্মতি ক্রমে মবলক ৪০ চল্লিশ রূপাইয়া কীপ দিলাম * * * রোজ মৈধ্যে মহাফিক কিস্তবন্দী * * ইআ * নিসা দিবাম * * * তার বন্দবস্ত রহিল না * * ইতি ১১৯০ তা ৮ আসার।

২য় ও ৩য় নং দলিল দুই খানা চাকুরীর কবুলিয়ত। দলিল দুই খানা এইরূপ—

(১) "ইয়াদি বীর্দ্দ শ্রীরাজচন্দ্র চৌধুরী সদাশয়েষু—লিখিতং শ্রীবিনন্দ রাম দেও কস্য কবোলত পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমি আপনের গৃহস্তির চাকুরী করিবার কবোলত দিলাম আমার মাহেনা সয়াই খুড়াক বছর্ছর মবলগ ১১ এঘার টাকা * * মাহেনা পাইবাম চাকুরির মদ্দত * * মাস করিবাম ইহাতে কুসুয়েক কথায় বাউল্যতা করিয়া চাকুরী না করি তবে আপনের * * নিশা করিব বিনা উর্জর ইতি সন ১২১৪ তা * *

(২) মহামহিম শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বরাবরেষু—লিখিতং শ্রীজগন্নাথ দাসস্য কবোলত পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমী মহাশয়ের সরকারে গ্রিহস্তি চাকর হইলাম আমার * * সেয়ায় খোরাক বছর্ছর মবলগ ৬ ছয় টাকা সিক্কা পাইবাম চাকু * * এক বছছর ভরিয়া চাকুরি করিবাম হামেসা রোযু থাকি গ্রিহস্তির জে কার্জ্য কর্ম্ম হয় করিব এহাতে আমার গাফিলতে চাকুরি না করি তবে নিশা করিব ইতি সন ১২২৪ তা ১২ মাঘ।"

১২১৪ সালে একজন গৃহস্থীর চাকরের বেতন বার্ষিক ১১৲ টাকা আবার দশ বৎরস পরে দেখা যায় একজন ঐরূপ চাকরের বেতন বার্ষিক ৬৲ টাকা ছিল। বোধ হয় অজন্মা বা ঐরূপ কোন কারণে এরূপ ঘটিয়াছিল। ভৃত্যের জাতি অনুসারেও বেতনের তারতম্য হইতে পারে। প্রথমোক্ত দলিলের চাকরটী ছিল শূদ্র জাতীয়, দেও উপাধি ধারী ; আর দ্বিতীয় দলিলের চাকরটী ছিল চাষীদাস—বা মাহিষ্য।

অনেকেরই বিশ্বাস পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার ফলে দেশে দলিল পত্রাদি সম্পাদনের বাহুল্য দেখাদিয়াছে। সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কিন্তু এই ধারণা সত্য বলিয়া মনে হয় না। দলিল সম্পাদনের প্রথাটী আমাদের সমাজের একটী প্রাচীন প্রথা। প্রাচীন দলিল পত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সে কালে অতি সামান্য কারণেও দলিল সম্পাদিত হইত। কোম্পানীর নিযুক্ত চৌকিদার বাড়ী বাড়ী পাহাড়া দিবে—তাহাতে ও দলিল সম্পাদন চাই। নিম্নে এইরূপ এক খানা দলিল প্রদত্ত হইল।

"লিখিতং শ্রীদেবোরাম চকীদার কস্য কবোলত পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে পং খালিযুড়ী কিং নিজ খালিযুড়ী আপনেরদিগের জীবিকায়ের খানেবাড়ীর চকীদারিতে মুর্ক্রার হইলাম হামেসা হাজির থাকিয়া ৺ কম্পানীর হুকুম মতে কার্জ্জ করিবাম ইহাতে গাফিলি করিয়া কার্জ্জ না করি তবে ইহাতে কীন্তু যেক * মকর্দ্দমা * * * করিয়া আপনেরদিগের * লুকসান হয়ে আমার জীর্ম্মা আমার মাহেনা মাসিক ইসীম নীবাসী মতে পাইবাম ইতি সন ১২২৩ তা ২২ আশ্বিন।"

সে কালে পত্রের প্রারম্ভ স্থলে লেখকের নাম লিখিয়া পরে বিবরণ লিখিবার রীতি ছিল। পূজ্য ব্যক্তি বা দেবাদির নাম নিজ নামের নীচে লিখিলে উহাদের প্রতি অভক্তি প্রকাশ পায়—ধারণাছিল। সুতরাং পত্রমধ্যে পূজ্য ব্যক্তিদিগের নামাদি লিখিবার প্রয়োজন হইলে ঐ নামের স্থলে চিহ্ন দিয়া পত্রের শিরোদেশে নামটী লেখা হইত।

বিশেষ সম্মান সুচক শূন্যগর্ভ ৺ বৎ চিহ্নটী, যাহার সাঙ্কেতিক অর্থ ঈশ্বর বা তদ্রূপ কিছু কল্পিত হয়, উহার ব্যবহার তখন অত্যধিক প্রচলিত ছিল। যথা ৺ মঙ্গলচণ্ডী ঠাকুরাণী, ৺ কাশীধাম, ৺ রাধারমন শিরোমণি, শ্রীযুক্ত ৺ কালিকাপ্রসাদ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ৺ পিতামহী ঠাকুরাণী ইত্যাদি।

সে কালে মাননীয় রাজ কর্ম্মচারী ও রাজস্থানীয় কোম্পানীর নামের

পূর্ব্বেও ঐ মহাসম্মান সূচক চিহ্নের ব্যবহার হইত। পূর্ব্বোক্ত চৌকীদারের দলিলেও "৺ কম্পনি" শব্দ দৃষ্ট হইবে। এইরূপ বহু দলিল পত্র হইতে নিম্নে মাত্র একখানার প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীরামনরসিংহ শর্ম্মনঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ সীরঞ্চাগে আপনের দ্বিগের মঙ্গল পরিচিন্তী বিশেষ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাতা হইলাম খাচক ওয়ালিসের নালিসি মোকর্দ্দমায় শ্রীকালিকাপ্রসাদ চৌধুরী খাচকের যে একরার রাখেন সেহী একরার এথাকার ৺ জজসাহেব নিকট গোজরাইযা সাহেবের চিঠি তথাকার সিটী জজ নিকট পাঠাইতে হবেক অতএব * * ইতি সন ১২১৮ তা ৪ আশার।"

অধুনা এ সম্মান নাই। দেবতা, দেব বিগ্রহ, তীর্থস্থান ও ব্রাহ্মণাদিরও এ গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে কদাচিত উহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পিতা মাতা প্রভৃতি মুখ্য গুরুলোকদিগেরও উহা হারাইতে বোধ হয় আর অধিক বিলম্ব নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

মধুপুরে সন্ন্যাসী কীর্ত্তি।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী অধ্যায় উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। সেই বিদ্রোহের কঙ্কাল লইয়াই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আনন্দ মঠের প্রাণ উত্তর বঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ যে কেবল উত্তর বঙ্গেই প্রধূমিত হইয়াছিল, তাহা নহে। এই বিদ্রোহ সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া ইংরেজ রাজত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ওয়ারেন্ হেষ্টিংস বিদ্রোহ দমনে অশক্ত হইয়া রাজ্য রক্ষার আশায় একেবারে নিরাশ হইয়াছিলেন। নিরাশ চিত্তে তিনি সার জজ কোলব্রুককে লিখিয়াছিলেন—"We had every reason to suppose the Sannasee

মধুপুরের সন্ন্যাসী দুর্গ। ময়মনসিংহ।

Fakir had entirely evacuated the Company's possessions." —বিপ্লব এতদূরেই অগ্রসর হইয়াছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যখন কালের ভীষণ ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই দুর্দ্দিনে নিম্ন বঙ্গের প্রান্তরে প্রান্তরে সহসা পঙ্গপালের ন্যায় সন্নাসিগণ প্রবেশ করিয়া অধিবাসিগণের শেষ আশার ফল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। দেশের পরিণাম চিন্তা করিয়া গবর্ণার ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ভীত হইলেন। তিনি Captain Thomson কে সসৈন্যে সন্ন্যাসী দমনে প্রেরণ করিলেন। সন্ন্যাসীরা কাপ্তানকে হত্যা করিয়া ও ইংরেজ সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিজয় উল্লাসে অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিল; দেশের অগণন অধিবাসী অনোন্যপায় হইয়া এই দস্যুদলে যোগদান করিল; ফলে গ্রাম নগর দগ্ধ ও শেষে কোম্পানীর চালানী রাজস্ব পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

দেশের এই ভীষণ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া হেষ্টিংস সন্ন্যাসীদিগের বিরুদ্ধে তিনদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। Captain Edwardes, Captain Stewart, Captain Jones তিন দিক হইতে সন্ন্যাসী দলনে অগ্রসর হইলেন।

তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্ন্যাসীদল প্রথমে একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর কাপ্তান এডোয়ার্ডস কে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাহারা ব্রহ্মপুত্র তীরে উপনীত হইল, এবং গারোপাহাড়ের নিবিড় অরণ্যে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইল। এই সংবাদ প্রাপ্তিতে হেষ্টিংস আরও নিরাশ হইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন সন্ন্যাসীরা সুবিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিতে বিফল মনোরথ হইয়াছে, তখন তিনি বিপুল উৎসাহে তাহাদিগের বিরুদ্ধে আরও সৈন্য পরিচালনা করিলেন। সন্ন্যাসীরা বিপদ বুঝিয়া কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া রহিল এবং মধুপুরের নিবিড় অরণ্যের এই নিস্তব্ধ বক্ষই তাহাদের কার্য্য ক্ষেত্রের প্রশস্ত স্থান মনে করিয়া তথায় এক সুদৃঢ় দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিল।

এই সময় সন্ন্যাসীদিগের ভীষণ অত্যাচারে ময়মনসিংহ প্রপীড়িত হইতে লাগিল। তাহারা এক দল জামালপুর (সন্ন্যাসীগঞ্জ), একদল মধুপুর ও অন্য দল জামালপুর হইতে মধুপুর আসিবার পথে বওলা গ্রামে আড্ডা স্থাপন করিয়া চারিদিকে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অত্যাচার প্রপীড়িত
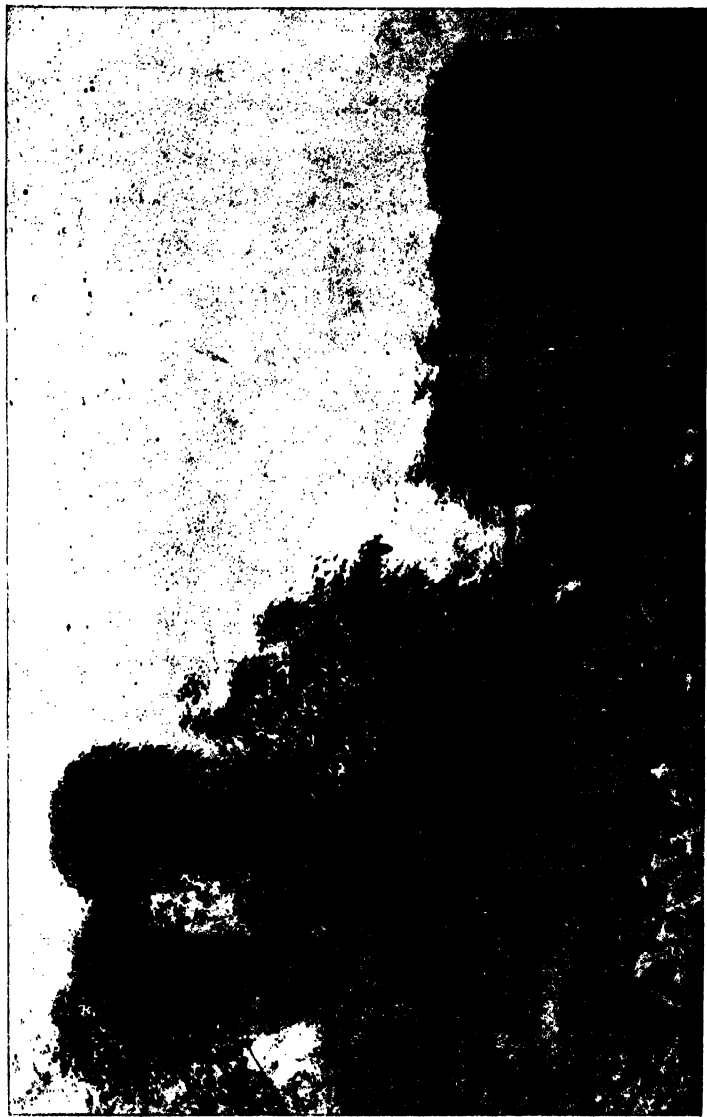
মধুপুরের সন্ন্যাসী কীর্ত্তি। ময়মনসিংহ।

জমিদারগণ রেভিনিউ বোর্ডে প্রতিকার প্রার্থী হইলেন। যথা সময়ে সন্ন্যাসী-অত্যাচার দমন জন্য সন্ন্যাসীগঞ্জে এক সেনানিবাস (Cantonment) স্থাপিত হইল। সন্ন্যাসীদল স্থান পরিত্যাগ করিল; কিন্তু দেশে অত্যাচারের স্রোত ফিরিল না। অতঃপর ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হইলে এ অঞ্চলের সন্ন্যাসী বিপ্লব অল্পে অল্পে নিবারিত হইতে থাকে।

সন্ন্যাসী বিপ্লব ধীরে ধীরে বিদূরিত হইতে থাকিলেও সন্ন্যাসী জয়সিংগীরের দল ইহার পরও কিছুকাল পর্য্যন্ত মধুপুরে প্রবল থাকিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের শান্তিভঙ্গ করিতেছিল। অবশেষে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংগীর ধৃত হইয়া ফাঁসী কাষ্ঠে লম্বিত হইলে এ জেলা হইতে সন্ন্যাসী অত্যাচার একেবারে তিরোহিত হয়।*

এই সন্ন্যাসীদিগের বংশধরগণ এখনও মধুপুরের নানা স্থানে বাস করিতেছে। বওলা গ্রামে ও মধুপুরের নিবিড় অরণ্যের স্থানে স্থানে সন্ন্যাসী-দিগের বহু কীর্ত্তিস্তম্ভাদির চিহ্ন বিরাজিত থাকিয়া আজও বহু প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বওলা গ্রামে সন্ন্যাসীদিগের দুইটী মন্দির অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় এবং তাহাদের বাসস্থানের কয়েকটী ধ্বংস স্তূপ করাল কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মধুপুরে—বংশ নদীর উভয়তীরে-সন্ন্যাসীদিগের বিস্তৃত কীর্ত্তি কলাপের পতনোন্মুখ স্মৃতি বিরাজ-মান। নদীর পশ্চিম তীরে পরশুরামগীর সন্ন্যাসীর বাস ভবন ও নবরত্ন মন্দির বিদ্যমান। যাহারা এই নবরত্ন দেখিয়াছেন তাঁহারা প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

সন্ন্যাসীদিগের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া বহু জমিদার ইহাদিগকে অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই নিষ্কর ভূমির অধিকাংশই এইক্ষণে ইহাদের বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইয়াছে। অবশিষ্ট যে সামান্য ভূমি আছে তাহার আয় দ্বারাই এই নবরত্ন স্থিত মহাদেবের প্রাত্যাহিক পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। নবরত্ন মন্দিরের সন্নিকটে পরশুরামগীর সন্ন্যাসীর আর একটী ভগ্ন ভবন। উহা এখন তাহার দুর্ভাগ্য বংশধরদিগের গোশালায় পরিণত হইয়াছে। নদীর পূর্ব্ব তীরে জয়সিংগীর সন্ন্যাসীর

---

* যাঁহারা সন্ন্যাসী বিপ্লবের বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "ময়মনসিংহের ইতিহাসে" তাহা পাঠ করিতে পারেন। লেখক।

বাস ভবন ও মঠ মন্দির বিদ্যমান। ইহাও এখন পরিত্যজ্য অবস্থায় আছে। মন্দিরস্থিত মহাদেবের কোন অর্চ্চনাদি হয় না। ইহার অনতিদুরে দুইটী মঠ, দুইটী দ্বিতল এবং ত্রিতল ভবনের ভগ্নাংশ, একটী খিলান করা বাংলা এবং লতা গুল্মে আবৃত ইন্দারা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আশে পাশে যে কয়েকটী পুষ্করিণী আছে তাহার অবস্থাও শোচনীয়। এই মঠ মন্দিরগুলি হইতে অল্প দুরে অন্য একটী চতুস্তল ভবনের এক পার্শ্ব আজ পর্য্যন্ত উন্নত অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই সকল স্থানে বিজন অরণ্য ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আবাস ছিল; অধুনা তাহা কর্ষিত পাট ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

পাটের চাষে দেশের যতই ধন বৃদ্ধি (?) হইতেছে, ততই জমির প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতেছে এবং অর্থ লোলুপ জনগণের ক্ষুধিত দৃষ্টি দেশের যত জীর্ণ ভগ্ন প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের উপর নিপতিত হইয়াছে। ফলে অতীত গৌরবের স্মৃতিমণ্ডিত এই প্রাচীন অট্টালিকা, মঠ, মন্দিরগুলি যাহা রৌদ্র, বৃষ্টি, বাত্যা, ভূকম্প হইতেও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা দেশবাসীর নির্দ্দয় হস্ত তাড়ানায় নালিতা ক্ষেত্রের জন্য স্থান অবসর করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে! এইরূপেও দেশের ঐতিহাসিক সম্পদগুলি লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্য-অন্তরালে, লোক লোচনের অগোচরে এখনও বহু ধ্বংসমুখ-স্মৃতি বিরাজ করিতেছে, আমরা ক্রমে তাহা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

গল্পের মুল্য।

কেতাবে কোরাণে পড়িয়াছি জীবন অমূল্য। আমার কিন্তু সে কথা মোটেই বিশ্বাস হয় না। মানব জীবন যদি অমূল্যই হয়, তাহা হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গোটা দুই অন্তঃসারশূন্য ছাপ লইবার জন্য এই 'অমূল্য' জীবনের তেইশ বৎসর কাটাইলাম কেন? বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিতেছি লাভের অপেক্ষা লোকসানই বেশী দাঁড়াইয়াছে। প্রথমেই ধরুন পড়ার ব্যয়। হেয়ার স্কুলের এ, বি, সির শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের এম্, এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িতে স্কুলকলেজের

বেতন, প্রাইভেট মাষ্টারের দর্শনী, পরীক্ষার সেলামী, একরাশি পুস্তক খরিদ, ট্রাম ভাড়া, কলেজে জল খাবার (সিগারেটের বলাই নাই, সে খরচ বাঁচিয়া গিয়াছে) প্রভৃতিতে কম করিয়া ধরিলেও সাত হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছে। তাহার পর ধরুন স্বাস্থ্য। এই কয় বৎসরের পরিশ্রমে শরীর আর নাই—ডাল ভাত চচ্চড়ি কি এই জাহাজী বিদ্যার খোরাক যোগাইতে পারে। ফলে ক্ষীণ দৃষ্টি, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, রুগ্নশরীর, স্ফুর্ত্তিহীনতা হইয়াছে—অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত। বলিব কি এই তেইশ বৎসর বয়সেই দুই চারিটা চুল পাকিয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া বুঝিয়াছি আয়ুও যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। তাহার পর ধরুন সময়। জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট যে তেইশ বৎসর তাহা একজামিনের তাড়ায় ভয়ে ভয়ে চলিয়া গিয়াছে—একদিনও স্বস্তিলাভ হয়, শুধু পড়া আর একজামিন। জীবনের নাকি মহা সুখের ব্যাপার বিবাহ, আমার সে বিবাহ পর্য্যন্ত করিবার অবকাশ হয় নাই—বাবা শুধুই বলিয়া আসিয়াছেন। "বিবাহের সময় আছে, পাশের সময় নাই—আগে পাশ, তাহার পরে বিবাহ।" তাহার পর ধরুন মূল্য। এখন বিএ পাশের মূল্য রোজ এক টাকা কি দেড় টাকা; যাহার মুরব্বীর জোর আছে এবং যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন সে রোজ মজুরী দুই টাকাও পাইয়া থাকে। আমার মত এম্, এর মূল্যও তাই—ঐ দুই টাকা। তবে যদি ঘর বাড়ী আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণ বেড়িয়া সবডিবিসনের এলাকাধীন গোবিন্দপুরের উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে দুই বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিয়া যাইতে সম্মত হই, তাহা হইলে দিন মজুরী আড়াই টাকাতেও উঠিতে পারে। আপনি হয় ত বলিবেন, এম্, এ পাশেরও ত একটা সম্মান আছে? সে দিন আর নাই মহাশয়! গল্প শুনিয়াছি পরলোক গত কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় যখন বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, তখন বি, এ পাশ ছেলেকে দেখিবার দূর গ্রাম হইতেও লোকেরা আসিয়া ছিলেন। এখন আর সে দিন নাই—এখন পথে ঘাটে হাটে মাঠে বিএ, এম, এ, গড়াগড়ি যাইতেছে। এম, এ পাশের যদি সম্মান থাকিত, তাহা হইলে আমি আজ এই গল্প লিখিতে বসিতাম না। গল্পটা আপনারা শুনুন।

এম, এ পাশের পর বাবা বলিলেন "হয় বি, এল পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল, আর না হয় এটর্নীর বাড়িতে বাহির হও।" আমি ঐ দুইটাতেই নারাজ।

আমরা জমিদার মানুষ; আমি বাবার একমাত্র সন্তান; বিষয়ের নিট মুনাফা প্রায় ষাটি হাজার টাকা। এ অবস্থায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য তেমন একটা তাড়াতাড়ি না করিলেও চলে। আমার ত ইচ্ছা যে এখন বিবাহ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের সেবা করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিই। বাবাকে কি আর এত কথা বলা যায়; তাঁহাকে বলিলাম "উকীল কি এটর্নী হইবার আমার ইচ্ছা নাই; ওদিকে আমার মনই যায় না" বাবা বোধ হয় একটু নিরাশ হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তা হ'লে একটা কাজ কর। আমি অনেক দিন থেকে মনে কোরেছি যে একটা অভ্রের খনি নেবো; একটা খনিও কিনুতে পাওয়া যায়। তুমি যদি দেখা শুনার ভার নেও, তা হ'লে সেটা কিনে ফেলি।"

বাবার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু স্থির। অভ্রের খনি আমি চালাবো! অভ্র জিনিষটা কি, সেই জ্ঞানই আমার নাই; বিবাহের শোভাযাত্রায় অভ্রের গেলাসের মধ্যে বাতি জ্বলিতে পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া অভ্র কোন দিন হাতে করিয়াও দেখি নাই, তাতে পৃথিবীর কি কাজ হয় তাহাও জানি না। রেলে যাতায়াত করিবার সময় রাণীগঞ্জ অঞ্চলে পাথুরিয়া কয়লার খনি দেখিয়াছি; কিন্তু কোন দিন কোন খনির মধ্যে যাই নাই। এদিকে জীবনের তেইশ বৎসর "সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিয়া কাটাইলাম; ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পাশ করিলাম; কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কেতাবেই ত অভ্রের কথা পড়ি নাই। পড়িলাম একরাশি দিশি বিদেশী সাহিত্য আর কাজ করিতে যাইব অভ্রের খনিতে! তখন মনে হইল আমার এক বন্ধুর কথা। তিনি ভূতত্ত্বে এম, এ পাশ করিয়া জীবন বিমা আফিসের ম্যানেজার হইয়াছেন। আমারও দেখিতেছি সেই রকমই হইবে।

বাবার কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তিনি আমাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন "এখন এসব কথা থাক্; তুমি মাস কয়েক বিশ্রাম কর; তাহার পর যাহা হয় একটা স্থির করা যাবে।" আমি আপাততঃ কিছুদিনের ছুটী পাইলাম। এখন আর পরীক্ষার ভ্রূকুটী নাই—এখন বিশ্রাম! শুনিলাম বাবা আমাকে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের অবকাশ দিবেন না—তিনি আমার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমার ছুটী! কিন্তু এতকাল পড়াশুনা করিবার পর কি হাত পা ছড়াইয়া

বিনাকাজে দীর্ঘ দিন রাত্রি কাটান যায়? কিন্তু কি করিব—একটা কাজ ত চাই। সহসা খেয়াল উঠিল যে, এতদিন ত বিদেশী ভাষা পড়া গেল, এখন দিন কয়েক মাতৃভাষার সেবা করা যাক্। সেবা করা ত স্থির করিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া কি দিয়া সেবা করি। বাঙ্গালা লেখাত কোন দিনই অসে না। আর লিখিবই বা কি? পদ্য—জান কবুল, আমি পদ্য লিখিতে পারিব না—এই বয়সে আঙ্গুল গণিয়া চোদ্দ অক্ষরে ঠিক করিতেও পারিব না, আর মিলের জন্য গলদঘর্ম্মও হইতে পারিব না। তার পর শ্যামের বাঁশী, চাঁদের জোছনা; গোলাপের সুবাস, কুঞ্জকুটীর—দোহাই ধর্ম্মের, এ সকলের মধ্যে আমার 'প্রবেশ নিষেধ'। আমি তোমাদের বাড়ী ভাত রাঁধিতে রাজী আছি কিন্তু কবিতা লিখিতে রাজী নহি।

হঠাৎ মা বীণাপাণি আমাকে প্রত্যাদেশ করিলেন, "কি ভয় বাছনি! তুমি ছোট গল্প লেখ। আমার বরে তুমি সিদ্ধমনোরথ হইবে।" আমি বলিলাম "তথাস্তু।"

তখন কয়েকদিন চৈতন্য-লাইব্রেরীতে আনাগোনা করিতে লাগিলাম। যত বাঙ্গালা ছোট গল্পের বই আছে তাহা পড়িয়া ফেলিলাম; মাসিক পত্রে যত ছোট গল্প ছাপা হইয়াছে সমস্ত পাঠ করিলাম। তখন বুঝিতে পারিলাম বাঙ্গালা দেশে কেমন ছোট গল্প চলে! তাহার পর বিলাতী ছোট গল্পের যত বই আছে, ফরাসী ছোট গল্পের যত ইংরাজী অনুবাদ আছে, তাহার অনেকগুলি পড়িয়া ফেলিলাম। শেষে স্থির করিলাম—

"অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেস্মিন্ পূর্ব্বসুরীভিঃ।
মনৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।

অর্থাৎ পূর্ব্ব কবিগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করিব। আমি ছোটগল্প লিখিতে আরম্ভ করিলাম। একটা উৎকৃষ্ট ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ একখানি অতি পুরাতন মাসিক পত্রে পাইয়াছিলাম। সেই গল্পটীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া—খাঁটি বাঙ্গালা পোষাক পরাইয়া একটী 'মৌলিক' ছোটগল্প লিখিতে আরম্ভ করিলাম। দিস্তা দুই তিন কাগজ নষ্ট করিবার পর গল্পটী দাঁড়াইল—আমার মতে বেশ ভালই দাঁড়াইল। গল্পটী পড়িয়া আমার ধারণা জন্মিল যে, আমিও চেষ্টা করিলে একজন হইতে পারি। বিশেষতঃ বিলাতী কি ফরাসীগল্প অনুবাদ করিয়া আমার পূর্ব্বতন লেখকগণ যখন নিজস্ব বলিয়া চালাইয়াছেন তখন তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করায় কোন দোষ দেখিলাম না।

তাহার পর ভাবনা, এই লেখাটা কোন্ মাসিক পত্রে পাঠাই। সাহিত্য-সমাজপতি মহাশয়ের পত্রে পাঠাইতে সাহস হইল না; কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে একখানি নগণ্য কাগজেই বা লেখাটা পাঠাই কেমন করিয়া। সাত পাঁচ ভাবিয়া একজন বড় সম্পাদকের নিকট ডাকযোগে গল্পটী পাঠাইয়া দিলাম। সেই সঙ্গে তিন আনার ডাকটিকেটও প্রেরণ করিলাম; সম্পাদকমহাশয়কে লিখিলাম যদি গল্পটী তাঁহার মনোমত না হয়, তাহা হইলে যেন রেজেষ্টরী ডাকে ফেরত পাঠান। গল্পের নীচে আমার নামটী বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলাম—এম, এ লিখিতেও ভুলি নাই। পত্রেও আমার পরিচয় দিলাম; আমি যে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ পাশ করিয়াছি এবং সাহিত্য-চর্চ্চাও করিয়া থাকি এ কথাও সবিনয় নিবেদন করিতে ভুলি নাই।

একমাস গেল, দেড়মাস গেল। সম্পাদকমহাশয় তাঁহার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রে আমার গল্পটীও ছাপিলেন না, পত্রের কোন উত্তরও দিলেন না, বা গল্পটী ফেরতও পাঠাইলেন না। তখন পুনরায় দুইটী পয়সা খরচ করিয়া আর একখানি পত্র লিখিলাম। এবার আর নিরাশ হইলাম না; সপ্তাহ পরে রেজেষ্টরী ডাকে আমার গল্পটী ফিরিয়া আসিল। পত্রের কোন উত্তর না দিয়া সেই গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে লাল কালীতে সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন "গল্পটী আদ্যোপান্ত পড়িলাম, লেখা বড় কাঁচা, উপাখ্যানভাগ অতি সামান্য। লেখায় কোন প্রকার আর্ট নাই। বিশেষ দুঃখের সহিত ফেরত পাঠাইলাম।" সম্পাদকমহাশয়ের 'বিশেষ দুঃখের' কোন কারণ ছিল না। গল্পটী তুলিয়া রাখিলাম।

ইহার কয়েকদিন পরে আমি বিশেষ কোন প্রয়োজন বশতঃ একজন সাহিত্যরথীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি একজন সুলেখক, গল্প লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত, তাঁহার গল্প মোহর মোহর দরে বিকায় বলিয়া শুনিয়াছি। তিনি কথায় কথায় বলিলেন "তুমি বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা কর না কেন?" আমি বলিলাম "চর্চ্চা করি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার লেখা কেহ লইতে চাহেন না।" তিনি বলিলেন "সে কি কথা। আচ্ছা, তোমার লেখা একটা একদিন নিয়ে এস, আমি একবার দেখ্‌বো।"

আমি তৎপরদিনেই আমার সেই প্রত্যাখ্যাত গল্পটী আর একজনের

দ্বারা নকল করিইয়া লইয়া গেলাম ; সম্পাদকমহাশয়ের মন্তব্যযুক্ত আসলটাও সঙ্গে লইলাম। সাহিত্য-রথীমহাশয় আমার গল্পটি পড়িয়া বলিলেন, অতি সুন্দর গল্প হইয়াছে, যেমন ভাষা, তেমনই প্লট! তুমি ত অতি সুন্দর লেখ। ছোট গল্প লেখার যে আর্ট তাহা তুমি বেশ বুঝিয়াছ।

আমি তখন বলিলাম "আপনি যদি কিছু মনে না করেন এবং আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে একটু রহস্য করিতে চাই।" তিনি হাসিয়া বলিলেন তোমার মতলব কি বলত?" আমি তখন সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্যটী তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলাম "এই গল্পের নীচে আপনার নাম লেখা চাই। দেখি সম্পাদক কি করেন। অবশ্য আপনার নাম দিয়া এ গল্প ছাপা হইবে না ; ছাপা হইবার পূর্ব্বেই চাহিয়া আনিব ; এ সুধু একটা পরীক্ষা মাত্র।" তিনি ত প্রথমে হাসিয়াই অস্থির ; শেষে বলিলেন "কাজটা যে বড়ই খারাপ হয়।" আমি বলিলাম "শুধু একটু পরীক্ষা, আর কিছু নয়। দেখি সম্পাদক মহাশয় কি করেন। এ কাজটা আপনাকে করিতেই হইবে।" তিনি কি করেন, অনেক আপত্তির পর স্বীকার করিলেন। তখন আমার সেই গল্পের নীচে তিনি নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং সম্পাদক মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়া আমার হাতেই দিলেন। গল্পটী কেমন হইয়াছে তাহা জানাইবার জন্য সেই পত্রে অনুরোধ থাকিল।

এবার আর পত্রখানি ও গল্পটী ডাকে পাঠাইলাম না, আমি নিজেই বাহক হইয়া সেই সম্পাদকমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি প্রথমে বিশেষ আগ্রহের সহিত পত্রখানি পাঠ করিলেন ; তাহার পর বলিলেন "আপনি যদি দয়া করিয়া একটু অপেক্ষা করেন তাহা হইলে গল্পটা এখনই পড়িয়া ফেলিয়া আপনার হাতেই উত্তর লিখিয়া দিই।" আমি বলিলাম "আপনি যতক্ষণ বলিলেন ততক্ষণই বসিয়া থাকিতে পারি।"

গল্পটী তেমন বড় ছিলনা, সম্পাদকমহাশয় বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াও কুড়ি মিনিটের মধ্যে পরিশেষ করিলেন। তাহার পরই কাগজ কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্র লেখা শেষ হইলে একখানি এন্‌ভেলাপের মধ্যে পত্রখানি বন্ধ করিয়া আমার হাতে দিলেন এবং আমাকে এতক্ষণ বসাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া একটু শিষ্টাচার করিতেও ভুলিলেন না।

বাহিরে আসিয়া একবার মনে হইল পত্র খানির খাম ছিঁড়িয়া পাঠ করি ; কিন্তু শেষে মনে করিলাম, এভাবে পত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে।

আর বিলম্ব না করিয়া সেই সাহিত্যরথীর নিকট উপস্থিত হইয়া পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া 'হো, হো' করিয়া হাসিতে লাগিলেন। শেষে পত্রখানি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন "পড়" আমি পত্রখানি পরিলাম; তাহা এই—

"ভক্তিভাজনেষু—

আপনার অনুগ্রহ পত্র ও গল্পটী পাইলাম। আপনার লিখিত গল্প কেমন হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। গল্পটী অতি সুন্দর হইয়াছে বলিলে সব কথা বলা হয় না—ইহা আপনার লেখনীরই উপযুক্ত হইয়াছে। এমন গল্প অনেক দিন আমার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই—একেবারে Sublime. এ মাসেই গল্পটী বাহির হইবে; আমি কালই ইহা প্রেসে পাঠাইব।

ভরসা করি ভগবানের কৃপায় আপনি কুশলে আছেন।"

আমার পাঠ শেষ হইলে তিনি আবার 'হো, হো' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটু পরে তিনি বলিলেন "তার পর।" আমি বলিলাম "আমি কা'ল প্রাতঃকালেই গল্পটী চাহিয়া আনিব; বলিব একটু সংশোধনের আবশ্যক আছে।" তিনি তখন গম্ভীর ভাবে বলিলেন "রহস্যত মন্দ নহে।" আমি বলিলাম "আমাকে আর লিখিতে বলিবেন কি?" তিনি এ কথার আর উত্তর দিতে পারিলেন না।

গল্পটী তার পর দিনই ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম। তাহার পর অনেক দিন গিয়াছে, আর কখন লিখি নাই। আজ সেই কথাটা বলিলাম। আমি বেশ বুঝিয়াছি, আমাদের এম, এর কোন মূল্য নাই, লেখারও কোন মূল্য নাই। লোকে লেখার নীচের অক্ষর দেখিয়া লেখা পড়ে, সম্পাদক মহাশয়রাও নাম দেখিয়াই মত প্রকাশ করেন। আমাদের লেখক হইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ—এম, এ পাশের কোনই দর নাই। তখন মহাকবি কাউপারের সেই কথাটা মনে হইল—

"Some to the fascination of a name
Surrender judgment hoodwinked."

শ্রীজলধর সেন।
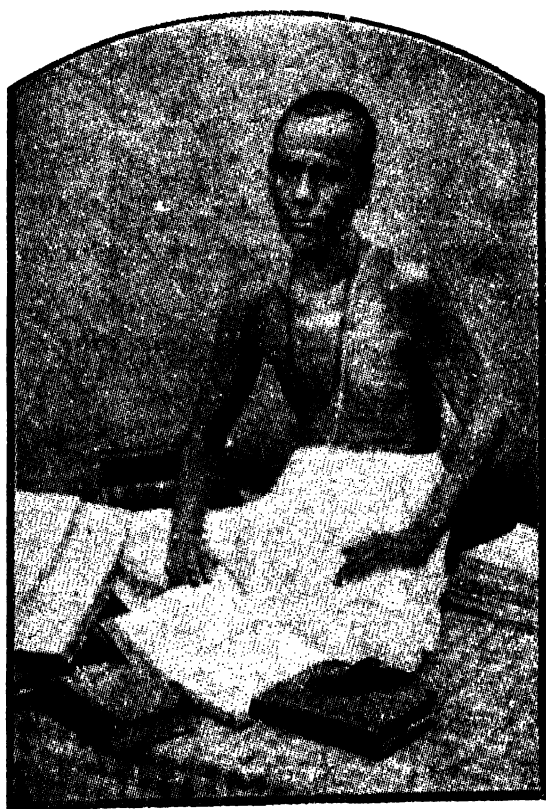
স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

শ্রীনাথ প্রেস, ঢাকা।

চন্দ্রকান্ত-স্মৃতি।

তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা বলিতে চাই না। তিনি কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমার পক্ষে বুঝাও কঠিন। মহামহোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর শ্রীমান বনওয়ারিলাল চৌধুরী এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে তাঁহার সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহাতে তোমরা দেখিতে পাইবে তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় ৩৮ খানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষাকে অলঙ্কৃত এবং তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে, সংস্কৃত ভাষার আদর ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী ও আমেরিকায় দিন দিন বাড়িতেছে। যতই বাড়িবে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রভাব ততই উজ্জ্বল এবং স্বীকৃত হইতে থাকিবে।

আমাদের বাড়ী হ'তে তাঁর বাড়ী প্রায় দেড় মাইল দূরে। চৌপাড়ি তাঁর বাড়ীতেই ছিল। অনেক পড়ুয়া তাঁর বাড়ীতে থাকিয়া পড়িত এবং খেতে পেত। তাঁর বাহির বাড়ীর ঘরে চৌপাড়ি বসিত। আমরা খুব ভোরে উঠিয়া যাইতাম। আমরা যাইয়া দেখিতাম তিনি আরও আগে উঠিয়া স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া পড়ুয়াদিগকে পাঠ দিতে বসিয়াছেন। কেহ পাঠ বলিতেছে, কেহ পাঠ লইতেছে। ঐ ঘরের নিকটে আরো কয়েক খানা ঘর ছিল, উহাতে কতক ছাত্র পড়িতেছে। তাহাদের পড়িবার সে ধ্বনি আজিও কাণে বাজিতেছে। মনে হইতেছে, যেন কোন মুনির আশ্রমে তাঁর শিষ্যগণ কি মধুর মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। ঐ সকল ঘরের কাছে কতকগুলি ফুলের গাছ ছিল। ভোরে ঐ সকল গাছে মৌমাছির গুণ্ গুণ্ শব্দের সঙ্গে এই মন্ত্রের মধুর ধ্বনি মিশিয়া একটা অপূর্ব্ব আবেশের সৃষ্টি করিত। আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম।

দুই এক দিন যাবার পর স্নেহশীল গুরুদেব সকলের আগে আমাদের পড়া লইতেন ও বলিয়া দিতেন—কেননা, আমরা দেড় মাইল দূরে বাড়ী ফিরিব এবং স্কুলের ছাত্র আমরা আবার স্কুলে পড়িতে যাইব। সেকি পণ্ডিতের চৌপাড়ি, সে যে মুনির আশ্রম! সে যে ছাত্রদের পবিত্র তীর্থ স্থান! তিনি চলিয়া গিয়াছেন,তাঁর সে কাঠের খড়ম, তাঁর সে পূজার আসন, তাঁর সে ফুলের সাজি, তাঁর সে নামাবলী, এখনও আছে। তাঁর হাতের লেখা পুঁথি কতই রহিয়াছে। এই সমস্ত নিদর্শন তাঁর সেরপুরের বাড়ীতে কোন ঘরে সাজাইয়া রাখিলে তাহা দেখিবার এক অপূর্ব্ব বস্তু হইত। এই কথায় দক্ষিণেশ্বরের

৺ রামকৃষ্ণের নিদর্শন-গৃহের কথা মনে পড়ে। সকল সভ্য দেশেই মহা পুরুষ-দের স্মৃতি এই রূপে রাখিয়া থাকে। ইহাতে অতীত বাঁচিয়া থাকে, বর্ত্তমান বল পায়, ভবিষ্যৎ বংশের আশা জাগে। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্তের আবির্ভাবে সেরপুর ধন্য, ময়মনসিংহ ধন্য, বঙ্গদেশ ধন্য, ভারত বর্ষ ধন্য।

আগেই তোমাকে বলেছি, তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা বলিব না। বিদ্যায় যে বিনয় থাকে, সেই কথাটাই বলিব। বিদ্যার বুট নয়,—চটি জুতা; জ্ঞানের কোট নয়,—সামান্য থান কাপড়ের "আঙ্গার খা"; তাও বিশেষ ভাবে সংস্কৃত কলেজ ছুঁইবার পর; বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান গরিমার গাউন নয়,—গরিবের মতন সামান্য উত্তরীয় এবং নামাবলী। এই সামান্য আবরণের নিম্নে বিদ্যা বিনয় এবং প্রতিভার কি প্রভাই না ছিল! "বিদ্যা বিনয়ং দদাতি" উপক্রম-ণিকা হইতে এই পাঠ তাঁহার নিকট লইয়াছিলাম। "বিদ্যা বিনয় দেয়" তাঁর দৃষ্টান্ত তাঁতে দেখিয়াছি। ফল ধরিলে গাছ নত হয় এই ত নিয়ম। কেবল আনারসের ফলও নত হয় না, গাছও নত হয় না। হইলে হয়ত লোকে উহাকে আনারস না বলিয়া "ষোলআনা রস" বলিত। মহামহো-পাধ্যায় ষোল আনা বিনয়ী ছিলেন। তাঁর বিনয়ের একটী দৃষ্টান্ত বলিতেছি।

১২৯৮ সনে ময়মনসিংহ নগরে স্বামী সত্যানন্দ এবং স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ বক্তৃতা করিতে আসেন। অনেকগুলি বক্তৃতা হয়। বক্তৃতায় প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক কথা ছিল। এই সকল উক্তির প্রতিবাদ আবশ্যক হইয়া পড়ে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয় আহুত হন এবং বক্তৃতা করেন। সম্মুখে এক খানা টেবিল, তিনি তাঁহার দুখানি হাতের ভর টেবিলের উপর রাখিয়াছেন। সম্মুখে একটু হেলিয়া টেবিলের দিকে চাহিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন। এইরূপ তাঁহার বলিবার প্রণালী ছিল। শির কম্পন, বাহু প্রসারণ, গ্রীবা ভঙ্গি, নয়ন ভঙ্গি—কিছুই নাই। করতালির জন্য কোন স্পৃহা নাই। বিনয়ের ভাষায় প্রমাণ প্রয়োগে বিরুদ্ধ পক্ষের মত খণ্ডন করিয়া গেলেন। উপসংহারে তিনি বলিলেন, "বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি সংস্কৃত শাস্ত্র অতি বিপুল, আমি তাহার কতটুকুই বা জানি। যে টুকু জানি উহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া সন্দেহ নিরশন করিতে যত্ন করিয়াছি; কত দূর সফল হইয়াছি তাহা আপনারা এবং যাঁহাদের মত খণ্ডন জন্য বলিলাম, তাঁহারাই বলিতে পারেন।"

রাজা রাজেন্দ্রলাল "হিন্দু পেট্রিয়টে" যথার্থ ই লিখিয়াছিলেন, "সহরের

পণ্ডিতের স্থায় তাঁর চাকচিক্য ছিল না, কিন্তু তিনি প্রকৃতির শিশু, মিতভাষী এবং পাণ্ডিত্যের মণি।” মহামহোপাধ্যায় বক্তৃতায় কাহারও প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কুৎসা করিতেন না। তিনি শিষ্টাচার ও সাধু উক্তির প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন।

ক্রোধের দৃষ্টান্ত দিতে লোকে “অগ্নি শর্ম্মা” কথাটা বলিয়া থাকে। আমি এই পরম পূজনীয় শর্ম্মায় কখনও ক্রোধের অগ্নি দেখি নাই। “ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ—” ইহা তিনি কেবল পড়াইতেন না—আপন জীবনেও দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেণীর সকলে বিনয় এবং শিষ্টাচার গুণে তাঁহাতে মুগ্ধ ছিল।

মহামহোপাধ্যায় অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় থাকাকালে তাঁহার একজন স্নেহের পাত্র ব্রাহ্মমতে অসবর্ণ বিবাহ করেন। ঐ বিবাহে বরপক্ষ তাঁহাকে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁর সমাজের দিকে চাহিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হন নাই। কিন্তু বিবাহের পর দিন প্রাতে দেখা গেল, এই স্নেহশীল বৃদ্ধ শাঁখা সিন্দুর ধান-দুর্ব্বা ইত্যাদি লইয়া সেই স্নেহের পাত্রটীর গৃহে উপস্থিত। তিনি কেবল আশীর্ব্বাদ জানাইয়া এবং আশীর্ব্বাদের উপহার রাখিয়া চলিয়া গেলেন না; নব বধূকে শাঁখা পরাইয়া এবং আপন হাতে উভয়কে ধান-দুর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন কলিকাতার রেজিষ্ট্রার বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষের একখানি বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি ঐ বাড়ীতেই কলিকাতায় জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বাড়ীর কোন আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু চন্দ্রকান্তের চরণ স্পর্শে ঐ গৃহ ইংরেজীতে বিদ্বান, সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং কলিকাতার ধনী সমাজের এক পবিত্র তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতার এই বাড়ীতে থাকা কালে তাঁহার সঙ্গে হিন্দুসমাজের সংস্কার এবং সংস্কারের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলনকারী লোক এবং আন্দোলনকারী সংবাদপত্র সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, “হিন্দুসমাজ বিপুল এবং বহু শতাব্দীর গঠিত। এই সমাজের সংস্কার করিবার সময় এবং সংস্কার করিবার উপদেশ দিবার সময় এই কথাটী মনে রাখা উচিত, যে সংস্কার সমাজকে সংহারের দিকে লইয়া না যায়। অনেক সংস্কার আছে যাহা আশু রুচিকর হইতে পারে, কিন্তু অচির ভবিষ্যতে উহা সমাজের তেমন কল্যাণকর হয় না। উন্নতিশীল এবং রক্ষণশীল দলের মতের সামঞ্জস্য

করিয়া ধীরে ধীরে কাজ করাই ভাল। সমাজে রক্ষণশীল দল থাকায় উন্নতিশীল দল অকালে একটা কিছু ঘটাইয়া প্রকৃত সংস্কারের অনিষ্ট করিতে পারে না। ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা এবং সমাজের সমালোচনায় সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণের কখনও শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয়।"

মহামহোপাধ্যায় মহাশয় সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে যে কথাটী বলিয়াছেন, পণ্ডিতবর ম্যাক্সমূলার তাঁহার একখানি গ্রন্থে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের যে একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি একাধারে কবি এবং দার্শনিক ছিলেন। এইরূপ সম্মিলন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় নূতন সমাজের যুগে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা অতিশয় দীন হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহার স্থান শীঘ্র পূর্ণ হইবে কি না জানি না। যাঁহার কাছে সংস্কৃতের প্রথম পাঠ লইয়াছিলাম, সেই গুরুদেবের শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে শত সহস্র প্রণিপাত পূর্ব্বক আজ বিদায়।

সুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

বঙ্গীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে, ৬৮৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে) সোমেশ্বর পাঠক নামে জনৈক কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণ তীর্থ পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া স্বীয় জনগণ সহ নানাস্থান ভ্রমণ করতঃ অবশেষে কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া গারো পর্ব্বতের পাদ-প্রবাহিতা এক কল্লোলিনী তীরে সঙ্গীয় বিগ্রহ লক্ষ্মী নারায়ণজীর আবাসস্থান নির্দ্ধারণ করেন।

সোমেশ্বর পাঠক বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। সোমেশ্বর যখন গারো পর্ব্বতের পাদদেশে আশ্রম-স্থান নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তখন বর্ত্তমান সুসঙ্গের নিবিড় অরণ্য ভূম—নেতাই নদী হইতে মহিষখলা নদী পর্য্যন্ত—বাইশা গারো নামক এক প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তির অধিকারভুক্ত ছিল এবং এই অরণ্যের চারিদিক নানাজাতীয় অসভ্য বন্য অধিবাসীতে পূর্ণ ছিল।

একদা একদল ধীবর সেই পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীতে মৎস্য ধরিতে যাইয়া দেবোপম সোমেশ্বরকে স্রোতস্বতী নীরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পায়।

মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবরগণ সোমেশ্বর পাঠকের অলৌকিক রূপ লাবণ্য ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া ভক্তি বশে তাহার বশীভূত হইয়া অধীনতা স্বীকার করে। সোমেশ্বরের আশ্রম-স্থানকে দেও শীল (দেবতা শীলা) নামে অভিহিত করে।

ধীবরগণ বাইশা গারোর অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইত। এই অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার আশায় তাহারা সোমেশ্বর ঠাকুরকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে আনিয়া বাসস্থান দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করে। ধীবরগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সোমেশ্বর দেওশীলের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, অপেক্ষাকৃত নিম্ন সমতল ভূমিতে আসিয়া দ্বিতীয় বাসস্থান মনোনীত করিলেন। এই বাসস্থানের চারিদিক অশোক বৃক্ষে পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাঁহার সেই দ্বিতীয় বাসস্থান "অশোক-কানন" নামে অভিহিত হইল।

সোমেশ্বর যখন অশোক কাননে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় আরও কতিপয় ভ্রমণকারী আসিয়া অশোক কাননে উপনীত হইলেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহার আগমনে অশোক কাননের পবিত্রতা শতগুণে বৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

সিদ্ধ পুরুষ সোমেশ্বরকে বলিলেন—"তোমাকে রাজলক্ষণ-যুক্ত দেখা যাইতেছে,—সুতরাং তুমি এইস্থানে তোমার নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর।" তৎপর সিদ্ধ পুরুষ একটী অশোক বৃক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দেখ, যতদিন পর্য্যন্ত এই বৃক্ষটী জীবিত থাকিবে—আমি বলিয়া গেলাম—ততদিন তোমার রাজ্যের কোনই অনিষ্ট আশঙ্কা নাই। এই অশোক বৃক্ষের বৃদ্ধির সহিত তোমার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং ইহার পতনের সহিত রাজ্যের পতন হইবে।"

সোমেশ্বর মহাপুরুষের বাক্য ঈশ্বরের আদেশ বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া রাজ্য স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সোমেশ্বর প্রথম উদ্যমেই বাইশা গারোকে পরাভূত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। বাইশা সোমেশ্বরের সহিত রণে পরাজিত ও নিহত হইলে বাইশার অনুগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গারো ভূ'ঞাগণ ক্রমে আসিয়া সোমেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিল।*

---

* বাইশা গারো নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ সোমেশ্বর ঠাকুরের আশ্রয় ভিক্ষা করে। সোমেশ্বর কৃপা পরবশ হইয়া তাহাদিগকে কতিপয় গ্রাম জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। সোমেশ্বর ঠাকুরের ত্রয়োদশ পুরুষ অধস্তন বংশধর রাজা বিশ্বনাথ সিংহ ঐ সকল

এইরূপে সোমেশ্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টায় মনোযোগী হইলেন। মহাপুরুষের সৎ সঙ্গে ও সৎ উপদেশে

ঐ প্রাচীন অশোক বৃক্ষের মূল হইতে উত্থিত নূতন অশোক বৃক্ষ
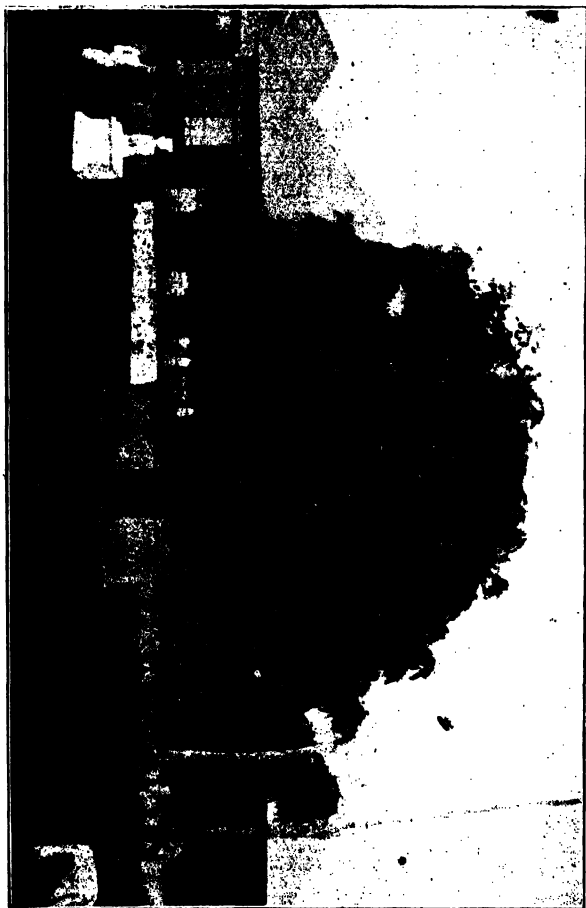
এই রাজ্যের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা চিন্তা করিয়া সোমেশ্বর তাঁহার এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে "সুসঙ্গ" নামে অভিহিত করিলেন।

জায়গীর ভুমি বাইশার তৎকালীন বংশধর রতি গারোকে বেদখল করিয়া "খাস" করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রতির পুত্র কেরা গারো তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য রাজ সরকারে প্রার্থনা করিয়াছিল, প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। বর্ত্তমানে উহাদের বংশে কেহ আছে কিনা কেহ বলিতে পারে না।

ক্রমে কান্যকুব্জ হইতে আরো অনুচর আসিয়া রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে লাগিল। এইরূপে সোমেশ্বর পাঠক কর্ত্তৃক সুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

অভিনব মহাদেশের সূচনা।

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতি তাঁহার জগৎ লইয়া কত খেলাই খেলিতেছেন, কখনও উত্তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গকে অতল সলিলে নিমজ্জিত করিতেছেন, আবার কখনও অতলস্পর্শ সমুদ্রের মধ্যে শৈল-কানন সমাবেশ করাইতেছেন! জগতে প্রকৃতির এই সৃষ্টি ও অভিনয়লীলা অহরহই চলিতেছে। আমাদের প্রাকৃত চক্ষুর সমক্ষেই যে কেবল এই স্থিতি সংহার কার্য্য চলিতেছে তাহা নহে। আমাদের চক্ষুর অন্তরালেও এই ব্যাপার সর্ব্বদা সংঘটিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণাই তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। একদিকে প্রকৃতি রমণীয় উদ্যান রচনা করিতেছেন, অন্যদিকে আবার সেই প্রকৃতিই তাহার ধ্বংসের বীজ তাহারই মধ্যে নিহিত করিয়া তাহাকে মরুভূমিতে পরিণত করিতেছেন।

এই সুকুমার মানবদেহ প্রকৃতিরই রচনা। আবার ইহার ধ্বংসকারী উপকরণও তাঁহারই কারখানাতেই প্রস্তুত হয়।

প্রকৃতির এই নিত্য লীলার একটী দৃষ্টান্ত আজ পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি।

আমেরিকা মহাদেশ ও ইয়ুরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশদ্বয়ের মধ্যে সুবিস্তৃত আটলাণ্টিক মহাসাগর। এই আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে সুবিস্তৃত একটী স্থান আছে যাহা জলও নহে, স্থলও নহে। এই স্থানের আয়তন বড় কম নহে। আয়তনে ইহা প্রায় ইয়ুরোপের তুল্য। ইহার মধ্য দিয়া জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি গমনাগমন করিতে পারে না; মানব অথবা অন্য কোন জীব জন্তুর ইহার উপরে পাদচারণ করাও অসম্ভব।

এই স্থান আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যদেশে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে আফ্রিকা ও পশ্চিমে উত্তর-আমেরিকা।

যখন কলম্বস উত্তর-আমেরিকা আবিষ্কার করিতে যাত্রা করেন সেই সময়ও তিনি এই স্থান দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার জাহাজ এই স্থানে আটকাইয়া যাইবার মত হইয়াছিল। তাঁহার নাবিকগণ ভাবী বিপদাশঙ্কায় অভিভূত হইয়া মনে করিয়াছিল যে তাহারা সমুদ্রের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে, এই ভাসমান পদার্থ নিচয়ের অপর দিকে হয়ত মগ্ন শৈলাদি বর্ত্তমান আছে, এখনই জাহাজ তাহাতে লাগিয়া জলমগ্ন হইবে।

কিন্তু কলম্বস বিপদে বিহ্বল হইবার লোক ছিলেন না। তিনি অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে স্বীয় জাহাজকে বিপন্মুক্ত করিয়া নিরাপদ স্থানে চালিত করিলেন; এবং এই স্থান নানাবিধ সামুদ্রিক তৃণ শৈবালাদি সমাকুল দেখিয়া উহাকে Mar de Sargaco এই নাম প্রদান করেন। তদবধি এই স্থান সর্গাসো সাগর (Sargasso Sea) নামেই পরিচিত হইয়াছে।

এই সারগাসো সাগর স্রোতোহীন, এখানে প্রবল বাত্যাদির প্রকোপও কিছুমাত্র নাই। সামুদ্রিক ঝঞ্ঝাবাতের বেগ এস্থানকে সহ্য করিতে হয় না, উত্তালতরঙ্গমালাও এখানে অন্তলীলার অভিনয় করে না। এস্থান নিবাত নিষ্কম্প অবস্থায় চিরকাল রহিয়াছে।

যাঁহারা বড় বড় নদীর ধারে বাস করেন তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে বিভিন্ন মুখীন স্রোতোবেগের সমবায়ে নদীর মধ্যে একরূপ আবর্ত্তের উৎপত্তি হয়; তাহার চারিদিকে স্রোতঃ, মধ্য স্থানে স্থির। পানা, শেওলা প্রভৃতি স্রোতে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি এই মধ্য স্থানে উপস্থিত হয় তবে তাহারা সেই স্থানেই ভাসিতে থাকে।

এই সারগাসো সমুদ্রও অনেকটা সেইরূপ। ইহার পশ্চিম এবং উত্তর দিক দিয়া প্রসিদ্ধ উপসাগরীয় স্রোতঃ প্রবাহিত; ইহার দক্ষিণ দিক দিয়া উত্তর নিরক্ষবৃত্ত স্রোতঃ North Equatorial stream এবং পূর্ব্বে উত্তর আফ্রিক স্রোতঃ বহিতেছে। এই সব স্রোতের সমবায়ে যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে সেই আবর্ত্ত এই সারগাসো সমুদ্রকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার জলের কোনও বাহ্যিক প্রচলন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আভ্যন্তরীণ স্রোতঃ আছে কিনা তাহা কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। তবে যতদূর জানা যায় তাহাতে অন্তঃ স্রোতের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

এই স্থানে সমুদ্রের জল স্থির বলিয়া নানাদিক হইতে স্রোতের সহিত আগত বহুবিধ সামুদ্রিক শৈবালাদি এইখানে জমা হইয়া থাকে। এইরূপ জমা হইয়া থাকিতে থাকিতে এই স্থান ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করে এবং এই সব শৈবালাদিপূর্ণ ভাসমান ক্ষেত্রের বেধও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই স্থান নির্ব্বাত বলিয়া কত জাহাজ এখানে আসিয়া আট্‌কাইয়া গিয়াছে। আর মুক্ত হইতে পারে নাই।

অনেক সময় অনেক জাহাজ পথ-ভ্রষ্ট হইয়া অদৃশ্য হয়, তাহাদের আর কোনই খোঁজ পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে ঐ সব জাহাজ হয়ত এই সারগাসো সমুদ্রেই আট্‌কাইয়া যায়।

এই সমুদ্রে যে শৈবালরাশি বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহারা একই জাতীয়। এই এক জাতীয় শৈবাল এত অধিক পরিমাণে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; আর এই শৈবালের তুল্য শৈবালও অন্য কোথায়ও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই শৈবালাবৃত ভাগে নানারূপ আশ্চর্য্য জীবসমবায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সারগাসো সমুদ্রের প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলেই ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

Challenger expedition নামীয় বৈজ্ঞানিক অভিযানের অধ্যক্ষ Sir Wyville Thomson সাহেব বলেন যে, ঐ স্থানের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ। কলম্বসও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। Thomson সাহেব আরও বলেন যে এই স্থানে যে সব জলজ জীব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে প্রাকৃতিক আত্মরক্ষণীবৃত্তির দৃষ্টান্ত জাজ্জ্বল্যমান। এই সব জীবের আপন আপন দেহের বর্ণ ঐ সমুদয় সামুদ্রিক শৈবালের বর্ণের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যায়। এরূপ না হইলে উড্ডীয়মান পক্ষীকুলের চঞ্চু হইতে আত্মরক্ষা করা ইহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। তবে ইহারা খেচর হইতে এই উপায়ে মুক্তি লাভ করিলেও জলচর বৃহৎ মৎস্যগণের কবল হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

এই স্থানের সমুদ্রের স্থিরভাব, বাত্যাদির অভাব এবং বিস্তীর্ণ সমুদ্র-শৈবালরাশির লঘুত্ব, এই সমুদয় বস্তুকে ভাসিয়া থাকিবার পক্ষে সাহায্য করে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই সমুদ্রের তলদেশে এই সমুদয় বস্তু ও শৈবালের গলিত অংশ ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া ইহাকে শত শত বৎসর পরে

একটি বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডে পরিণত করিবে। তখন ইহা আর একটি নূতন মহাদেশরূপে নানারূপ আশ্চর্য্য উদ্ভিদ ও জীবসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এই অংশের সমুদ্রের গভীরতা কত, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই, তবে ইহার আশে পাশে সমুদ্রের গভীরতা তিন মাইল হইবে, ইহা পণ্ডিতেরা পরিমাপ করিয়া দেখিয়াছেন। উপসাগরীয় স্রোতঃ এবং সামুদ্রিক স্রোতের যে মৃত্তিকারাশি স্থলভাগ হইতে বাহিত হইয়া আইসে তাহারও অনেক অংশ এই স্থানে আসিয়া জমা হয়। সুতরাং ক্রমে ক্রমে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র কালে মহাদেশে পরিণত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

কবির কাহিনী।

আমায় তুমি ছল্‌তে নাকি, মোহনরূপে আছ ফুটে,—
ফুলে পাতায়, হাসি-কান্নায়, এম্‌নি ধারা চারিদিকে!
সবি নাকি স্বপ্ন ক্ষণিক,— ঘুমের ফসল ষোল আনা,—
চক্ষু বুজার সনে আমার বিভব সবি, যাবে চুকে!
তা'তে আমার দুঃখ কিসের, দেখা যদি পাই সে ধনে,
মরীচিকার মোহ-কুঞ্জে স্বপ্ন ভ্রমর-গুঞ্জরণে,—
তপে যারে যায় না পাওয়া, ধরা যদি দেয় সে নিজে—
কুহক মায়া কুহুরবে, চাঁদনি নিশির সুস্বপনে!
থাক্ না নেশা চক্ষে লেগে, আধেক জ্ঞানে আধ স্বপনে,
মুক্তি-আলো, না-ই বা আমার হৃদয়-তটে ফুট্‌ল না!
স্বপন ভরেই ছবিটী তার, ফুটে যদি গানের সুরে
জন্ম আমার সফল হবে,—দুঃখ কোথাও রইবে না!
হৃদয়-বীণা বাজ্‌রে আমার, তোর সে ভোলা মুগ্ধতানে!
দুঃখ আমার! স্বপ্ন হ'য়ে শোনাও তারি নূপুর ধ্বনি!
থাক্‌না ভবে হাসা কাঁদা, চাঁদের আলো শিশির মাখা—
আমার যেন টুটে না গো গানের রচা স্বপ্ন খানি!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ

ডাক্তার বৌটন।

ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন "ইংরেজী ইতিহাসে কথিত আছে, শাসুজার শাসন কালে সুবিখ্যাত ডাক্তার বৌটনের কল্যাণে ইংরেজ কোম্পানী বার্ষিক তিন হাজার টাকা মাত্র পেস্কস্ দিয়া, বিনা মাশুলে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।" (১) ইংরেজী ইতিহাসের এই উক্তির ভিত্তি দুইজন ইংরেজ ঐতিহাসিক। আমরা প্রথমে সেই ঐতিহাসিক দ্বয়ের উক্তির অনুবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া পরে এই প্রসঙ্গীয় অন্যান্য কথার আলোচনার প্রয়াস পাইব।

প্রথম বক্তা—'History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan' প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্ম্মে (Orme)। অর্ম্মে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উল্লিখিত পুস্তকে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন :—

"বৌটন নামক একজন ইংরেজ সার্জ্জেনের অনুগ্রহেই ইংরেজগণ এই দেশে বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৌটন ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সাহন্‌সা সাজাহানের এক কন্যার চিকিৎসার্থ সুরাট হইতে আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং বাদশাহ অন্যান্য অনুগ্রহের সঙ্গে বৌটনকে তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন। বৌটন এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পণ্যাদি ক্রয় করিবার উদ্দেশে বঙ্গদেশে গমন করেন এবং তথায় পণ্যাদি ক্রয় করিয়া উহা সমুদ্রপথে সুরাটে প্রেরণ করিবেন, এইরূপ মনস্থ করেন। সৌভাগ্য বশতঃ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার এক প্রিয়তমা স্ত্রী অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং নবাব বৌটনকে পীড়িতার আরোগ্য করণ মানসে ডাক্তার নিযুক্ত করেন এবং বৌটনও তাঁহাকে নিরাময় করেন। এই ঘটনা না ঘটিলে বাদসাহ দত্ত অনুমতি পত্রে বৌটনের কোনই ফল লাভ হইত না। নবাব বৌটনকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান ও বাদসাহী সনন্দানুযায়ী তাঁহাকে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং বঙ্গদেশে যে ইংরেজ আসিবেন, তাঁহাকেই বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে দিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুত হন। বৌটন সুরাটের শাসনকর্ত্তাকে এইসকল বিবরণ জ্ঞাপন করিলে,

১। "অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস"—১৫ পৃষ্ঠা।

শাসনকর্ত্তার পরামর্শানুসারে ১৬৪০ সনে কোম্পানি ইংলণ্ড হইতে পণ্য-পূর্ণ দুইখানি জাহাজ প্রেরণ করেন। বৌটন এই জাহাজ দ্বয়ের এজেণ্টগণকে নবাবের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। নবাব সম্মানের সহিত ইঁহাদের অভ্যর্থনা করেন এবং বাণিজ্যে যাহাতে তাঁহাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সকল সুবিধার জন্যই, বঙ্গদেশে ইংরেজের বাণিজ্য ক্রমেই প্রসার লাভ করিতে থাকে।" (২)

অন্যতম বক্তা ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট। ষ্টুয়ার্ট তাঁহার 'History of Bengal'এ বলিয়াছেন ঃ—

"১০৪৬ হিজিরায় (১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট সাজাহানের এক কন্যার বস্ত্রাদিতে আগুন লাগায় বাদসাহজাদীর অঙ্গের অনেক স্থান পুড়িয়া যায়। উজীর আসদ খাঁর পরামর্শানুসারে সুরাট হইতে পত্র পাঠ একজন সার্জ্জন পাঠাইতে আদেশ হয়। সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষগণ 'হোপওয়েল' জাহাজের ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল বৌটনকে এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করেন এবং তিনিও যথাসম্ভব সত্বর সম্রাটের ছাউনিতে উপস্থিত হইয়া বালিকাকে আরোগ্য করেন। সম্রাট্ প্রীত হইয়া বৌটনকে পুরস্কার প্রার্থনার আদেশ করিলে, তিনি ইংরাজোচিত ত্যাগ স্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া যাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসিগণ বিনাশুল্কে ও অবাধে রাজ্য-মধ্যে বাণিজ্য করিতে পারেন, তাহাই প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় এবং যাহাতে তিনি স্বয়ং নির্ব্বিবাদে বঙ্গদেশে পৌঁছিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গদেশে পৌঁছিয়া তিনি পিপলি গমন করেন এবং ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তথায় একখানি জাহাজ পৌঁছিলে, সম্রাটের ফার্ম্মান অনুসারে তিনি বিনাশুল্কে ক্রয় বিক্রয় করিতে থাকেন।

পর বৎসরে রাজকুমার সাসুজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তারূপে রাজমহলে পৌঁছিলে বৌটন তথায় গমন করেন। তাঁহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। অন্তঃপুরস্থ একজন স্ত্রীলোক সেই সময়ে পীড়িতা ছিলেন; বৌটনের হস্তে তাঁহার চিকিৎসাভার ন্যস্ত হইল। বৌটন সহজেই এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে আরোগ্য করেন এবং তথায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন

(২) Sir Henry Yule র মতে ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্টই সর্ব্ব প্রথমে বৌটনের কৃতিত্বের কথা প্রচার করেন। ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অর্ম্মে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। অর্ম্মের ইতিহাস ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল।

করেন। এইরূপে তিনি নিজ প্রতিপত্তিতে সম্রাটের আদেশ বহাল রাখিতে সক্ষম হন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত জাহাজখানি বিলাত হইতে পণ্যাদিসহ বঙ্গদেশে উপস্থিত হয় বৌটনের প্রভাবে এই জাহাজের এজেণ্ট ব্রিজ্‌মান্‌ সাহেবকেও সাসুজা সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং ইংরেজগণকে বালেশ্বর এবং হুগলিতে কুঠী খুলিবার অনুমতি প্রদান করেন। ইহার কিছুকাল পরেই মিঃ বৌটন প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সুখ্যাতির বলেই ইংরেজগণ নির্ব্বিবাদে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

অর্ম্মে ও ষ্টুয়ার্টের বর্ণনায় কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকিলেও মূলতঃ উভয়েরই আখ্যান এক। এবং এই দুই আখ্যানের উপর নির্ভর করিয়াই অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন সহকারে এই বর্ণনাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা কি, তৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহই তত্ত্বানুসন্ধানে সক্ষম হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি ঐতিহাসিক ফষ্টর বিস্তর অনুসন্ধানে বিলাতের "ভারত আফিসের" (India office) পাণ্ডুলিপির মধ্যে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা প্রথমতঃ এই পত্র হইতে আমাদের যে অংশ প্রয়োজন, সেই অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া পরে ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

"১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে গ্যাব্রিয়েল বৌটন নামক সার্জ্জন 'হোপওয়েল' নামক জাহাজে সুরাটে পৌঁছেন। বৌটন যখন সুরাটে ছিলেন, তখন সম্রাটের বক্সী আসাৎখাঁ সুরাটের কোম্পানীর কুঠীর অধ্যক্ষকে একজন সার্জ্জন পাঠাইতে আদেশ প্রেরণ করেন। সম্রাটের কন্যার কাপড়ে আগুন লাগায় তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দগ্ধ হইয়াছিল; তাহাকে নিরাময় করিবার জন্য বৌটনকে দরবারে প্রেরণ করা হয়। সেখানে বৌটনকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয় এবং দৈনিক ৭৲ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া হয়। বৌটনকে দরবারের স্থায়ী চিকিৎসক রূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তিনি উহাতে সম্মত না হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। রাজকুমার সুজা তখন রাজমহালে অবস্থিতি করিতেছিলেন; বৌটন তথায় গমন করিলেন। তিনি যে সময় সম্রাটের দরবারে থাকিয়া সম্রাট-কন্যার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় একজন সভাসদ তাঁহাকে সেইস্থানে দেখিয়াছিলেন; এই

সভাসদ বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বৌটনকে রাজমহালে দেখিতে পান। সেই সময়ে সুজার এক প্রিয়তমা বাঁদী (৩) অসুস্থা থাকায় বৌটনের উপর তাহার চিকিৎসার ভার ন্যস্ত হয় এবং দৈনিক দশটাকা করিয়া তাঁহার বেতন ধার্য্য করা হয়। বৌটন অত্যল্প সময় মধ্যেই বাঁদীকে সুস্থ করেন। এই ঘটনায় সুজা প্রীত হইয়া বৌটন বাণিজ্য করিবার অভিলাষী কিনা জিজ্ঞাসা করেন এবং যৌটনের সম্মতি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি এবং দুইটী নিশান (৪) প্রদান করেন। বৌটন পিপলি পৌঁছেন এবং সুরাট অভিমুখে যাত্রী জাহাজে তত্রস্থ প্রেসিডেণ্টের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রেসিডেণ্ট দুইবার পণ্য-পূর্ণ জাহাজ প্রেরণ করেন এবং বৌটনও বিনাশুল্কে ও বিনা বাধায় ক্রয় বিক্রয় করিতে থাকেন। পরে ব্রিজ্‌মান্ নামক অন্য একজন সাহেব কোম্পানীর এজেণ্ট রূপে তথায় উপনীত হইলে বৌটনের প্রার্থনায় সুজা তাঁহাকে বালেশ্বর ও হুগলিতে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। যতদিন "যুক্ত কোম্পানি" ছিল, ততদিন এইসকল স্থানে কুঠী ছিল। পরে ঐ কোম্পানি উঠিয়া গেলে, বঙ্গদেশীয় কুঠীর অধ্যক্ষ পল্ ওয়াল গ্রেভ্ বালেশ্বর হইতে মছলিপট্টমে যাইবার সময় সুজার নিশান হারাইয়া ফেলেন। এই সময়ে "মরিস্ টম্‌সন্ কোম্পানি" নামে আর একটী কোম্পানি ছিল কিন্তু তাহাদের নিশান বা পরোয়ানা ছিল না। মিঃ বৌটনও এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সেইজন্য উল্লিখিত কোম্পানি বৌটনের ভৃত্য প্রাইস্ সাহেবকে ধরিয়া পুনরায় নিশানাদি প্রাপ্ত হন। * * * *"

ঐতিহাসিক ফষ্টরের যে পত্র আমরা উদ্ধৃত করিলাম, সে পত্রখানি সম্ভবতঃ জন্ বিয়ার্ডের লিখিত। বিয়ার্ড ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় কুঠী-গুলির এজেণ্ট ছিলেন। তাঁহার মতে বৌটন 'হোপওয়েল' জাহাজের ডাক্তার ছিলেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। এস্থানেও দেখা যাইতেছে যে সম্রাটের কন্যার পীড়ার জন্যই বৌটন দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়া আফিসে' (India office) এ সম্বন্ধে আর একখানা দলিল পাওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ৩রা জানুয়ারী, ১৬৪৫। ঐ সময়ে

(৩) "Concubine" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(৪) "Two neshanus."

সুরাটে অত্যধিক ঔষধ খরচ হওয়ায় তত্রস্থ কৌন্সিলের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়। তদুত্তরে কৌন্সিল বলেন যে, "আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু ও সম্রাটের প্রধান ওমরা আশালৎ খাঁ অনেকদিন হইতে তাঁহার নিজ ব্যাধি-চিকিৎসার্থ একজন চিকিৎসক পাঠাইতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। আমরা "হোপওয়েল" জাহাজের ডাক্তার বৌটনকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করি। আশালৎ খাঁ ইহাতে এত দূর প্রীত হইয়াছেন, যে মিঃ টার্ণারের আগ্রাপরিত্যাগ কালে তিনি নিজেই তাঁহাকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সম্রাট্ প্রীত হইয়া এক ফার্ম্মান প্রদান করিয়াছেন।"

উপর্য্যুক্ত বিবরণে দেখা যাইতেছে যে রাজকন্যা জাহানারার চিকিৎসার্থ বৌটন আগ্রায় প্রেরিত হন নাই।

এতদ্ব্যতীত আর একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে আর একটী বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। (৫) ইহাতে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, "গ্যাব্রিয়েল বৌটনের জন্যই ইংরেজগণ বঙ্গদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাবের পত্নীর ব্যাধি আরোগ্য করিতে সমর্থ হইলে, নবাব তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন, এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করেন। তখন তিনি নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজেরা যথেচ্ছা কুঠী স্থাপন করিতে পারিবেন, এরূপ রাজ-আদেশ প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া ইংরেজদিগকে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের ও কুঠী স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন।

উল্লিখিত দুইটী বিবরণেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইংরেজমাত্রকেই বাণিজ্যের সুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমটীতে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং, এই দুই বিবরণ আলোচনা করিয়াও কোন নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

বৌটন সম্বন্ধে আরও একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে লায়নেস্ (Lyoness) নামে একখানি জাহাজ প্রেরিত হয়। এই জাহাজ বালেশ্বরে পৌঁছিলে জাহাজের অধ্যক্ষ যে সকল ব্যক্তিকে হুগলিতে প্রেরণ করেন, তাহাদের সঙ্গে যে লিপি প্রেরিত হইয়া-

(৫) India Office Records.

ছিল। তাহাতে দৃষ্ট হয় যে অধ্যক্ষ গ্যাব্রিয়েল বৌটনের সাহায্যে একখানি ফার্ম্মান প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। (১) এবং তাহার পর ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাব্রিয়েল বৌটনের চেষ্টায়ই মাত্র তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ইংরেজ বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই চিঠি দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে সময়ে ইংরেজ বৌটনের সাহায্যে সনন্দ পাইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, সে সময়ে ইংরেজ কোন সনন্দ পান নাই।

বৌটনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরও সন্দেহের কারণ এই যে, রাজকুমারী জাহানারা ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে অগ্নিদগ্ধা হন, এদিকে বৌটন ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় প্রেরিত হন। সুতরাং তিনি যে রাজকুমারীর চিকিৎসার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয় না। অধিকন্তু, একখানি দেশীয় ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে, রাজকুমারীর চিকিৎসার্থ লাহোর হইতে একজন প্রথিতনামা চিকিৎসক প্রেরিত হইয়াছিলেন।

বৌটনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কয়েকটী মতামত উদ্ধৃত করিলাম। আমাদের বোধহয় এ সম্বন্ধে আরও বৃত্তান্ত না জানিতে পারিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইবে না। শুধু ইণ্ডিয়া আফিসের দলিলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

---

(১) "You know how necessary it will be for the better carrying on the trade of these parts to have the Prince's firman, and that Mr. Gabriel Boughton, Chirurgeon to the prince, promises concerning the same." (Wilson : Early Annuals P 20)

বধ্য ভূমির ভীষণ দৃশ্য

সৌরভ

১ম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩১৯ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

তত্ত্বাবশিষ্ট প্রণেতা

স্বর্গীয় কালীকান্ত বদ্যালঙ্কার।

বঙ্গভূমি বহুপ্রাচীন কাল হইতে সারস্বতগণের পবিত্র লীলা নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং সুধীগণের আবাস স্থান বলিয়া সর্ব্বত্র সংপূজিত। এই বঙ্গভূমিতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বাচস্পতি মিশ্রের মত খণ্ডন করতঃ স্বমত স্থাপন পূর্ব্বক অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেই তত্ত্ব গ্রন্থের মতেই অধুনা বঙ্গদেশ পরিচালিত হইতেছে। বঙ্গদেশবাসী আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বীর জন্ম হইতে মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়া পর্য্যন্ত, উক্ত মহাত্মার মতানুসারেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। উক্ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের মত অনেক স্থানে খণ্ডন করিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তত্ত্ববিশিষ্ট নামক যুক্তিপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। সেই অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন মহাত্মার নাম কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার অধীন মাঘান গ্রামে বিখ্যাত পূর্ণানন্দ বংশে উক্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র পঞ্চানন, মাতার নাম কাত্যায়ণী দেবী। ইনি শকাব্দা ১৭৩৩ অব্দে (বঙ্গাব্দা ১২১৮) জন্মগ্রহণ করেন।

কালীকান্তের পিতা কার্ত্তিকেয় পঞ্চানন এবং পিতামহ শ্রীনারায়ণ ন্যায়-বাগীশ উভয়েই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় মাঘান গ্রামে

বন্দ্যঘটী বংশে বিবাহ করিয়া এই গ্রামেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহিত তদীয় কনিষ্ঠ সহোদরও মাঘান গ্রামে গমন করেন। ন্যায়-বাগীশ মহাশয় অত্যন্ত কালীভক্ত ছিলেন। কথিত আছে শেষ জীবনে প্রতি মাসেই অতি আড়ম্বর সহকারে ইনি এক একটী কালী পূজা করিতেন। মাঘান গ্রামেই কার্ত্তিকেয় পঞ্চানন মহাশয়ের জন্ম হয়। "তিথি তত্ত্বাবশিষ্টের" শেষাংশে কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তদীয় পিতার এবং স্বকীয় পূর্ব্ব বাসস্থানের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—"কাষ্টদ্বীপ পুরাস্থায়ী শ্রীপূর্ণানন্দ বংশজঃ রূপঃকার্ত্তিক ইত্যাখ্য শাস্ত্রে পঞ্চানন স্মৃতঃ।"

কালীকান্ত কাটীহালী গ্রামকেই কাষ্টদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রামেই পরমহংস পূর্ণানন্দ গিরি জন্মগ্রহণ করেন; বর্ত্তমান সময়ও পূর্ণানন্দ বংশীয় অনেকেই এখানে বাস করিতেছেন।

বাল্যকালে কালীকান্তের পিতার নাম "কৃষ্ণচন্দ্র" রাখা হয়, কিন্তু তিনি দেখিতে রূপবান পুরুষ ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে "কার্ত্তিক" বলিয়া ডাকিত। তিনি তদনুযায়ী "কার্ত্তিকেয়চন্দ্র" নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় পঞ্চানন মহাশয় দুইবার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে কৃষ্ণানন্দ সিদ্ধান্ত ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ও কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। কার্ত্তিকেয় পঞ্চানন মহাশয়ের মৃত্যুর পর কৃষ্ণানন্দ সিদ্ধান্ত মহাশয় অপর দুই ভ্রাতা হইতে পৃথক হইয়া বাস করেন। ইহাঁদের সাংসারিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। কালীকান্তের জন্মগ্রহণের পর পঞ্চম বর্ষে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। বিদ্যারম্ভের পর তিনি পিতার নিকট বর্ণমালা শিক্ষা করেন এবং পরে সূত্র আবৃত্তি ও সন্ধিবৃত্তি অধ্যয়ন করেন; ক্রমে স্বীয় পিতার নিকট ও মানশ্রী নিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত কমলাকান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণের পাঠ শেষ করতঃ নবদ্বীপে গমন করিয়া ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যালঙ্কার উপাধি লাভ করেন।

কালীকান্ত অত্যন্ত মেধাবী ও চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন, তিনি এত দ্রুত লিখিতে পারিতেন যে বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে এরূপ দ্রুত লেখক বিরল। ইহাঁর নিজ হস্ত লিখিত বহুবিধ গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে বিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশে ৺ তারাকান্ত ন্যায়রত্ন নামে একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন, কালীকান্ত প্রায়ই শিবপুর

গ্রামে তাহার নিকট গিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করতঃ বিচার করিতেন। এইরূপ নানাস্থানের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার বিচার হইত। ক্রমে তাঁহার যশ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমুহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি উপাধি গ্রহণের পর বাড়ীতে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁহার ছাত্রগণ অনেকেই বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাঠ শেষ করিয়া চতুস্পাঠী স্থাপনের পর বাড়রী গাঙ্গুলী বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কিছুতেই সম্মত হন নাই। সেই সময়ে প্রায় অধিকাংশ অধ্যাপকই অধ্যাপনা আরম্ভ করার পূর্ব্বে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন না। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যখনই কোন পণ্ডিতের উচ্চ প্রশংসা শুনিতে পাইতেন, তখনই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রঘুনন্দনের স্মৃতি সম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ৺ কাশীধাম প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, এবং সেই সকল স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া জয়লাভ করেন।

এইরূপে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের খ্যাতি ক্রমে দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময় তিনি কোচবিহার রাজসভায় যাইয়া প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত এক স্মৃতির বিচারে জয়লাভ করেন। ৺ শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয় তৎকালে কোচবিহার রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।* ইনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের এরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া রাজমন্ত্রী মহাশয় বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। এবং তাঁহাকে তথায় কিছুকাল অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন।

কোচবিহার রাজসভায় থাকিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার প্রতিভা প্রকাশের বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করিয়া যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছিলেন তাহা তিনি রাজমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং কেবল অর্থাভাবেই যে তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতেছে না তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বিদ্যোৎসাহী মন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সী বিদ্যালঙ্কারের গুণে পূর্ব্বেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, এইবার তাঁহার গ্রন্থগুলি

---

* রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত নাওডাঙ্গা নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত রায় প্রমদারঞ্জন বক্সী চৌধুরী মহাশয় ইঁহারই পৌত্র। লেখক।

পণ্ডিত সমাজের আলোচনার জন্য সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং রাজ বৃত্তিভোগী পণ্ডিতগণ দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া বিদ্যালঙ্কার মহশয়কে সহ ঐ সকল গ্রন্থ দেশ বিদেশে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিকট এবং নানাস্থানের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। এই সুযোগে পুনরায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ৺কাশীধাম, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন ও নানাদেশের পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রীয় তর্ক দ্বারা ও নানাগ্রন্থাদি দর্শন করিয়া প্রমাণাদি সংগ্রহ করতঃ "তত্ত্বাবশিষ্টের" লিখিত খণ্ডগুলি সংশোধন করেন।

অতঃপর রাজ মন্ত্রী মহাশয়ের ব্যয়ে তত্ত্বাবশিষ্ট গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়।

তত্ত্বাবশিষ্ট গ্রন্থাবলীর কেবল মাত্র "আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট" মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পর রাজমন্ত্রী মহাশয় পরলোক গমন করিলে মুদ্রন কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। রাজমন্ত্রী মহাশয়েব মৃতুর পরও বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গ্রন্থ প্রণয়নে বিরত ছিলেন না। রাজমন্ত্রীর মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত "যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধ" প্রয়োগের প্রথমে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রাদ্ধদেবং নমস্কৃত্য যজুষাং শ্রাদ্ধ সিদ্ধয়ে।
ছন্দোগ শ্রাদ্ধ কৃত্যাদি বিশেষ শ্রাদ্ধমুচ্যতে ॥
আহ্নিকাচারকোদ্বাহ তিথি শুদ্ধি ক্রিয়াশ্চ
তত্ত্বাবশিষ্টং কৃত্যাপি তত্তদাশা ন শামাতি ॥
রাজ মন্ত্রী বিয়োগেঽপি কাশীংগত্বা পরাঙ্মুখঃ।
সুখ্যাতিং লোকতঃ শ্রুত্বা বক্ষ্যমানং সমাশ্রিতঃ ॥
পৃথ্বীপং রামরত্নাখ্যং শ্রিয়া ভ্রাতৃ দ্বয়া ন্বিতং।
কালীশঙ্কর দত্তস্য রাজ্ঞঃ পুত্রাৎ সুমঞ্জনাৎ ॥
রাম নারায়ণাখ্যানাজ্জাতমিন্দ্র সমপ্রভাং।
যোঽসৌধর্ম্মে নয়ে শৌচে নৃপানামুপমাং গতঃ ॥
তস্যৈব শরণং প্রাপ্য কালীকান্ত ভিধো দ্বিজঃ।
তত্ত্বাবশিষ্টাবশিষ্ট মাস্নুকুল্যাদুপক্রমে ॥"

বাস্তবিক বক্সী মহাশয়ের অর্থব্যয় অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছিল; কালীকান্ত সর্ব্বদাই তাঁহার গুণগান করিতেন। তিনি তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকেই কৃতজ্ঞতা সহকারে রাজ মন্ত্রী মহাশয়ের না উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজমন্ত্রী যে তাঁহাকে নানাস্থানের পণ্ডিত সভায় ও রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাও তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "উদ্বাহতত্ত্বাবশিষ্টের" প্রথমে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত "যজুর্বেদীয় শ্রাদ্ধ প্রয়োগ" গ্রন্থের প্রথম পাতা।

"প্রজাপতিং নতিং কৃত্বা প্রজাকল্যাণ হেতবে
তত্ত্বাবশিষ্ট মুদ্বাহে ব্রুবেহং বিদুষা সহ ॥
বিচার্য্যৈব নবদ্বীপে শ্রীশ চন্দ্র নৃপান্তিকে
কালীকান্ত ভিধো বিপ্রঃ প্রেরিতো রাজ মন্ত্রিনা ॥"

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কোন বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহাতে এরূপ লিপ্ত হইতেন যে তখন তাঁহার বাহ্যিক দৃষ্টি একেবারেই থাকিত না।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের স্বমতে সর্ব্বদাই বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রত্যহ জলে অবগাহন করিয়া "অঘমর্ষণ ঋষি" ইত্যাদি মন্ত্রের অনুযায়ী কার্য্য করিতেন। গো-শৃঙ্গের জলদ্বারা প্রত্যহ স্নান করিতেন, বিবাহাদিতে পশু বন্ধন তাঁহার মতানুমোদিত ছিল; স্বীয় কন্যা জয় সুন্দরীর বিবাহ কালে তিনি গো বন্ধন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন; বিবাহ সভায় উপস্থিত বহু পণ্ডিতের অনুরোধে পরিশেষে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। তিনি উপনয়নার্থী মানবককে প্রাতর্ভোজনের ব্যবস্থা দিতেন। তাঁহার স্মৃতিবিরুদ্ধ এইরূপ অনেক মত ছিল।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কোন স্থানেই বিচারে পরাস্ত হন নাই; এজন্য তাঁহাকে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বলিলেও অত্যুক্তি হয়না, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র বাড়রী গ্রাম নিবাসী ৺ কালী প্রসাদ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নানাস্থানে বিচারে অনন্যসাধারণ শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে "সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব" বলিয়া প্রকাশ করিতেন। বাস্তবিক যে গ্রন্থ তিনি কোন দিন অধ্যয়ন করেন নাই বিচারে পূর্ব্বপক্ষের সেই গ্রন্থের প্রশ্নাংশেরও তিনি অতি সুন্দর সমাধান করিতেন।

তিনি "প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বাবশিষ্টের" প্রথমে লিখিয়াছেন—

"নত্বাশিবং পদদ্বন্দং জ্ঞানদং বিশ্বকারণং।
প্রায়শ্চিত্তেঽবশিষ্টেঞ্চ কালীকান্তোঽব্রবীদ্দ্বিজঃ॥

গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে ঃ—"ইতি শ্রীপূর্ণানন্দ পরমহংস পূর্ব্ববংশজাত কার্ত্তিকেয় পঞ্চাননাত্মজ শ্রীকালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কৃতং প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বাবশিষ্টং সমাপ্তং। শকাব্দ ১৭৮০। সন ১২৬৫ মার্গশীর্ষস্য পঞ্চদশ দিবসে।

গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত "উদ্বাহতত্ত্বাবশিষ্টের" প্রথম পাতা।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় স্বপ্রণীত "উদ্বাহ তত্ত্বাবশিষ্ট" নামক গ্রন্থে "সংস্থিতায়াং" বচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"সংস্থিতায়াং সন্নিবিষ্টায়াং ভার্য্যায়াং পতিত্বে নাশ্রিতয়ামিতি যাবৎ সপিণ্ডি করণান্তিকমিতি সপিণ্ডী করণং সপিণ্ডতা বিশিষ্ট করণং এক শরীরাবয়বান্বয় করণং বিবাহ ইতি যাবৎ তথাচ সপিণ্ডী করণান্তিকং বিবাহান্তিকমিত্যর্থঃ।"

এরূপ নূতন নূতন ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় "ময়মনসিংহের বিবরণ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"বিগত শতাব্দীতে যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কালীবিদ্যালঙ্কারের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাবশিষ্ট" একখানা উচ্চশ্রেণীর তত্ত্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত ভ্রান্তি পূর্ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

এই গ্রন্থ প্রকাশের পর মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের

সহিত মজুমদার মহাশয় সাক্ষাৎ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি কালীবিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে অতি সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত আমাদের দেশে খুবই বিরল ছিল। ইঁহার জন্মভূমি ময়মনসিংহ, ইহা আমাদের পক্ষেত্র মহা গৌরবের বিষয়। ইনি রঘুনন্দনের মত কেবল কাগজ পত্রে খণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, এই মত প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার ভাল সহায়ও জুটিয়াছিল। কোচবিহারের রাজমন্ত্রী তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গ্রন্থের মুদ্রণ ও তাঁহার মতের প্রচার কার্য্যে সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার দু এক খানা গ্রন্থ মুদ্রিতও হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস কালীবিদ্যালঙ্কার আর দশ বৎসর জীবিত থাকিলে সমাজে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হইত।"

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত "প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বাবশিষ্ট" গ্রন্থের শেষ পত্র।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শুধু ময়মনসিংহের, নহে বঙ্গের একটী উজ্জল রত্ন ছিলেন। কাটিহালী পরমহংস পূর্ণানন্দ গিরির জন্ম গ্রহণের পর পূর্ণানন্দ বংশের ইনিই একমাত্র মুখোজ্জল কারী সন্তান। ইনি পূর্ণানন্দ বংশ অধিকতর সমুজ্জল করিয়া গিয়াছেন।

ধন সম্পত্তির প্রতি ইঁহার আদৌ স্পৃহা ছিল না। অনেকে ইচ্ছা করিয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানাস্থানের বহু জমিদার এবং রাজন্যবর্গ ইঁহাকে বহু ব্রহ্মোত্তরাদি দান করিয়াছিলেন।

কালী বিদ্যালঙ্কার মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন; তদীয় কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। "অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাবশিষ্ট" ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শকাব্দা ১৭৮৬ (বঙ্গাব্দা ১২৭১) সনের মাঘ মাসে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়
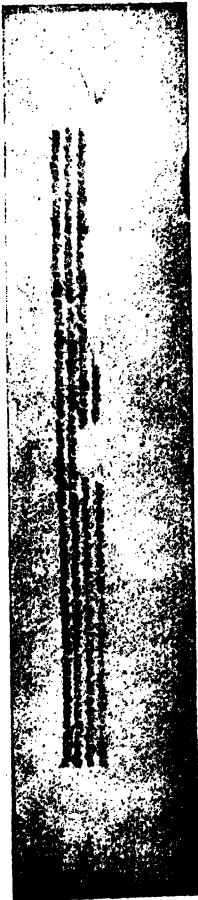
পরলোক গমন করেন। তিনি কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। নিম্নে তাহার বংশাবলী প্রদত্ত হইল। *

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

---

* বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বংশসম্ভূত ময়মনসিংহের অন্তর্গত অওজীয়া স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম! এই প্রবন্ধ রচনায় তিনি আমার সহায়তা না করিলে কিছুতেই আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। তিনি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রণীত ও স্বহস্ত লিখিত তদ্ধাবশিষ্ট গ্রন্থাদি প্রদানেও বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থাদিরই আলোক চিত্র প্রবন্ধের প্রদত্ত হইয়াছে।

নক্ষত্রের গঠনোপাদান।

একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন ;—"আমরা যে ধূলি পদদলিত করিয়া সর্ব্বদা চলাফেরা করিতেছি, তাহা কোন্ কোন্ পদার্থের যোগে উৎপন্ন তাহা স্থির করিতে যথেষ্ট আয়োজনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু কোটি কোটি মাইল দূরের ছোট বড় নক্ষত্রের গঠনোপাদান নির্ণয়ের জন্য একটুও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।"

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। ক্ষুদ্র ধূলিমুষ্টির গঠনোপাদ নির্ণয় করিবার জন্য আধুনিক বীক্ষণাগারে যে, কত কাচের নল, কত ছোট বড় যন্ত্র, কত রাসায়ণিক দ্রব্যের ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। আয়োজনের একটু ত্রুটী এবং সরঞ্জামের একটু অভাব হইলে, আর গঠনোপাদান নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু কোটি কোটি মাইল দূরের যে মহাসূর্য্যগুলিতে আমরা নক্ষত্রের আকারে আকাশে দেখিতে পাই, একটি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের আলোক বিশ্লেষ করিয়া, গঠনোপাদান নির্ণয় করা যায়। কেবল ইহাই নহে, ঐ সকল নক্ষত্রে যে বাষ্প জ্বলিতেছে, সে গুলি স্থির আছে, কি চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, তাহাও ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা নির্ণয় করা যায়।

নক্ষত্রের গঠনোপাদান নির্ণয়ের যে প্রক্রিয়া আজ জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে এত উন্নত করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গিয়ে দেখা যায়, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৫৯ সালে) প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কারকফ্ (Kirchhoff) এবং বুন্‌সেন্ (Bunsen) প্রথমে ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। দাম্ভিক মানুষ যখন মনে মনে ভাবিতে থাকে, এই বুঝি আমরা জ্ঞানের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তখন প্রকৃতি দেবী তাঁহার চিররহস্যময় অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া এমন একটি মূর্ত্তি দেখান যে, তাহা দেখিয়া মানুষ অবাক্ হইয়া যায়। তখন মানুষ বেশ বুঝিতে পারে, তাহার জ্ঞানের পরিধি কত ক্ষুদ্র।

১৮৫৯ সালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহণের গতিবিধির অতি সূক্ষ্ম গণনা করিতে পারিতেন। কয়েকটি ধূমকেতুর ভ্রমন পথও ইঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং কোন্ সময়ে কোন্ ধূমকেতুর উদয় হইবে তাহাও বলিতে পারিতেন। যে নিয়মের অধীন হইয়া কোন গুরু পদার্থ উপর হইতে ভূতলে পড়ে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া গ্রহ নক্ষত্রতারা সকলই যে, পরিভ্রমণ

করিতেছে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ তাহা জানিতেন না। আমাদের ভূমধ্যাকর্ষণই যে একই ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপী মহাকর্ষণের অঙ্গীভূত তাহা এই সময়ে জ্যোতিষিগণ বুঝিয়াছিলেন। যুগ্ম তারকার (Binary stars) গতিবিধিতে এবং সূর্য্যের পরিভ্রমণে মহাকর্ষণের নিয়ম ধরা পড়িয়াছিল। লাপ্লাসের নীহারিকা বাদে এই সময়ে অনেকে আস্থাবান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক অত্যুষ্ণ জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হইতেই যে আমাদের এই সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেন। কিন্তু কোন্ কোন্ উপাদানে আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী চন্দ্র, মঙ্গল বা শুক্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগণ গঠিত, তাহা কোন জ্যোতিষীই বলিতে পারিতেন না। এতদ্ব্যতীত গ্রহ নক্ষত্রগণের প্রাকৃতিক অবস্থা কি প্রকার এবং তাহাতে জীব বাস করিতে পারে কিনা এ সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায় যে সকল জ্যোতিষ্ককে আমরা এখন নীহারিকা (Nebulae) বলি, সেই সময়কার জ্যোতিষিগণ তাহা বার বার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সেগুলিকে অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা ছিল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও ফোটোগ্রাফি জ্যোতিঃশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। আমরা নগ্নচক্ষে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তা ছাড়া যে, কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশে রহিয়াছে, তাহা ঐ দুই যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা জানিয়াছি। আজকাল নক্ষত্রের যে সকল মানচিত্র অতি অল্প মূল্যে আমরা পাইতেছি, ফোটোগ্রাফিই সেগুলিকে নিখুঁত করিয়া আঁকিতেছে। কত নক্ষত্রের গতি যে, ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। পূর্ব্বে মাইরা (Mira) আল্‌গল্ (Algol) প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র নক্ষত্রকে আমরা পরিবর্ত্তনশীল (Variable) বলিয়া জানিতাম, এক ফোটোগ্রাফির প্রসাদে পরিবর্ত্তশীর নক্ষত্রের তালিকা সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রমণ্ডলের যে সকল ফোটোগ্রাফ্ এখন প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে ছোট খাটো পাহাড় ও গুহার পরিচয় পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি খুব সত্য, কিন্তু আলোক বিশ্লেষ করিয়া জ্যোতিষ্কদিগের গঠনোপাদান নির্ণয় করিবার পন্থা আবিষ্কার হওয়ার পর সৃষ্টিতত্ত্বের যে সকল রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বড়ই অদ্ভুত। রশ্মিবিশ্লেষ দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার যে সকল মহারত্ন লাভ করিয়াছে, তাহা সত্যই অতুলনীয়।

যাহা হউক রশ্মিবিশ্লেষ ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে আলোক তত্ত্বের কতক-গুলি গোড়ার কথা মনে রাখা আবশ্যক হইবে।

দুইশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত নিউটন্ দেখাইয়াছিলেন, সূর্য্যের শুভ্রালোক বা অপর কোন উজ্জ্বল পদার্থের সাদা আলোক তে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া চালাইলে তাহা যখন সেই কাচখণ্ডের বাহিরে আসে, তখন, আর শুভ্রালোক থাকে না। রামধনুতে যে সপ্তবর্ণের প্রকাশ দেখা যায়, সেই লোহিত, পীত ও হরিৎ ইত্যাদি নানাবর্ণ সেই এক শুভ্রালোক হইতেই উৎপন্ন হয়। দেয়ালগিরি বা ঝাড়-লণ্ঠনে যে তে-শিরা কাচ ঝুলানো থাকে, তাহা লইয়া কেহ পরীক্ষা করিলেও সাধারণ শুভ্রালোককে ঐ প্রকার বহু বর্ণরশ্মিতে বিশ্লিষ্ট হইতে প্রত্যক্ষ দেখিবেন। এই পরীক্ষা হইতে নিউটন্ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সূর্য্য বা অপর কোন পদার্থের সাদা আলোক প্রকৃতই সাদা নয়, তাহা রক্তপীত ও সবুজনীল প্রভৃতি বহু বর্ণরশ্মির সম্মিলনে উৎপন্ন। এই সিদ্ধান্তটি আজও পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে।

সঙ্কীর্ণ ফাঁকের ভিতর দিয়া আলোক আনিয়া সেই তে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া উহা চালাইতে থাকিলে, যে বর্ণরশ্মি পাওয়া যায়, সেগুলিকে অতি সুস্পষ্ট দেখা যায়। পর্দ্দার উপরে বা দেওয়ালের গায়ে এই প্রকারে যে নানাবর্ণের আলোক রশ্মি আসিয়া পড়ে, তাহাকে বৈজ্ঞাণিকগণ Spectrum বলেন, আমরা তাহাকে বর্ণচ্ছত্র নামে অভিহিত করিব। সঙ্কীর্ণ ফাঁকের ভিতর দিয়া আগত আলোকের বর্ণছত্রে রক্ত, পীত, সবুজ, নীল প্রভৃতি প্রত্যেক রশ্মিরই এক একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। বিদ্যুতের আলোক বা গ্যাসের আলোক ঐ প্রকার বিশ্লেষ করিলে, বর্ণচ্ছত্রে সকল বর্ণই পর পর প্রকাশিত দেখা যায়, বর্ণচ্ছত্রে কোন বিচ্ছেদ অর্থাৎ ফাঁকা স্থান থাকে না। সূর্য্যরশ্মির বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিলেও ঐ প্রকার প্রায় অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম পরীক্ষায় মাঝে মাঝে কতকগুলি বর্ণের অভাব সুস্পষ্ট দেখা গিয়া থাকে। বর্ণচ্ছত্রে এই বর্ণ রশ্মিহীন স্থানগুলিকে কৃষ্ণ রেখার ন্যায় দেখা যায়। গত শতাব্দীর প্রথমে ওলাষ্টন্ (Wollaston) এবং ফ্রানহোফার্ (Franeuhofar) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক সৌরবর্ণচ্ছত্রে ঐ কৃষ্ণরেখার আবিষ্কার কারিয়াছিলেন। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে সেগুলি আজও ফ্রানহোফারের রেখা (Franeuhope's Line) নামে পরিচিত হইতেছে! যহাহউক সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে কতকগুলি বর্ণের অভাব আবিষ্কৃত হইয়াছিল

বটে, কিন্তু কি কারণে সাধারণ অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র হইতে ঐ বর্ণগুলির লোপ পায়, তাহা সেই সময়ে কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যানের জন্য বৈজ্ঞানিকদিগকে অর্দ্ধ শতাব্দীকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

হাইড্রোজেন্ বাষ্প পুড়িয়া যে ক্ষীণালোক উৎপন্নকরে তে-শিরা কাচের সাহয্যে তাহার বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিলে দেখা যায়, সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছত্রে যেমন অবিচ্ছেদে সকল গুলিরঙ্গ পরে পরে প্রকাশ পায়, ইহাতে তাহা থাকে না। স্থানে স্থানে একটা রঙ্গের স্থূল রেখা লইয়াই ইহার বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই হাইড্রোজেন্ বাষ্পে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করিয়া পোড়াইতে থাকিলে, ঐ স্থূল রেখাময় বর্ণচ্ছত্রই ক্রমে পাশাপাশি বাড়িয়া সৌরবর্ণচ্ছত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। সৌরবর্ণচ্ছত্রের মাঝে মাঝে কেন বর্ণহীন কৃষ্ণরেখার উৎপত্তি হয়, এই পরীক্ষা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সোডিয়ম্ নামক ধাতু বা সেই ধাতুঘটিত কোন পদার্থ পোড়াইলে যে আলোক হয়, তাহার বর্ণচ্ছত্রে রক্ত, নীল, সবুজ প্রভৃতি কোন রঙ্গের প্রকাশ থাকে না, কেবল বর্ণচ্ছত্রের পীত রঙ্গের স্থানে দুইটি উজ্জ্বল, পীত রেখা দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই বর্ণচ্ছত্রের সহিত সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র তুলনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সৌরবর্ণচ্ছত্রের যে অংশে দুটি কৃষ্ণ চিহ্ন আছে সোডিয়মের বর্ণচ্ছত্রের ঠিক সেই অংশেই ঐ দুইটি উজ্জ্বল পীত রেখা রহিয়াছে। কাজেই সৌরবর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখার সহিত সোডিয়মের উজ্জ্বল রেখার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার কথা অনেকেরই মনে আসিয়াছিল।

গত ১৮৫৯ সালে কার্‌কফ্ ও বুন্‌সেন্ সাধারণ বিদ্যুতের আলোকের বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য ইহাতে রক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুণিয়া পর্য্যন্ত রামধনুর সকল বর্ণই সুবিন্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। আবিষ্কারকদ্বয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ঐ আলোকের পথে সোডিয়মের অনুজ্জ্বল বাষ্প রাখিয়া বর্ণচ্ছত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না, দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, সোডিয়মের বর্ণচ্ছত্রে যে দুইটী স্থূল পীত রেখা প্রকাশ পায়, বিদ্যুতালোকের মাঝে সোডিয়ম্ বাষ্প রাখায় উহার সেই অবিচ্ছন্ন বর্ণচ্ছত্রে ঐ পীত রেখাদ্বয় প্রকাশ পায় নাই। অর্থাৎ বিদ্যুতালোকের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র কেবল সোডিয়ম্ বাষ্পদ্বারা খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই পরীক্ষার ফলে সৌরবর্ণচ্ছত্রে কেন কতকগুলি বর্ণবর্জ্জিত

স্থান থাকে বৈজ্ঞনিকগণ তাহা বুঝিতে পাড়িয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, কোন বাষ্প পুড়িয়া যে বর্ণরেখা উৎপন্ন করে, সাধারণ অনুজ্জ্বল অবস্থায় তাহাই অপর অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রের সেই সকল বর্ণরেখাগুলিকে হরণ করিতে পারে।

একটা উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা বুঝানো যাউক। ম্যাগ্‌নিসিয়ম্ ধাতুর বাষ্প পোড়াইতে থাকিলে তাহার আলোক হইতে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে রক্ত পীতাদি কোন বর্ণ ই দেখা যায় না। নীল ও সবুজের কয়েকটী উজ্জল রেখা লইয়াই ইহার বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ পায়। সাধারণ বিদ্যুতালোকের বিশ্লেষে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে একটি বর্ণেরও অভাব থাকে না, রক্তপীত, সবুজনীল প্রভৃতি সকল বর্ণ ই ইহাতে পর পর সুসজ্জিত থাকে। এখন বিদ্যুতালোকের পথে যদি ঐ ম্যাগ্‌নিসিয়ম্ বাষ্প রাখা যায়, তবে দর্শক আর বিদ্যুতালোকের বর্ণচ্ছত্রকে অখণ্ড দেখিতে পাইবেন না। ম্যাগ্‌নি-সিয়ম্ নিজে পুড়িবার সময় নীল ও সবুজে যে আলোক রেখা উৎপন্ন করিতে পারিত, বিদ্যুতের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র হইতে সেই কয়োকটি বর্ণ হরণ করিয়া লইবে। কাজেই মাঝে ম্যাগ্‌নিসিয়ম্ বাষ্প রাখায় বিদ্যুতালোকের বর্ণচ্ছত্র সৌর বর্ণচ্ছত্রের ন্যায় কয়েকটি কৃষ্ণরেখযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইবে।

কঠিন ও তরল পদার্থ উজ্জল হইলে যে আলোক প্রদান করে, তাহা হইতে অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়। প্রবল বাষ্প প্রয়োগের পর বাষ্প জ্বালাইতে থাকিলেও অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ বাষ্প প্রজ্জলিত হইয়া কখনই অখণ্ড বর্ণচ্ছত্রের প্রকাশ করে না। বাষ্পমাত্রেরই বর্ণচ্ছত্র স্থূল রেখাময় হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং যখন কোনও কঠিন পদার্থ বা চাপপ্রাপ্ত বায়বীর বস্তু উজ্জ্বল হইয়া কৃষ্ণরেখাযুক্ত খণ্ডিত বর্ণচ্ছত্র দেখাইতে থাকে, তখন পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, ঐ কঠিন বা চাপপ্রাপ্ত বায়বীর পদার্থ নিশ্চয়ই কোন বাষ্পের আবরণে আবৃত আছে এবং এই শীতল বাষ্পাবরণই কতকগুলি বর্ণরশ্মিকে হরণ করিয়া বর্ণচ্ছত্রকে খণ্ডিত করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাইড্রোজেন্, নাইট্রেজেন, অঙ্গার এবং প্রত্যেক ধাতু প্রভৃতি মূল পদার্থের বাষ্প উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে থাকিলে, উহাদের বর্ণচ্ছত্রে কতকগুলি স্থূলবর্ণ রেখা প্রকাশ পায়। কাজেই কেবল বর্ণচ্ছত্র দেখিলেই বলা যাইতে পারে যে, উহা কোন পদার্থের বর্ণ-চ্ছত্র। আবার ইঁহাও বলা হইয়াছে যে, কোন আলোকের পথে যদি শীতল

বাষ্প রাখা যায়, তাহা হইলে উহা আলোক হইতে কতকগুলি বর্ণরশ্মি হরণ করিয়া ফেলে এই হরণ ব্যপারের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে, ঐ বাষ্প নিজে উজ্জ্বল হইলে বর্ণচ্ছত্রে যে সকল বর্ণরেখা দেখাইত, বাছিয়া বাছিয়া উহা সেই সকল রশ্মিকেই হরণ করে। সুতরাং যে দ্রব্য উজ্জ্বল হইলে অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ করে, তাহা বাষ্পাবৃত হইয়া কোন্ কোন্ বর্ণের লোপে খণ্ডিত হইতেছে তাহা ঠিক করিতে পারিলে, কোন্ কোন্ বাষ্প দ্রব্যটিকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা অনায়াসেই নির্ণয় করা যায়।

সূর্য্যালোকের যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে পীতবর্ণের স্থানে কয়েকটি কৃষ্ণরেখা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের জানা আছে যে, সোডিয়ম্ বাতার বাষ্প উজ্জ্বল হইলেই ইহার নিজের বর্ণচ্ছত্রে কয়েকটি পীত রেখামাত্র দেখায়। কাজেই সূর্য্যের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্রে সেই পীত রেখাগুলির অভাব দেখিলে অনায়াসেই বলা চলে যে,— সূর্য্যের দেহ তরলই হউক, বা কঠিনই হউক, ইহার চারিদিকে নিশ্চয়ই সোডিয়মের বাষ্পের আবরণ আছে। এই শীতল সোডিয়মের বাষ্পই সূর্য্যের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র হইতে পীতেব রেখাগুলিকে হরণ করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অখণ্ড বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখাগুলির অবস্থান মিলাইয়া, কোন্ কোন্ বাষ্প উজ্জ্বল পদার্থকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা আজকাল অনায়াসে নির্ণীত হইতেছে। এই প্রকার সৌরমণ্ডলে সোডিয়ম্ ব্যতীত লৌহ, হাইড্রোজেন্ কালসিয়ম্, ম্যাগ্নেসিয়ম্, পটাসিয়ম্ প্রভৃতি আমাদের সুপরিচিত অনেক মূলপদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কেবল সূর্য্য নয়, অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্র যাহাদের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে সহস্র বৎসর অতিবাহন করে, সে গুলিরও গঠনোপাদান তাহাদের বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখার স্থান পরীক্ষা করিয়া জানা যাইতেছে। আমাদের পরিজ্ঞাত অনেক পদার্থের অস্তিত্ব এই সকল দূর জ্যোতিষ্কও ধরা পড়িতেছে। আবার কোন কোন নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্র এমন কতকগুলি রেখা দেখা যাইতেছে যে, সেগুলি কোন্ পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই এই সকল পদার্থ আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীতে নাই।

ক্লোরিন্, ব্রোমিন্, গন্ধক এবং অক্সিজেন্, এই পদার্থগুলি আমাদের পৃথিবীর অনেক জিনিষেই. মিশ্রত আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে এগুলির চিহ্ন দেখা যায় না। এই ব্যাপারটি জ্যোতির্বিদগণের নিকট

একটা প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূর্য্য হইতেই পৃথিবীর জন্ম, কাজেই যে সকল উপাদানে পৃথিবীর দেহ নির্ম্মিত সৌরদেহে সেগুলির অস্তিত্ব থাকারই সম্ভাবনা। সার্ নরমান্ লকিয়ার (Lockyer) প্রমুখ আধুনিক জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন গন্ধক, ক্লোরিন্ এবং ব্রোমিন্ প্রভৃতি সকল মূলপদার্থই সূর্য্যে আছে কিন্তু সূর্য্যের উষ্ণতায় সে গুলি এমন রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা আর নিজেদের বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ করিতে পারে না। মূলপদার্থের রূপান্তর নাই, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে ঐ মূলপদার্থ-গুলির রূপান্তরের প্রমাণ পাইয়া অনেকে ঐগুলির মৌলিকতায় সন্দিহান হইয়া পড়িতেছেন।

যাহা হউক কেবল তে-শিরা কাচের সাহায্যে সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির আলো-কের বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়া জ্যোতিষ্কের গঠনোপাদন সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। রশ্মি বিশ্লেষণের এই সহজ প্রক্রিয়াটি আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রকে যে কত উন্নত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না।

আমরা প্রবন্ধান্তরে রশ্মি বিশ্লেষণলব্ধ অপর আবিষ্কার গুলির পরিচয় দিব।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সন্দেশ।

১

আজিকে এনেছে প্রভাত-পবন
　　　　এনেছে তোমারি বারতা,
ওগো প্রিয়তম জীবন-জীবন
　　　　হৃদয়-বিহারী দেবতা!
দুয়ার মেলিয়া বাহিরিনু যবে
নব জাগরিত—মুখরিত ভবে,
তোমার কৃষ্ণ কেশের শৌরভে
　　　　পরাণ উঠিল চমকি'!
প্রভাত-পবন গোপনে নীরবে
　　　　তোমারে চুমিয়া এল কি

২

তোমারি মোহন হাসির মাধুরী
কুসুম আজিকে পেল রে !
বিহগ তোমার কণ্ঠ্য-চাতুরী
কোথায় শিখিয়া এল রে !
উদার আকাশ, বিশাল ধরণী
কেন ডাকে মোরে "সজনী" "সজনী"
তব ভালবাসা কভুত এমনি
যায় নি জানায়ে সকলে !
না বুঝি কেমনে একটী রজনী
করিল নূতন ভূতলে !

৩

তুমি কিগো সখা, কালিকে নিশীথে
এসেছিলে মোর দুয়ারে,—
ঘুমায়ে আছিনু, নারিনু পূজিতে
হে রাজন্, সুখে তোমারে !
ডেকে ডেকে তুমি না পেয়ে আমায়
দিলে কি বিলায়ে শেষে আপনায়,
স্মরণ-চিহ্ন রেখে যেতে হায়,
জগতের প্রতি অণুতে !
প্রভাতে জাগিয়া লভিতে তোমায়
সকল মরম-রেণুতে !

৪

ইঙ্গিত তব নিতেছি মানিয়া
ত্যজিব না আজি কাহারে'—
লইব পুলকে লইব বরিয়া
সবাকার মাঝে তোমারে !
প্রেম-মালা মোর ভুবনের গলে
দিনু দোলাইয়া আজি কুতুহলে,
নয়নের জল মুছিনু আঁচলে,
ভুলিনু বিরহ-বেদনা !
দাঁড়াইনু আসি তব পদতলে
দূরে ফেলে আর রেখ না।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শ্রুত কথা।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, আজ যাহা বলিতে চাই, উহা ইতিহাসের কথা হইলেও তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কোন ফরাসী বা ইংরাজ পণ্ডিতের গ্রন্থে ইহা লিখিত হয় নাই, অথবা কোন মিনহাজ উদ্দীন বা গোলাম হোসেনও ইহা বর্ণনা করেন নাই। এখনও ইহা জনশ্রুতি মাত্র।

জনশ্রুতিকে আমরা অভ্রান্ত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা সত্য, কিন্তু একবারে উপেক্ষাও করিতে পারি না। এদেশে একটা চিরন্তন কথা আছে—"নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"—অর্থাৎ জনশ্রুতি অমূলক নহে। পুরুষ-পরম্পরায় যে কথা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। বিশেষতঃ যেদেশে ইতিহাস নাই, জনশ্রুতির অস্ফুট আলোকই সে দেশে ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধানের পথ দেখাইয়া দেয়। এই জনশ্রুতিই আমাদিগকে বাঙ্গালার কয়েকটি বিলুপ্ত মহা নগরীর সন্ধান জানাইয়া দিতেছে। আজ সেই কথাই বলিতেছি।

ঢাকা নগরী হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরের জঙ্গল পর্য্যন্ত ভূভাগ অত্যন্ত উচ্চ; বৃদ্ধদিগের মুখে শুনা যায়, এই ভূমিভাগেই প্রাচীন সময়ে লোকের বসতি ছিল। এখন ইহার পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল স্থানে গ্রাম ও ক্ষেত্র দেখা যায়, প্রাচীন কালে এ সকল স্থান জলমগ্ন ছিল। কোনও রাষ্ট্র-বিপ্লবে উক্ত প্রাচীন স্থান জনশূন্য হইয়া গজারিবনে পরিণত, এবং ব্যাঘ্রাদির আবাস স্থান হইয়াছে। যতদূর অনুমান করা যায়, তাহাতে বলা যাইতে পারে সেই মহা বিপ্লব—তিব্বতীয় বা মঙ্গোলীয় জাতির আক্রমণ। এখনও সেই আক্রমণকারীদিগের বংশধর বংশী বা রাজবংশী, মান্দাই প্রভৃতি জাতিরা এই বিস্তৃত অরণ্য প্রদেশের অধিবাসী। যে অনধিকারী কর্ত্তৃক গৌড়ের পাল রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, অনুমান হয় সেই কাম্বোজ বিজেতাই এই আরণ্য প্রদেশের পালরাজধানীও বিধ্বংস করেন।

এই আরণ্য প্রদেশে নিম্নলিখিত কয়েকটি রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) রাজা ভগদত্তের রাজধানী—ইহা মধুপুরের জঙ্গলে অবস্থিত। ভগদত্ত সম্বন্ধে এখনও অনেক গল্প শুনা যায়। ইনি স্বীয় মাতার তীর্থ-জলে

স্নানের নিমিত্ত এক পুষ্করিণীতে দ্বাদশ তীর্থ আনয়ন করেন। এখনও ঐ দীর্ঘিকা বারতীর্থ বলিয়া কথিত হয়। লোকে উহার জল পবিত্র মনে করে।
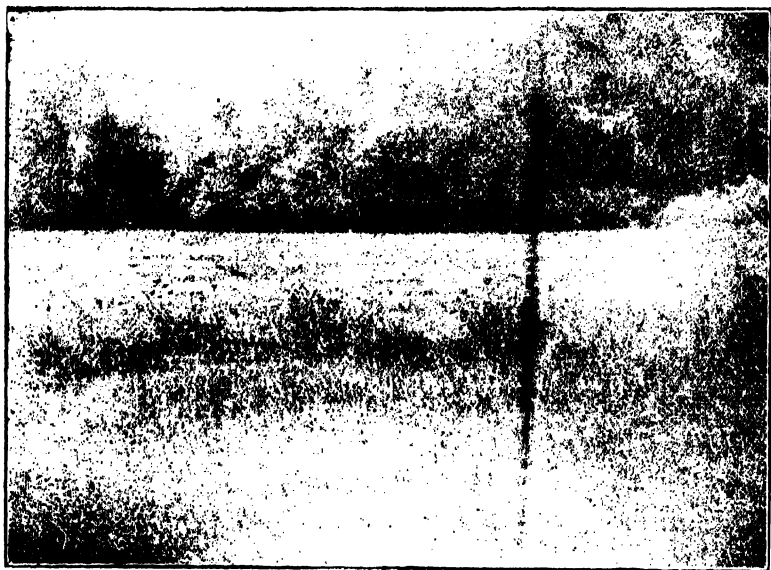
বারতীর্থ—মধুপুর।

ভগদত্ত নাম হইতে দত্তবংশ বলিয়া একটি রাজবংশের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

(২) কালিদাস পালের রাজধানী—ইহা আটীয়ার পাহাড়ে অবস্থিত। একটি স্বচ্ছতোয়া দীর্ঘিকার নিকটে রাজপুরীর চিহ্ন রহিয়াছে।

(৩) ধামরাই গ্রামের নিকটে যশোপালের রাজধানী। এই যশোপালের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু মূর্ত্তিই এক্ষণে ধামরাই গ্রামে যশোমাধব নামে পূজিত হইতেছেন।

(৪) সাভারের নিকটে হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী—হরিশ্চন্দ্রের দুর্গ ও পরিখা এখনও বিদ্যমান আছে।

(৫) ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ের শ্রীপুর ষ্টেশনের প্রায় ৬মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 'কুল সাঙ্গানের ছিট' নামক স্থানে রাজা শিশুপালের রাজধানী।

এই স্থানে এখন বড় বড় দীঘী, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, বড় বড় সেগুণ গাছ, ও নানাবিধ সুগন্ধি ফুলের গাছ আছে।

(৬) রাজেন্দ্র পুর ষ্টেশনের ৩½ মাইল পূর্ব্বদিকে চণ্ডাল রাজার রাজধানী। এই স্থানেও দীঘী, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, দুর্গ ও পরিখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

চণ্ডাল রাজাদিগের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

মঘী নাম্নী একটী স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় গরু চরাইতে যাইয়া বনমধ্যে নিদ্রিতা হইয়া পড়ে। দৈবক্রমে রাজা শিশুপাল ঐ স্থানে উপস্থিত হন। তিনি দেখিলেন, নিদ্রিতা মঘীর উদর হইতে এক অদ্ভুত জ্যোতি বাহির হইয়া বন আলোকিত করিতেছে। শিশুপাল বিস্মিত হইলেন; তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, এই রমণীর গর্ভে কোন অসাধারণ পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। রাজা, মঘীকে জাগরিত করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মঘী আপনার পরিচয় ও দারিদ্র্যের কথা নিবেদন করিল। শিশুপাল, মঘীর ভরণপোষণের উপযোগী কিছু স্থান নিষ্কর করিয়া দিলেন।

মঘীর গর্ভে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামে দুইটি যমজ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। কালে এই প্রতাপ ও প্রসন্ন পালবংশের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিয়া ভাওয়ালে স্বাধীন রাজা হয়।

ইহাদের রাজত্ব কত দিন স্থায়ী হইয়াছিল বলা যায় না। ভাওয়ালে একটি জন প্রবাদ আছে যে—"চাঁড়ালের রাজত্ব আড়াই দিন।" এই প্রবাদ হইতে অনুমান হয়, চণ্ডাল রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। চণ্ডাল ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনাশ কাহিনীও কৌতুকজনক।

প্রতাপ ও প্রসন্নের প্রভুত্ব ভাওয়ালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ ইহাদিগকে নীচ জাতীয় বলিয়া মনে যে তুচ্ছ বোধ করিতেন, তাহা ইহাঁদের বুঝিতে বাকী ছিলনা। একদিন ভ্রাতৃদ্বয় এই পরামর্শ করিল যে, ব্রাহ্মণদিগকে আমাদের পক্কান্ন ভোজন করাইতে পারিলে আর তাহারা নীচ বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা ভাওয়ালের সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন। জাতিরক্ষার জন্য অনেকেই সোণার গাঁ, বিক্রমপুর পরগণা প্রভৃতি স্থানে পলাইয়া গেলেন। যাঁহারা পলাইতে পারিলেন না, তাঁহারা প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া রাজবাটীতে

উপস্থিত হইলেন। আহারের আয়োজন হইল। ব্রাহ্মণগণ ভোজনের আসনে বসিলেন। কাহারও মুখে একটি কথাও বাহির হইতেছেনা। সকলেই বিষণ্ণ বদনে ভাবিতেছেন "হায়, এখনই চণ্ডালান্ন ভোজন করিয়া পতিত হইতে হইবে।"

দেখিতে দেখিতে প্রতাপ ও প্রসন্নের পত্নীদ্বয় ভাতের থালা লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিতে আসিলেন। কে নিষেধ করিবে? সম্মুখে চণ্ডাল রাজদ্বয় দণ্ডায়মান। ভয়ে কেহ কথা কহিতে পারিতেছেনা। রাজপত্নীদ্বয়, ব্রাহ্মণগণের পাতে ভাত দিবেন, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যোড়হাতে বলিতে লাগিলেন—"দোহাই মহারাজের, আমার একটি নালিশ আছে; অগ্রে তাহার বিচার হউক, তাহার পরে রাণীরা পরিবেশন করিবেন।" ব্রাহ্মণের চীৎকারে রাণীরা ভাতের থালা লইয়া সরিয়া গেলেন। প্রতাপ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ব্রাহ্মণ, তোমার অভিযোগ কি; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, কোন অভিযোগেই ভোজন না করিয়া উঠিতে পারিবে না।" ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"মহারাজ, ভোজনে আপত্তি নাই; রাজা দেবতা; রাজ-মহিষী—দেবী। তাঁহার পক্কান্ন ভোজনে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যিনি পাটরাণী নহেন, আমরা তাঁহার হাতে খাইব না। এই যে দুই রাণী ভাতের থালা লইয়া আসিয়াছেন, উহার মধ্যে যিনি পাটরাণী তিনিই আমাদিগকে পরিবেশন করুন।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

কে পাটরাণী, ইহার মীমাংসা লইয়া অন্তঃপুরে মহা গণ্ডগোল হইতে লাগিল। প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয়েই রাজা, উভয়ের স্ত্রী-ই রাণী। কেহই ছোট রাণী হইতে সম্মত নহেন; রাজারাও কেহই আপনার স্ত্রীকে ছোট রাণী করিতে প্রস্তুত নহেন। বিবাদ প্রথমে বাক্যে, শেষে অস্ত্রে আরম্ভ হইল। দুই ভাই অসিহস্তে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। সেই আক্রমণে উভয়েই নিহত হইলেন। চাণ্ডাল রাজত্ব ধ্বংস হইয়া গেল।

এই প্রবাদ হইতে অন্ততঃ এটুকু ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে যে,—চণ্ডালদিগের আক্রমণে শিশুপালের রাজ্য ধ্বংস হয় এবং ব্রাহ্মণদিগের কৌশলে চণ্ডাল রাজাদিগের বিনাশ ঘটে।

এই চণ্ডালেরা কে, তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ এখনও ঘটে নাই। মঘী নাম হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহারা মঘ জাতীয়। চট্টগ্রাম বা ব্রহ্মদেশ হইতে ইহারা ভাওয়ালে আসিয়াছিল।

অল্প দিন হইল 'বেলাব' গ্রামে ভোজ বর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা যে প্রদেশের কথার এই প্রবন্ধে অবতারণা করিয়াছি, 'বেলাব'ও সেই প্রদেশেরই অন্তর্গত। 'ব'-অন্ত বহু গ্রাম * এই প্রদেশে আছে। 'ব' এর অর্থ কি বলা যায় না; কিন্তু উহার যে একটা অর্থ ছিল এবং সেই অর্থ, কালে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে তাহা ঠিক। ভোজ-বর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে অনুমান করা যায়, এই প্রদেশে বর্ম্মা রাজবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এবং এই উন্নত ভূভাগেই বিক্রমপুরের স্কন্ধাবার স্থাপিত ছিল। শেষে রাজা বল্লাল সেনের সময় রামপালের নিম্ন ক্ষেত্রে বিক্রমপুরের রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয়। অনুসন্ধান করিলে এই উন্নত প্রদেশের অরণ্য হইতে প্রাচীন কালের আরও অনেক ইতিহাস আবিষ্কৃত হইতে পারে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষা।

সম্পাদক মহাশয়,

আমার চিরস্নেহশীল কাকা ক'বছর হলো অমর-ধামে চলে গেছেন। গেছেনইবা বলি কি ক'রে; সময় সময় এখনও যে আমি তাঁকে আমার চোখের সাম্‌নে দেখতে পাই, তাঁর কথা স্পষ্ট শুন্‌তে পাই।

---

* একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই অঞ্চলের কোন রাজা তাঁহার নিম্ন কুলোদ্ভবা পত্নীকে সমাজ ভয়ে পরিত্যাগ করিলে, সে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রার্থনা করে। রাজা এই প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হইয়া তাহাকে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি গ্রামের নাম বলিতে আদেশ করেন। পত্নী, এক শ্বাসে যত গ্রামের নাম বলিতে পারিবে, তাহাই সে প্রাপ্ত হইবে জানিয়া বলিতে থাকে :—

বব, আঠারব (পলাচিপা) পনাব
ওরে, রাজা খানিক র, (গের গেরাইতে) গেরান,
পান খাবি ত—বিড়াব—

মানুষ না মরলে, তার মূল্য বুঝা যায় না। বার্দ্ধক্যে এমন কর্ম্মী ক'জন থাকে? কাকা আমার জন্য কি না করেছেন, কি না করতে পারতেন। তিনি বেঁচে থাকতে কত আবদার, অনাদরে তাঁকে তুচ্ছ করেছি, এখন দেখছি তিনি কেমন লোকের মত লোক ছিলেন। তখন মনে করতাম তাঁকে চিনে ফেলেছি, এখন দেখছি কিছুই চিন্‌তে পারিনি। তাঁর স্নেহ অপরাজিত ছিল, তিনি মায়া মমতার মূর্ত্তি ছিলেন। বালিকা আমি, কি ক'রে তাঁকে চিন্‌বো।

তিনি আমাকে অনেকগুলি পত্র লিখেছিলেন, সে সব আমি অতি যতনে রেখে দিয়েছি। মনে করছিলাম—সে সব পত্র প্রচার ক'রে এমন দুর্ল্লভ জনের তর্পণ করবো। আমি, "সৌরভ" প'ড়ে খুব সুখী হয়েছি। আমি আমার কাকার হাতের লেখা পত্র কখনও হাত-ছাড়া করি না। আমোদ-জনক, আনন্দজনক, উৎসাহ-প্রদ এবং শিক্ষা-প্রদ তাঁর অনেকগুলি পত্র আমার কাছে আছে। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখে গেছেন আমি কেবল সেই পত্র গুলির নকল মহাশয়ের নিকট পাঠালেম; মহাশয়, দয়া ক'রে "সৌরভে" প্রকাশ করলে এই বালিকা আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাক্‌বে। পত্র গুলির মূল কথা ঠিক রেখে আপনারা যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন; নিবেদন ইতি।

বিনীতা

শ্রী সোণার কমল রায়।

অর্থাৎ রাজার পরিত্যক্তা পত্নী 'বব' ও 'আঠারব' নামক দুইটী প্রকাণ্ড গ্রামের নাম বলিবামাত্রই রাজা পত্নীর গলা চিপিয়া ধরিলেন, পত্নী এই অবস্থায়ই 'পনাব' নামক স্থানটীর নাম লইয়া বলিলেন, 'ওহে রাজা আর খানিক অপেক্ষা কর।' রাজা কিন্তু ছাড়িলেন না— পত্নী গুঁরাইয়া গুঁরাইয়াই (গের গেরাইতে) 'গেরাব' নামক গ্রামের নাম উচ্চারণ করিলেন; এবং রাজা যখন গোপনে তাহার নিকট যাইতেন তখন রাজাকে পান খাইবার জন্য সমাদর করিতে 'বিড়াব' নামক গ্রাম খানা দিতেও অনুরোধ করিলেন।

গ্রামগুলি এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া প্রবাদ কাহিনীটীর সম্মান রক্ষা করিতেছে। বিড়াবর পান এখনও প্রসিদ্ধ। রাজা শিশুপাল ও রাজরাণী মধীর সহিত অথবা বল্লালসেন ও তাঁহার ডোম পত্নীর সহিত এই প্রবাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? সৌঃ সঃ।

ঢাকা, ১৫ই জুলাই ১৯০৭।

সোণার কমল,

মা, তোমার পৌঁছ সংবাদ পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম। কলিকাতার পথে তোমার এই প্রথম যাত্রা—রেলগাড়ী হইতে জাহাজ। জাহাজ যখন লঙ্গর তুলিয়া ভৈরব গর্জ্জনে ছুটিল, তরঙ্গ ভঙ্গে দুলিতে লাগিল, তখন তোমার হৃদয়ের অবস্থা অনুমান করিয়া লইয়াছি। জাহাজ ধলেশ্বরী হইতে পদ্মায় গিয়া পড়িল। পদ্মা, ধলেশ্বরী, ও মেঘনার তিনটী স্রোত ভিন্ন, অথচ এক। দেশে তোমার সকলে রহিলেন, তুমি দূরে জলের উপর জাহাজে চলিয়াছ। সে জলে কখনও কূল দেখা যায়, কখনও কূল দেখা যায় না। কূলে কোথাও পল্লি-বধূগণ জাহাজ দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে; বালক বালিকা নদীর ঘাটে সাঁতার কাটিতেছে; দূর চড়ায় সাদা সাদা পাখী দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কত উড়িয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে। এপাশে ও পাশে কত নৌকা পাল তুলিয়া স্ফীত-বসনা গর্ব্বিতা মহিলার মতন সগর্ব্বে চলিয়াছে। নীল আকাশের কোথাও দুই এক খণ্ড মেঘ তোমারি মত উদাস মনে ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে আলোকে আঁধারে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। হায় মা, বাতায়নের কোলে বসিয়া তোমার চোখের জল পড়িতেছিল, কেহ মুছাইল না, রুমালে আপনি আপনার চোখের জল মুছাইয়া লইলে। উপরে জল, নীচে জল, চোখে জল, জলের কথায় আর জল ডাকিয়া আনিব না।

তোমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া হৃদয়টা হর্ষ ও বিষাদে বড় উতাল পাতাল করিতে লাগিল; হর্ষ এইজন্য যে, তুমি উচ্চ শিক্ষার এক উচ্চ লক্ষ্য লইয়া যাইতেছ; বিষাদ এই জন্য যে, কিছুদিন তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমার কথা শুনিতে পাইব না। তুমি মা হারার মা, মেয়ে হারার মেয়ে। একজনে দুর্লভ দুই। ঘরে মা ও মেয়ের অভাব বড় বিষম বাজিল। প্রতিদিন ভোরে তেমনি ফুল তুলি, কাকে দিব? কত ফল এখনও তেমনি রহিয়াছে, কে খাইবে? এ জীবনে এমন শূন্য আর কখনও বোধ হয় নাই।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার বিছানার উপর হাত-পাখাখানি পড়িয়া আছে। এই হাত পাখাখানি তুমি লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলে। ভুলে নেও নাই, ভুলে দেই নাই। তালের পাখা দেই নাই,-তার জন্য কি?

বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে অতি সুন্দর নূতন পাখা দিয়াছেন। পাখীর পাখা আছে, সে দূরে, কতদূরে, উর্দ্ধে, কত উর্দ্ধে, উড়িয়া যায়। বিদ্যায় মানুষ বিচিত্র পাখা পায়। কত যুগের, কত দূরের, কত দেশ, কত বিদেশের, কত দিনের অবস্থা সে দেখিয়া আইসে; কত কালের, কত গণিত বিজ্ঞানের উচ্চ শাখায় সে উড়িয়া বসে। প্রাচীন ভারতের পুরাতন ইতিহাস, প্রাচীন মিশর গ্রীস ও রোমের পুরাতন ইতিবৃত্ত তার সম্মুখে। তালপাতার পাখায় শরীর জুড়ায়; সুশিক্ষার বাতাসে মন জুড়ায়, হৃদয় শীতল, ও আত্ম তৃপ্ত হয়। এই পাখা তোমার অক্ষয় হউক। একখানা স্থলে পাঁচখানা হউক।

যাইবার সময় তোমায় বলিয়া দিয়াছিলাম—ভগবানকে স্মরণ করিয়া কলেজে পা দিও, তাঁর নাম লইয়া নাম লিখাইও। তুমি ইংরেজ মহিলাদের পরিচালিত কলেজে পড়িতেছ, তাহা ভাবিও না; বঙ্গ মহিলাদের কাছে পড়িতেছ, তাহাও ভাবিও না। সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিও—বঙ্গরমণীর উচ্চশিক্ষার বিদেশী সুহৃৎ মহাত্মা সেই বেথুনকে। তিনি অমূল্যধন দিয়া তোমাদিগকে কিনিয়া গিয়াছেন। ভক্তি ভরে কৃতজ্ঞতা দিয়া তাঁহার ঋণ শোধিতে যত্ন করিও। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিও। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। এসব কথা তুমি অবশ্যই পালন করিয়াছ। পালনই তোমার প্রকৃতি, কৃতজ্ঞতাই তোমার অলঙ্কার। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আজ এই পর্য্যন্ত। বঙ্গমহিলাদিগের শিক্ষা, সমাজ এবং রীতি নীতি সম্বন্ধে ক্রমে লিখিব।

তোমার
চিরস্নেহানুগত কাকা।

প্রার্থনা।

হৃদয়ে রাজ, হে হৃদি-রাজ!
জুড়িয়া হৃদয় খানি,
ব্যর্থ জীবন, হউক ধন্য
সফল জনম মানি।

পূত পরশে হৃদয়-তন্ত্রী
উঠুক মধুর বাজি,
প্রসাদে তব নব চেতনা
লভুক পরাণ আজি।
হৃদয়ে রাজ, হে হৃদিরাজ!
জুড়িয়া হৃদয় খানি,
বিমল হো'ক্ হৃদয় মম
ঘুচুক্ অভাব গ্লানি।
জীবন-তরী তোমারি পানে
চালাব দিবস রাতি,
সকল মোহ করুক্ নাশ,
তোমার উজল ভাতি।

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

হারানিধি।

(১)

হেমলতা ভিতর বাড়ীর দালানের একটী কামরাতে বসিয়া গোল-আলুর খোসা ছাড়াইতে ছিল। মুখখানি ফ্যাকাসে, চোখ দুটী ভার ভার;—মন তার কাযে ছিল না। সে বার বার খোলা দরজা দিয়া বাহিরের পানে দেখিতে ছিল—পশ্চিমাকাশে শরতের মরীচি সবে গোলাপী হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যদেব তখন পশ্চিমদিগন্তে গাছপালার দিকে হেলিয়া পড়িয়া যেন হেমলতার মুখের পানেই রক্তিমমুখে প্রেমোজ্জল নয়নে চাহিয়াছিলেন।

সেই কামরার একপাশে একখানা খাটের উপর শুইয়া চপলা তখনো তন্ময় ভাবে 'কৌতুক-বিলাস' পড়িতেছিল। ঝালর দেওয়া বালিশ হইতে কালো চুলের রাশি, কালিন্দীর ঢেউ তুলিয়া সিমেণ্ট করা মেঝেতে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

সমুখের বারান্দাখানি—অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণালোকে হাসিয়া উঠিয়াছে ; সেখানে ছোট্ট দুটী মেয়ে খেলার সংসার পাতিয়া তাদের ভাবী ঘরকন্নার রিহার্সেল দিতেছিল। বড় মেয়েটীর বয়স বছর আটেক। ছোটটীর গায়ে এই সবে ছয়টী বসন্তের আলো হাওয়া লাগিয়াছে মাত্র। বড় মেয়েটীর পরণে জড়ি পেড়ে মিহি ঢাকাই সাড়ী, আঁচলটা কোমরে জড়ানো। হাতে দুগাছি হাঙ্গর মুখো সোণার বালা। —কিন্তু দেখিতে কালো ; আর ছোটটীর পরণে ময়নামতীর নীলাম্বরী, হাতে দুগাছি বেলোয়ারীর চুড়ি, দেখিতে বেশ সুন্দরী। তার চোখ দুটী দেখিলে জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে! মনে হয় বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া যেন এমনি দুটী চোখের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

চপলার 'কৌতুক-বিলাস' যখন শেষ হইল, হেমলতা তখনো একদৃষ্টে চাহিয়া শরতের আকাশে মরিচীই দেখিতেছিল। হেমলতাকে চুপ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া চপলা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল —"কুটনো কাট্‌তে কাট্‌তে এ আবার কোন্ দেশী নভেলী আনা, ছোট বৌ!" চপলার মর্ম্মভেদী বাক্য-বাণে হেমলতার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বৃষ্টির পর ছোট চারা গাছে নাড়া পড়িলে যেমন হঠাৎ টুপ্ টাপ করিয়া এক সঙ্গে কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া যায়, হেমলতার বাধা দিবার পূর্ব্বেই তার চোখ হইতে কয়েক ফোঁটা জল তার হাতের উপর আসিয়া পড়িল। তার একটী মাত্র অশ্রুসিক্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে শরতের অপরাহ্ন যেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। একখানি ব্যর্থ হাসির আড়ালে নিজের মর্ম্মবেদনা কোনও রকমে সামলাইয়া হেমলতা ধীরে ধীরে বলিল— "নভেলীআনা নয় দিদি, আছি আছি হঠাৎ মন কোথা উড়ে যায়!" চপলা চাপা হাসির সহিত নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ মিশাইয়া বলিল—"মন উড়ে যায়!—পেথম ধরা বন্দ কর, গতিক ভাল নয় ছোট বউ, ও সব থিয়েটারী ঠাট্ আমাদের ভাল লাগে না।"

হেমলতা মিনতির সুরে বলিল—"ভাঙ্গা বুকে আর ঘা দিয়ো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—"

চপলা আবার হাসিয়া বলিল—"ভাঙ্গা বুক! চমৎকার নভেলী আনা যা হোক! টুক্‌রো গুলি ফেলে দিস্‌না ভাই, ঢাকায় ভগ্নহৃদয়ের নতুন একটা যাদুঘর খুল্‌বে শুন্‌চি?"

বরং দুঃখ সহ করা যায়, কিন্তু যারা দুঃখকে অপমান করে, তাদের কথা শোনা অসহ। আবার হেমলতার চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া গেল, ঝাপ্‌সা চোখে কিছু না দেখিতে পাইয়া বঁটীতে আলু কাটিতে গিয়া তার আঙ্গুল কাটিয়া গেল! যখন রক্তে ও চোখের জলে তার আঁচল খানি মাখামাখি হইয়া গেছে তখন বারান্দা হইতে কালো মেয়েটী নাকী সুরে বলিয়া উঠিল—"দেখ দেখি মা; পুঁঠি অলক্ষীটা আমায় চিম্‌টী কাট্‌চে যে!" সুন্দরী মেয়েটী তাড়াতাড়ি ডাগর ডাগর চোখ দুটী তুলিয়া চপলার পানে তাকাইয়া বলিল —"না কিন্তু জেঠীমা! ও বলে আমি তোর ছেঁড়া কাপড়ে থুথু দেবো। আমি বলেচি দাও দেখি থুথু, বুঝবে এখন রাম চিম্‌টীর মজাটা! বলেচি খালি, আমি তারে চিম্‌টী কখখনো কাটিনি, জেঠীমা!"

পুঁঠী হেমলতার মেয়ে। আর কালো মেয়েটীর নাম বনলতা। সে চপলার মেয়ে।

চপলা তখন বাঘিনীর মত কটমট করিয়া বনলতার পানে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"খুকী এদিকে আয় তো দেখি একবার!" বনলতা চোরের মত চপলার কাছে আসিলে, চপলা গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"রোজ রোজ বলি, মণিটী, লক্ষ্মীটী আমার, একলাটী বসে খেলা কর। না সে কথা ওর কাণে ঢুকেনা! সারা দুপুরটা ধ'রে একরত্তি ঘুম নেই। যত হিংসুটে মেয়েদের সঙ্গে মিলে হৈ হৈ রৈ রৈ! কোথাকার শত্রু পেটে এসে জুটেছিল!" কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মুখে একটা ঝাম্‌টা দিয়া চপলা হেমলতার দিকে রুক্ষ ভাবে চাহিয়া বলিল —"পুঁঠীর স্বভাব খানা কি সুন্দর করেই গড়ে তোলা হচ্চে, আহা মরে যাই। তুমি ওর ইহকাল পরকাল খেলে—"

হেমলতা পাথরের পুতুলের মত বঁটীর গোড়ায় বসিয়া রহিল। নির্ব্বাক পাষাণের সঙ্গে ঝগড়া করা বড় কঠিন। কিন্তু চপলা বাতাসের গলায় দড়ি বাঁধিয়া কোন্দল করিতে জানিত। চপলা পুঁঠীর আরো অনেক অনেক কীর্ত্তির কথা সবিস্তারে খুলিয়া বলিতে যাইতেছিল, কারণ, সে সব কথা তার স্মৃতিপটে তালিকা করা ছিল;—এমন সময় সিকদারদের বাড়ীর নিপুর মা নেপথ্য হইতে বলিল— "কি হয়েছে মা?"

নিপুর মাকে আসিতে দেখিয়া চপলা মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিল। সে চপলার কাছে আসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"এমন করে চুপটী করে বসে আছ কেন মা? ব্যাপার খানা কি?"

চপলা মুখটার একটা প্রবল নাড়া দিয়া বলিল —

"ব্যাপার আবার কি মাথা মুণ্ডু! এ বাড়ীতে রোজ কুরুক্ষেত্র, রোজ রাবণ বধ!"

নিপুর মা এ বাড়ীর নিত্য কুরুক্ষেত্র—নিত্য রাবণ বধের খবর রাখিত। তাই সে বলিল, "পুঁটী বুঝি বনকে মেরেচে?"

চপলা কথা কহিল না। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং।'

নিপুর মা তাড়াতাড়ি বনলতার দিকে ছুটিয়া আসিয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—"ষাট্ ষাট্ মাণিক আমার, কে মেরেচে আমার সোণাকে!" বনলতা এতক্ষণ অভিমানে ফুলিতে ছিল। নিপুর মার সোহাগে তার দুঃখ এখন একেবারে উথলিয়া উঠিল। সে কোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—"ঐ পুঁঠিটা, অলক্ষীটা রোজ রোজ আমায় মারে, বকে!" নিপুর মা বনলতাকে সোহাগ করিবার জন্য আসে নাই। তার নিজের একটু গরজ ছিল। তাই বনলতা একটু শান্ত হইলেই সে আলগোছে কথাটা চপলার কাছে পাড়িয়া বসিল—

"নিপুর আজ তিনদিন থেকে জ্বর হয়েছে মা, বিছানায় উঠে বস্‌তে পারে না!"

চপলা। "তিনদিন থেকে?"

নিপুর মা। "তিনদিন থেকে মা, একলাগা জ্বর, দিনরাত শীতে ঠক্ ঠক্ কচ্চে, তোমাদের যদি ছেঁড়া ফেঁড়া গরম জামা টামা থাকে ত পেলে আমরা গরীব দুঃখী লোক বর্ত্তে যাই।"

চপলা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—"আমাদের কে দেয়, তার নাই ঠিকানা,—তোমাকে কোথেকে দেবো? আমাদের সংসার যেমন হয়ে উঠেছে!"

নিপুর মা যে আশা করিয়া আসিয়াছিল, তা তো এক রকম মিটিয়াই গেল। "আজ তবে আসি মা" বলিয়া চপলার অনুমতির আর অপেক্ষা না করিয়াই সে হন্ হন্ করিয়া উঠানে আসিয়া পড়িল। সেখানে হেমলতার সঙ্গে দেখা। হেমলতা তখন তার মেয়ের গা হইতে একটা ফ্লানেলের

জামা খসাইতে খসাইতে বলিল "দাঁড়াও না, নেপুর মা! একটা কথাই শুনে যাও না!"

ওদিকে কোন ভরসা নাই ভাবিয়া নিপুর মা সেদিকে ভিড়িতে চাহিল না। সে সংক্ষেপে বলিল—"না বাছা, নিপুর যে কাঁপুনিটা উঠেছে হরিঠাকুর কপালে আরো যে কি লিখেছেন, তিনিই জানেন,—হরি দীনবন্ধু!" নিপুর মা বড় চালাক স্ত্রীলোক। যেদিকে ভরসা নাই, সে দিক সে বড় একটা মাড়ায় না। তবু যখন হেমলতা ফের্ ডাকিল -"শুনেই যাও না একবার।" তখন অগত্যা সে হেমলতার কাছে আসিল। হেম তখন একবার এদিক ওদিক দেখিয়া নিজের মেয়ের জুটফ্লানেলের জামাটী নিপুর মার হাতে দিয়া চুপে চুপে বলিল—"ক্যাকতলায় কাপড় ঢাকা করে জামাটী নিয়ে যাও, ঘরে গিয়ে নিপুকে পরিয়ে দিয়ো! খবদ্দার দিদি যেন টের না পায়!"

নিপুর মা চীলের মত জামাটী ছোঁ মারিয়া বগলে পুরিয়া বলিল—"এমন লক্ষ্মী না হলে কি এ বাড়ীতে তুমি টিঁকে আছ মা! এ বাড়ীতে বেড়ালটা পর্য্যন্ত টেঁকে না! তোমার ভাঙ্গা সংসার জোড়া হোক, তোমার হাতের শাঁখাসিন্দুর অক্ষয় হোক!"

হেমলতার দুঃখ তখন নিঃশব্দে অশ্রুবিন্দু রূপে তার নয়নের অর্দ্ধপথে আসিয়া যেন সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল!

'মা, তোমার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক', বঙ্গনারীর কাছে এর বড় আশীর্ব্বাদ নাই. এর বড় উচ্চাভিলাষ নাই।

কিন্তু নিপুর মা যখন হেমলতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল "মা তোমার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক!" তখন হেমলতার চোখে জল আসিল কেন? এই রহস্যটীর মধ্যেই হেমলতার দুঃখের কাহিনীটী প্রচ্ছন্ন। চপলার স্বামী সুরেন্দ্র মোহন বি, এল, পাশ করিয়া উকীল হইয়া ঘরে দুপয়সা আনিতে লাগিলেন। কারণ, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর আইন-মার্জ্জিত প্রতিভা মক্কেলের টাকার থলের ভিতরে শিকড় চালাইয়া দিয়াছিল। সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র মোহন যখন দুই দুইবার পরীক্ষা দিয়াও বি, এ, পাশ করিতে পারিল না, তখন সে বাড়ীতে আসিয়া তার নব-বধূ হেমলতাকে লইয়া গভীর ভাবে প্রেম-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিল। প্রথম চপলাই হেমলতাকে শুনাইল যে "এক ভাই কেবল মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিবে, আর এক ভাই কেবল নিরুদ্বেগে রসিয়া বসিয়া পত্নী-চর্চ্চা করিবে,

তাহা হইবে না।" হেমলতা কথাটা নরেনের কাণে তুলিল না,—হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। প্রথম প্রথম চপলার ঔষধ সুরেন্দ্রের চিত্তে কোনও কাজ করিল না কিন্তু কালক্রমে সুরেন্দ্রের হৃদয়ও বিষাক্ত হইয়া উঠিল। যখন নরেনের মেয়েটি জন্ম গ্রহণ করিল, তখন সুরেন্দ্র ভাইকে বলিলেন—"রোজ রোজ ঝঞ্ঝাট দিকদারি আর সহ্য হয় না। আমাদের এক অন্নে থাকা যখন পোষাবেই না তখন আগে থাকতেই পৃথক হওয়া ভাল।" নরেন সে দিন কিছু বলিল না। সারারাত বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া খালি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিল, "এই দাদা আমার কি সেই দাদা, যে আমার কলেরা হইলে পর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিতে গিয়াছিল!" হেমলতা কাছে আসিলে নরেন সেদিন তার সঙ্গেও ভাল করিয়া কথা কহিল না। তার পরদিন প্রাতঃকাল হইতে তাহাকে কেহ আর দেখিতে পাইল না। নরেন সেই দিন হইতে নিরুদ্দেশ। মন দেখা গোছের খোঁজা হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। তারপর এই দীর্ঘ ছয়টী বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, নরেনের কোনও খবর নাই। বাঁচিয়া থাকিলে সে অন্ততঃ হেমলতাকে তো একখানা চিঠি লিখিত—এত ভাল বাসিত তারে! সকলে বলিল, "মনের দুঃখে নিশ্চয় কোথায় আত্মঘাতী হয়ে মরেছে।" ছয় বৎসর পরে হেমলতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীগণের মধ্যে দু একজন আসিয়া হেমলতাকে প্রবোধ দিয়া বলিল —"আর কেন মা, শাঁখা ভেঙ্গে ফেল, সিঁদুর মুছে ফেল, বিধবার এ সব পরা অকল্যাণ বই আর কিছু নয়।" হেমলতার জবাব দিবার কিছু ছিল না, তাদের কথা আর অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ ছিল না। তবু কিন্তু সে হাতের শাঁখা ভাঙ্গিতে পারিল না, মাথার সিঁদুর মুছিল না।

(৩)

চপলা ধোপানীকে কাপড় বুঝ করিয়া দিতেছিল। এমন সময় হেমলতা শুষ্ক মুখে ছুটিয়া আসিয়া চপলাকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি খুকী কোথায় বল্‌তে পার?"

চপলার বুকটা ধরাস্ করিয়া উঠিল। নিকটে বনলতাকে দেখিয়া তবু মনটা সুস্থির হইল। কাল পুঁঠী বনলতার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে বলিয়া আজ চপলা তাকে পুঁঠীর সঙ্গে খেলিতে যাইতে দেন নাই। বনলতা তাই আজ ঘরের মধ্যে তাঁর নজরবন্দী হইয়া একা খেলা করিতেছিল—কিন্তু

পুঁঠীকে ছাড়িয়া আজ তার খেলা ভাল লাগিতে ছিল না। পুঁঠীও যথা সময়ে বনলতার সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছিল। চপলা তাকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, "বনলতা তার মত হিংসুকে মেয়ের সঙ্গে আর কখনো খেলিবে না।" পুঁঠী চলিয়া গিয়াছে,—কোথায় কে জানে! কেইবা তার খবর রাখে! হেমলতা এই অল্পক্ষণ হইল রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়াছে। এখনো অন্নজল মুখে পড়ে নাই। অনেকক্ষণ পুঁঠীকে না দেখিয়া খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। তখন বেলা তিনটা। সারাদিন রান্না ঘরের আঁচ লাগিয়া হেমলতার মুখখানি নারাঙ্গীর মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তেমন সকরুণ মুখ দেখিয়াও চপলার দয়া হইল না। প্রথমতঃ সে কথাই কহিল না, যেন হেমলতার কথাই সে শুনিতে পায় নাই!

হেমলতা আবার জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, খুকী কোন দিকে গেছে. বলতে পার?"

চপলা ধোপানীকে কাপড় দিতে দিতে বলিলেন —"আমি সারাদিন তোমার খুকীর খোঁজেই ছিলাম কিনা, সংসারে আমার কি আর কায আছে!" হেমলতা বলিল "খুকী তবে আজ বনোর সঙ্গে খেলা কর্ত্তেও কি আসেনি?" চপলা রাগ করিয়া বলিল—"এলে বুঝি আমি তারে 'পোটমেনে' বন্দ করে রেখেছি?" এই বলিয়া আঁচল হইতে ঝনাৎ করিয়া চাবির গোছাটা হেমলতার সামনে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া চপলা বলিল—"এই চাবি নিয়ে বাক্স পেটারা খানাতালাস করে দেখে যাও না!"

বনলতা পুতুল বিয়ে দিতেছিল। "এসেছিল বৈ কি কাকী মা, পুঁঠী এসেছিল খেলতে, মা—"এই টুকু বলিতে না বলিতেই, চপলা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। বনলতার কথা আর শেষ করিয়া বলা হইল না। হেমলতা কাঁদো কাঁদো হইয়া চপলাকে বলিল —"রাগ করো না দিদি, সেই দুপুর বেলা থেকে খুঁজে বেড়াচ্চি কোথাও পাচ্চি না!" চপলা বলিল — "তা সে মেয়ে কি দুপুর বেলা ঘরে থাকবার মেয়ে! এ বল্লেই তো আমি মন্দ মানুষ হয়ে যাই। আমার কিন্তু ভাই সব উচিত কথা!"

নিত্য পিসি রায়দের বাড়ীর রাঁধুনী বামনী। তিনি দাঁতে খড়্কে দিতে দিতে তখন চপলাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। কথাবার্ত্তা শুনিয়া তিনি বলিলেন —"কি কথা হচ্চে তোমাদের বাছা?"

হেমলতার মাথার অবগুণ্ঠন তখন খসিয়া গিয়াছে! বৎস-হারা বনের হরিণীর মতো করুণ তার চোখ দুটী নিত্য পিসির পানে তুলিয়া বলিল— "পুঁঠীকে সেই দুপুর বেলা থেকে খুঁজে পাচ্চি না, পিসি!" কথাটী বলিতে বলিতে হেমলতা কাঁদিয়া ফেলিল। নিত্য পিসি হেমলতাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"কোথা যাবে আর, একরত্তি মেয়ে, কোথায় হয়তো বসে খেলচে!" যে ধোপানী কাপড় নিতে ছিল, সে বলিল —"আমি তোমাদের বাড়ী আসবার সময় দেখেচি পুঁটী ঘোষদের বড় দীঘির ঘাটে বসে বসে জল থেকে ঝিনুক কুড়াচ্চে!"

চপলা বলিল—"বলিনি আমি যে সে মেয়ে দুপুর বেলা ঘরে থাকবার মেয়ে নয়? আমি বল্লেই তো ছোট বৌয়ের মুখ খানা হাঁড়ি পানা হয়ে ওঠে! উচিত কথায় বন্ধু রুষ্ট!"

নিত্য পিসি বলিয়া উঠিলেন —"ওমা, কি সর্ব্বনাশের কথা গা—সে ঘাটে যে ঢের জল!- যদি তলিয়ে গিয়ে থাকে!"

চপলা বলিল—"যে দস্যি মেয়ে, বাপরে বাপ! তবু ভাগ্যি যে এ বাড়ীতে কিছু হয় নি—তা হলে কত কথাই উঠ্‌তো! অমনিই তো এ বাড়ীতে কথার অন্ত নেই!"

হেমলতা একটা অস্ফুট চিৎকার দিয়া, ছিন্ন স্বর্ণ-লতিকার মত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল;—ব্যথা তখন তার সহের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। চারিদিকে লোক বাহির হইল, কিন্তু কোথাও পুঁঠীকে পাওয়া গেলনা।

গদাধর বলিল—"আমি তো ঠিক দুটোর সময় ওকে পূব দিকে যেতে দেখেচি!" ধরণী বাবু—চসমা চোখে, বিজ্ঞ ভাবে বলিলেন— "সুরেন ভায়া, একবার তোমাদের খিড়কীর পুকুরটা আর ঘোষদের দীঘীটা জেলে দিয়ে drag করিয়ে দেখ।" ভারত বাবু একটা মোটা সিগার খাইতে খাইতে বলিলেন—"ওরে তোরা কে আছিস্‌রে! যা তো দেখি একজন রেলের লাইন ধরে খানিকটা এগিয়ে দেখে আয়।" বিধবা শ্যামা গোয়ালিনী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল —"আহা! কি সুন্দর মেয়েটা, চোখ দেখলে প্রাণ জুড়ায়!" ও বাড়ীর সিকদারদের বন্ধ্যা বধূ কমলা আঁচল দিয়া বার বার ঝাপ্‌সা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"আহা! মেয়ে নয় তো, যেন হুবহু মোমের পুতুলটী!"

অবশেষে জেলেরা আসিল। প্রথমে সুরেন বাবুদের খিড়কীর পুকুরে জাল ফেলিয়া মরা মেয়ের সন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। তখন সকলে মনে করিল, ঘোষদের বড়দীঘির ঘাটেই ঝিনুক কুড়াইবার সময়, পুঁঠী পা পিছলাইয়া কখন জলে পড়িয়া গিয়াছে।

ক্রমে ঘোষদের বড়দীঘিতে জাল ফেলান হইল—বন্য গাছপালা গুলি, সাঁঝের মুখে, দীঘির চারিপাড়ে ভিঁড় করিয়া দাঁড়াইয়া, আপনাদের শ্যামল মুখগুলির প্রতিবিম্ব দেখিতেছিল। জলের আলোড়নে সে সোণার সবুজে আঁকা ছবিগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল। বার বার জালগুলি অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, পড়িল—কিন্তু সে ছিন্ন তারা,—সে হারাণো মাণিক,—আজ যেন কোনও স্নেহজালেই ধরা দিতে ছিল না।

রবির শেষ আলো রেখা যখন নিকটস্থিত সারি দেওয়া সুপারী গাছের মাথার উপরে তাড়াতাড়ি মিলাইয়া আসিতেছিল, তখন জেলেদের অনুসন্ধানের কায শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় জাল গুটাইয়া জেলেরা পাড়ের দিকে উঠিয়া আসিল। সুরেন বাবু তীরে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন যখন শেষ দৃশ্যের শেষ কালীন বিশাদ করুণ অভিনয়টুকুর উপর নিরাশার নীল যবনিকা খালি তুলিয়া উঠিল, তখন তিনি শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন। নব শোকের বেগে, মুখের পাথর খানা খসিয়া পড়িতেই সুরেন বাবুর রুদ্ধ স্নেহ ফোয়ারার মত আপনাকে শতধারে বিস্তার করিয়া উৎসরিত হইয়া উঠিল "পুঁঠি! মা! নরেনের স্মৃতিটুকুও তুই আমার সংসারে রাখ্‌তে দিলি নে মা! এত নিষ্ঠুর তুই!'

"জেঠা মশায়! আমি এসেছি।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত সুরেন বাবু পেছন ফিরিয়া দেখেন, ষ্টেসনমাষ্টার কুলদা বাবু পুঁঠীকে কোলে করিয়া হাঁপাইতেছেন। বালিকা কুলদা বাবুর কোল হইতে দুই বাহু মেলিয়া দিয়া জেঠা মহাশয়ের পানে হেলিয়া পড়িল সুরেন বাবু তাকে আপন বুকের উপর টানিয়া লইয়া তার তিল পরা আরক্তিম গালটীতে চুম্বন করিলেন, স্বর্গ আসিয়া যেন পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিল।

(৪)

শিশুদের খেলার সংসার বয়স্কদের খেলার সংসারের মত নিরানন্দ নয়, সে এক চির প্রফুল্লতার স্বর্গ রাজ্য। স্বয়ং আনন্দ ময় শিশুর বেশে শিশুদের সহিত খেলিতে আসেন। পুঁঠী যখন বনলতার পুতুল বিবাহের মজলিসে স্থান

পাইল না, সে তখন খানিকক্ষণ ঘোষদের পুকুর ঘাটে বসিয়া ঝিনুক কুড়াইল। নিঃঝুম দুপুর বেলা একলা ঝিনুক লইয়া খেলা কবিদের সাজে—কিন্তু পুঁঠীর তা ভাল লাগিবে কেন? সে নিকটবর্ত্তী ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর অন্তঃপুরে আসিয়া তাঁর মেয়েদের সঙ্গে খেলায় জুটিয়া গেল। যখন তার মার, মরা মেয়ের মরা মুখ খানি বই দুনয়নে দুনিয়ায় আর কিছুই নজরে আসিতেছিল না, তখন সে জীবন্ত মেয়ে তার আপন প্রাণে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ রসে মাটীর পুতুল গুলিকে শুদ্ধ বাঁচাইয়া তুলিয়া, আপন মনে খেলা করিতেছিল। খেলায় খেলায় দিন কাটিল,—সন্ধ্যা হইল, তবু ঘরের কথা তার মনেই হইল না।

রাত্রি ৯টার সময় হেমলতার একটু চেতনা হইল। সে দেখিল সে আর সেই কঠিন মেঝের উপরে ধূলি বিলুণ্ঠিত নয়। খাটের উপর পরিচ্ছন্ন শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে পুঁঠী বুকের কাছে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছে। স্বয়ং নরেন মাথার কাছে বসিয়া মাথায় ইউ-ডি-কলোন দিতেছেন। চপলা পাখা করিতেছে তারো চোখে অশ্রুর কোমল রেখা! এ কি স্বপ্ন?—না চোখের ভুল? হেমলতা অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় একটীবার মাত্র সে দৃশ্য দেখিয়া লইয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

হেমলতার যখন আবার জ্ঞান হইল, তখন সে সত্যই শুনিল সুরেন্দ্র মোহন বলিতেছেন:—"বউমা এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন, নরেন! উঠে এসো দেখি একবার—সারা দিন কিছু খাও নি তুমি।"

এর মধ্যে তারহীন তাড়িত বার্ত্তায় নরেনের পুনরাগমনের খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সে এখন রেঙ্গুন চিফ্ কোর্টের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন এডভোকেট। এ কয় বৎসরেই 'পশার' বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। সুরেন বাবু যখন নরেনকে মিষ্ট-মুখ করিতে ডাকিলেন, চপলা তখন হাফ্ ঘোমটার নীচ হইতে সকলকে বিশেষতঃ সুরেন বাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিল—

"আর কি ঠাকুরপোর ক্ষুধাতৃষ্ণা জ্ঞান আছে? তবে এত দিন যে কাউকে মনে পড়েনি, সে বোধ হয় মগের মুল্লুকে কেউ ভেঁড়া করে রেখে দিয়েছিল বলে!"

নরেন হাসিয়া বলিল—"এ শাস্ত্রে তোমাদের যে হাত যশ আছে তা অস্বীকার করবার যো নাই। কিন্তু কে কাকে ভেঁড় করে রেখেছিল, সে সম্বন্ধে 'সোয়াল জবাব' হবে এর পর তোমাতে আমাতে! আগে এক পেয়ালা চা করে নিয়ে এস দেখি, বৌদি।"

চপলা তাড়াতাড়ি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিল। কিন্তু নিপুর মা তার আগেই আসিয়া উনুন ধরাইয়া গরম জল তুলিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য আজও নিতান্ত বিনাগরজে সে এ বাড়ীতে আসে নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

বধ্য ভূমির ভীষণ দৃশ্য।

"বধ্য ভূমির ভীষণ দৃশ্য" নামক যে চিত্রখানা এবার সৌরভের মুখ-পত্র স্বরূপ উপস্থিত করা হইল এই চিত্রখানা "আইন-ই-আকবরী" নামক ভারত ইতিহাসের এক খানা দুর্ল্লভ চিত্র। বিলাতের কেন্‌সিংটন নামক স্থানের ভারতীয় চিত্র শালিকার যে ভারতীয় চিত্রাবলীর আদর্শ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, ইহা তাহারই এক খানার প্রতিলিপি "Journal of the Indian Arts and Industries" এর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বার্ডউড এই চিত্রখানা তাঁহার পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে ইহার আলোক চিত্র সংগ্রহ করিয়া আজ সৌরভের পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিলাম।

চিত্র খানার প্রতি তাকাইলেই ইহা যে এক খানা বধ্যভূমির চিত্র তাহা স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায়। বধ্যভূমির সীমার বাহিরে দর্শক মণ্ডলী সমাসীন। কৃতান্ত সম প্রহরিগণ, হিন্দুমুসলমান, খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে অপরাধীদিগের হস্তযুগল অভিনব প্রণালীতে যন্ত্রাবদ্ধ করিয়া বধ্যভূমির দ্বার পথে লইয়া আসিতেছে ও স্থানে স্থানে রাখিয়া যাইতেছে। উন্মত্ত প্রায় মাতঙ্গগুলি চালকের ইঙ্গিতে কাহাকেও পদতলে দলিত করিতেছে কাহাকেও দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করিতেছে কাহাকেও বা শুণ্ডাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে। কোন স্থানে কোন হতভাগ্য সহ-যাত্রির এইরূপ শোচনীয় গতি প্রত্যক্ষ করিয়া আকুলচিত্তে স্বীয় ভীষণ পরিণাম চিন্তা করিতেছে। কি ভয়াবহ চিত্র! চিত্র খানার নিম্নদিকে পারস্য ভাষায় লিখিত কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। বোধ হয় তাহা কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এই কয়েক পংক্তি দ্বারা চিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নিম্নে আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।

"প্রকাশিত হইল। ঐ অঞ্চলের জায়গীর দারগণ প্রজা পালনের উপদেশ সহ স্ব স্ব জায়গীর বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। কয়েকজন গোল যোগে লিপ্ত ব্যক্তি যাহারা পবিত্র রাজদ্বার হইতে পলায়ন করতঃ দুষ্ট বিদ্রোহীদিগের নিকট গিয়া

ছিল এবং সর্ব্বদা বিদ্রোহের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিল—(তাঁহারা) সৌভাগ্য রজ্জুতে ধৃত হইয়াছিল। যেমন জাঁকলী উজবেক, ইয়ার আলী, খোশাল বেগ যাহারা কুরচি (সৈন্য) দলের মধ্যে —" *

চিত্রে উদ্ধৃত এই কয়েক পংক্তি হইতে ইহাই অবগত হওয়া যাইতে পারে যে, সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, অবশেষ বিদ্রোহিগণ ধৃত হইলে কিছুকাল বিদ্রোহ দমিত হয়। ঐ সময় রাজধানীতে এই প্রদেশের জায়গীরদারদিগকে আনিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহ দমনের ও অনুগত প্রজা প্রতি-পালনের উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় করা হয়। ইহার-পরা-ধৃত বিদ্রোহী দিগের মধ্যে কয়েকজন রাজদ্বার হইতে পলায়ন করিয়া গিয়া পুনরায় বিদ্রোহ বহ্নি প্রধূমিত করে। এই পলাইতদিগের মধ্যে জাকলী উজবগ, ইয়ার আলী খোশাল বেগ পুনরায় ধৃত হয়। (ইহারা বোধ হয় কুরচি সৈন্য দলের অন্তর্গত ছিল অথবা কুরচি সৈন্য দলের সহিত যোগ দান করিয়া বিদ্রোহীদল গঠন করিয়াছিল)।

উদ্ধৃত লিপির শেষ অংশ ও প্রথম অংশ অসম্পূর্ণ বিধায় – চিত্রে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ভাবিত হইতেছে না। তাহা না হইলেও চিত্র খানা যে বিদ্রোহীদিগের পরিণামের চিত্র, ইহা এই অসম্পূর্ণ লিপি হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে।

চিত্রের মধ্যে যে অসম্পূর্ণ পাঠ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা ধরিয়া বিচার করিতে গেলে এই চিত্রখানাকে উজবেক বিদ্রোহ সংক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। আকবর সাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে, এই বিদ্রোহ তরুণ সম্রাটকে বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছিল। বাদশাহের সমগ্র উজবেগ বাহিনী, বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দেশ ময় বিরাট অশান্তির সৃষ্টি করে। বহু রক্ত পাতের পর বিদ্রোহী নেতাগণ ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইলে এই দেশ ব্যাপী অশান্তি নিবারিত হয়।

এই চিত্রখানা আইন-ই-আকবরীর বর্ত্তমান মুদ্রিত সংস্করণ গুলিতে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় দিল্লীর রাজকীয় পুস্তকাগারে আইনই আকবরি গ্রন্থকার আব্দুল ফজলের স্বহস্তে লিখিত যে গ্রন্থ খানা ছিল, তাহাতে চিত্র শিল্পীর স্বহস্ত অঙ্কিত এই চিত্রখানা সন্নিবিষ্ট ছিল। শিল্পীর নাম বণওয়ারী কাঁলা—চিত্রের নিম্নদেশেই লিখিত রহিয়াছে। কাঁলা শব্দের অর্থ বড়; তিনি দিল্লীর রাজকীয় বৈঠকে বড় বণওয়ারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

---

* শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক খানবাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হুসেন সাহেব এই কয়েক পংক্তির বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

সৌরভ

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, মাঘ ১৩১৯ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

অগুরু সিন্দূর বা এগার সিন্ধু।

অগুরু সিন্দূর বা এগারসিন্ধু বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। সপ্তগ্রাম বা তাম্রলিপ্তের মত সৌভাগ্য অর্জ্জনে সক্ষম না হইলেও এগার সিন্ধুর বাণিজ্য খ্যাতি বড় সামান্য ছিল না। "প্রেম বিলাস" নামক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়—

"এগারসিন্দুর আর দগদগা স্থানে।
বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্ব্বলোকে জানে॥"

দগদগা এগারসিন্ধুর ৮|৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রেম বিলাসের উক্তি অনুসারে বোধহয় ঐ গ্রন্থ রচনারও বহু পূর্ব্ব হইতেই এগারসিন্ধু বাণিজ্যে খ্যাতি অর্জ্জন করতঃ 'সর্ব্বলোকের' নিকট পরিচিত হইয়াছিল। এগারসিন্ধুর অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি করিলে এই স্থান বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযোগী বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। পশ্চিমে বিশালকায় ব্রহ্মপুত্র—এই স্থানে আসিয়াই এগারসিন্ধুকে বামে রাখিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করতঃ মেঘনাতে মিলিত হইয়াছে। এগারসিন্ধুর নিকট হইতেই ব্রহ্মপুত্রের একশাখা "বানার" উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের অপর শাখা "শঙ্খনদী" এগারসিন্ধুর মধ্যদিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া বিল বারোস্নায় পতিত হইয়া পরে সিংহাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রকৃতির এইরূপ অনুকূলে সংস্থাপিত এগারসিন্ধুর প্রতি যে চারিদিক হইতেই বাণিজ্য লক্ষীর শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

কালক্রমে শঙ্খনদীর মুখ বদ্ধ হইয়া গেলে এবং ব্রহ্মপুত্র আপন বিশালত্ব হারাইলে, এগারসিন্ধুর বাণিজ্য লক্ষ্মীও কোন অজানা পথে মহাপ্রস্থান করিলেন।

বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠতম ইশা খাঁ, জঙ্গলবাড়ীর কোচরাজ লক্ষ্মণ হাজোকে পরাস্ত করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে রাজধানী স্থাপন করতঃ আপন পরিবার ও ধনরত্ন রাখিয়া এগারসিন্ধুরে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। একদিকে ইশাখাঁর দুর্গ এবং তহশীল কাছারী যেমন সৈন্য ও বহু সম্ভ্রান্ত লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অপরদিকে নানা দিগ্‌দেশাগত ব্যবসায়িগণের সমাগমে এগার সিন্ধু-বন্দর কাককুল-সমাবৃত বট-বৃক্ষের ন্যায় নিয়ত জনকোলাহল মুখরিত হইতে লাগিল। পণ্য-বিথিকা সমূহের জন্য ভূমির রাজস্ব অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এখনও ভূমির রাজস্ব ঐ সকল স্থানে পূর্ব্বরূপ বর্দ্ধিতই রহিয়াছে। যে স্থানের বিপণিতে বর্ষে বর্ষে সহস্র মুদ্রা লাভ হইত, তাহাতে এখন কয়েক টাকার ফসল অর্জ্জন করিতেই কৃষককে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইতেছে। অথচ জমির জমা পূর্ব্ববৎই রহিয়া স্থান মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এখানে যে বহু আমীর ওমরাহের উপনিবেশ ছিল, জনপ্রবাদ সহস্রকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিতেছে। এখানে নাকি বারজন ওমরাহ আগমন করেন। এগার জন বাসোপযোগী স্থান পাইয়াছিলেন, একজন স্থান পাইলেননা। তিনি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। যাওয়ার কালে তিনি বলিয়া গেলেন—

"ইয়ারোঁ সে দুর"

এই স্থান বন্ধু বান্ধব হইতে দূরে রহুক, এই শব্দ হইতেই নাকি ক্রমে এগারসিন্ধুর হইয়াছে। কেহ বলেন এইস্থান সমগ্র ভাটি মুলুকের কপালের তিলকের মত অথবা অগুরু ও সিন্দুরের মত গৌরবের ও আদরের সামগ্রী। নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্রের কৃপায় এস্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন, বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি, দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সম্মিলন স্থান—বলিয়া কেহ কেহ এস্থানকে "অগ্রসিন্দূর" (কপালের সিন্দুর ?) বলেন। ভাগ্যকুলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী পালকুণ্ড বাবুদিগের প্রাথমিক সৌভাগ্যের পত্তন এইস্থানে। এই স্থানেই তাঁহারা বানীয়াগ্রামের গোস্বামী বংশের পূর্ব্বপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখনও উক্ত গোস্বামী মহাশয়েরা শিষ্যদিগের নিকট "দগদগা এগারসিন্দুরের গোঁসাই" বলিয়া পরিচিত।

ইশা খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে এই স্থানে তাঁহার সহিত বিপুল মোগল বাহিনীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে ইশা খাঁ জয় লাভ করেন। এগার সিন্ধুর নাম দিল্লীর বাদসাহ হইতে পথের কাঙ্গাল, সকলের মনে গৌরবের সহিত গৃহীত হইতে থাকে।

চিরদিন সমান যায় না। ইশা খাঁর অধঃপতনের পর এগারসিন্ধুর গৌরবও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এখন আর এগারসিন্ধুতে দ্রষ্টব্য স্থান কিছুই নাই। মসনদ আলী ইশা খাঁর ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রকারের লুপ্ত প্রায় চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান আছে। চারিদিকে অত্যুচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর, তাহার ভিতরের দিকে সুদৃঢ় ইষ্টক-প্রাচীর ও পরিখা।

নদীর দিকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার আছে। তাহাতে ভীষণ কাল-স্বরূপ অনল বর্ষী কামান সকল সজ্জিত থাকিত। দ্বারের সম্মুখে সতর্ক বিনিদ্র প্রহরীর আশ্রয় গৃহের ভূ-প্রোথিত ভিত্তির চিহ্ন অদ্যাপি লোপ হয় নাই। তবে মানবের ভূমির ক্ষুধা যে ভাবে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে একথা নিঃসন্দেহ বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এগারসিন্দুর শেষ চিহ্ন কেবল মাত্র প্রবাদের উপর আপন স্মৃতি সংরক্ষণ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। এই সকল কীর্ত্তিধ্বংসের সহায়তার জন্য দেশের ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা ধন্যবাদের পাত্র! তাঁহাদের জ্বালাময়ী শোষণ-পিপাসা প্রশমনের জন্য কৃষকগণ প্রাণ পণে আপন হৃদয়ের রক্ত এবং বহু প্রাচীন কীর্ত্তির অস্থি মজ্জা তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছে। ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কৃষকেরা এখানে কয়েকটী প্রাচীন পুষ্করিণী 'ভরট' করিয়া ফেলিয়াছে, মৃণ্ময় প্রাচীর "আইলে" পরিণত করিতেছে।

নিকটেই বেবুধ রাজার দীঘি। * বেবুধ রাজা (বুদ্ধিহীন কি?) কোচ দিগের অধিনায়করূপে এইখানে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেন; পরে প্রবলতর শক্তির উৎপীড়নে স্থানান্তরে প্রস্থান কারন। বেবুধ রাজার পুষ্করিণীতে ১০ বিঘা জমি অধিকার করিয়া আছে। এই পুকুরের পশ্চিম

* বেবুধ রাজার পুকুর'টীর সংবাদ অবগত হইয়া মসূয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ পুষ্করিণীর নিবিড় জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া উহা রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

তীরে বাহ্যচিহ্ন-মাত্র-হীন, লুপ্তপ্রায় একটী সমাধি আছে। ভূতলে সন্নদ্ধ, তৃণাচ্ছন্ন সমাধির কয়েকখানি ইষ্টক ধ্বসিয়া যাওয়ায়, উহার ভিতরের পরিমাপ করা গিয়াছে। উহার ভিতরের দৈর্ঘ্য ৮ হাত, প্রস্থ ৩॥ হাত ও উচ্চতা ২½ হাত। কে জানে, কোন্ সুদূর অতীতে, এক মহাপুরুষের শাল-প্রাংশু-দেহ গৌরব এই স্থানে সমাধিস্থ হইয়াছিল। তখন দেশে এরূপ বিরাট বপুঃ লোক জন্মিত। অন্ততঃ বিপুল দেহের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সমাধির সংস্কার করা আবশ্যক মনে করি।

বর্ত্তমান সময়ে এগারসিন্ধুতে, নিম্নলিখিত স্থানগুলি দ্রষ্টব্য।

১। নারকিন্ দরবেশের দরগা। ইহা এগারসিন্ধুর পূর্ব্বপ্রান্তে স্থাপিত। নারকিন সাধক মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি সাধারণ পাগলের মত ভ্রমণ করিতেন। ইহারই অনুগ্রহে সেখ সাহ্ মামুদ * অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই দরগার নিকট আসিয়া হিন্দু মুসলমান সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন।

২। গরিবউল্লার দরগা। গরিবউল্লা নারকিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও সাধক ছিলেন। বহুসংখ্যকে উষ্ট্র লইয়া বাণিজ্য করিতে আসিয়া, সময় ক্রমে ইনি গৃহত্যাগী ফকীর হন। ইহার দরগার স্থান প্রায় ৩০ হাত উচ্চ। দরগার অবস্থা এখন শোচনীয়।

৩। দিল্লীশ্বর সাজাহানের আমলের মস্‌জিদ। ইহার দ্বারোপরিস্থ প্রস্তর লিপিতে তুগ্রা-আরবী অক্ষরে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিত আছে।

"আল্লা ব্যতীত আর কেহ নাই। মহম্মদ আল্লারই কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন। যে ঈশ্বর ও পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করে, সে একটী করিয়া মস্‌জিদ প্রস্তুত করে। যে পৃথিবীতে একটী মস্‌জিদ প্রস্তুত করে, আল্লা তাহার জন্য স্বর্গে ষাইটটী মসজিদ প্রস্তুত করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিরুর পুত্র সাদির তত্ত্বাবধানে সাহজাহান বাদসা গাজির রাজত্ব সময় এই মসজিদ নির্ম্মিত হইল। হিজিরা অব্দ ১০৬২ রবিউল আওয়াল।"

মসজিদের দ্বারে এবং ভিতরের পশ্চিম দিকে একটী তোরণের ন্যায় অতি মনোহর কারুকার্য্যময় সুদৃঢ় ইষ্টকে নির্ম্মিত স্থান। মস্‌জিদ ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট এই মস্‌জিদের ভগ্ন অংশ সকল রক্ষা করিয়া সকলের ধন্য বাদার্হ হইয়াছেন।

---

* বারান্তরে সাহ মামুদের বৃত্তান্ত আলোচনা করা যাইবে।

৪। অধিকারীর মঠ—বেবুধরাজার পুকুরের অল্প পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা একখানি সুনির্ম্মিত দেবমন্দির। ভিত্তি প্রায় ৩২ হাত উচ্চ—দক্ষিণ দ্বারী মন্দির। ইহার দুই দিকে দুইটী পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। বাহির হইতে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন মন্দির বলিয়া প্রতীত হয়। সম্মুখের সিড়ি লোপ হইয়াছে; পশ্চিমের দরজায় সিড়ি আছে। ঐ খণ্ডের উত্তরেও একখানি দ্বার আছে। এক সময় এখানে দেববিগ্রহ স্থাপিত ছিল। প্রবাদ এই—মন্দির বানীয়াগ্রামের গোস্বামী মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত। চারিদিকে অগণ্য শিকর বিস্তার করিয়া এক বিশাল বটবৃক্ষ মন্দিরটীকে ধূলিশয্যায় অবসিত করিবার জন্য হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। চারিদিকের জমি,—মন্দিরের ভিত্তিলগ্ন স্থান পর্য্যন্ত কৃষকের সতর্কহস্ত-চালিত লাঙ্গলে খনিত হইতেছে। প্রতিরোধ করে কে? * এই মন্দিরের দ্বারের ইষ্টকগুলি ও কারুকার্য্যময়। বহু চেষ্টায় ও একখানি ইষ্টক বাহির করা গেল না। পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালেও কারুকার্য্য রহিয়াছে। বহুকালের মন্দির, কিন্তু দেখিলে মনে হয়, যেন এই সে দিন ইহাতে আস্তর দেওয়া হইয়াছে। হায়, এদেশের সেই সকল শিল্পী আজ কোথায়?

দিল্লীশ্বরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ ইশাখাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া এগারসিন্ধুর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে টোক নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। মানসিংহের সঙ্গে তোপছিল, তোপ নির্ম্মাতা কারিকরগণও সঙ্গে আসিয়া সেইখানে তোপের মেরামত ও নূতন তোপ প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। তোপ হইতে স্থানের নাম 'টোক' হইয়াছে ইহা অনুমান করা যায়।

এগারসিন্ধু দুর্গের অভ্যন্তরে জল সরবরাহ করিবার জন্য দুর্গের উত্তরে দুইটী বিশাল দীঘি ছিল। কাল সহকারে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দুর্গের আয়তন অতি প্রকাণ্ড। বহুশত বিঘাজমির উপর এই বিরাট দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমীর ওমরাহ এবং প্রধানগণের ভিটার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

---

*এই মন্দিরটীও মসূয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের অধিকার ভুক্ত। মন্দিরের উপরের বটবৃক্ষ কাটিলে মন্দিরটী রক্ষা পাইতে পারে, এই কথা নরেন্দ্রবাবুকে জানান মাত্র, তিনি আহ্লাদের সহিত ঐ স্থানের কর্ম্মচারীকে মন্দির পরিষ্কার করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর এই মন্দিরটী রক্ষিত হইবে আশা করা যায়।

এগার সিন্ধু মস্‌জিদ।
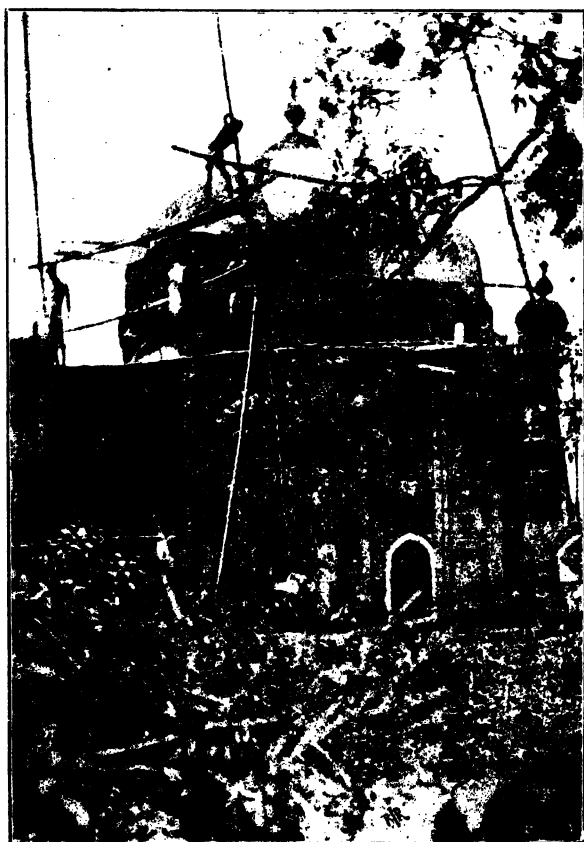
এগারসিন্ধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয়ের মধ্যে অলক্ষিতে শোনিতের ফল্গু বহিয়া যায়। মনে হয় যেন—সুদূর অতীতে কত বাণিজ্যতরণী ধবল পাখা বিস্তার করিয়া ব্রহ্মপুত্রের ও শঙ্খনদীর বক্ষ সগর্ব্বে দলন করিয়া এগারসিন্ধুর ঘাটে আসিয়া অপেক্ষা করিত। মাস্তুলে মাস্তুলে এগারসিন্ধু বন্দরের আকাশ সতত পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। তাহাদের চীনাংশুক কেতনমালা সগর্ব্বে উড্ডীন হইয়া বাণিজ্য-লক্ষ্মীর বিজয় ঘোষণা করিত। পাঁচ রোজের নামাজের সময় মস্‌জিদ হইতে মধুর 'আজান' উত্থিত হইত। সকালে সন্ধ্যায় হিন্দু দেবালয় হইতে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনির সহিত হরিধ্বনি দশদিক মুখরিত

করিয়া তুলিত। শত শত ভক্ত হিন্দু মন্দির-প্রাঙ্গনে যোড়করে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার কৃপা প্রার্থনা করিতেন। হিন্দু মুসলমানের মন্দির ও মস্‌জিদ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া উদার ভাবে আপন আপন ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করিত। সন্ধ্যায় শত সহস্র দীপালোকে জল স্থল আলোকময় হইয়া যাইত, নৃত্যগীতের উৎসবে ব্রহ্মপুত্র শিকর-কণ-বাহী সমীরণ দশদিকে আনন্দ বিতরণ করিত। আজিও প্রবাদ রহিয়াছে—

"সাজনে টোক, বাজনে এগারসিন্দুর"। সাজ সজ্জায় টোক ও গান 'বাজনায় এগারসিন্দুর এক সময় বিখ্যাত হইয়াছিল।

এগারসিন্দুরে শোণিত প্রবাহও কয়েক বার প্রবাহিত হইয়াছে। ইশা খাঁ ও মানসিংহের যুদ্ধের পর ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গজয়েচ্ছু আসামরাজ ব্রহ্মপুত্র তটবর্ত্তী নগর সকল জয় করিতে অগ্রসর হন। এগারসিন্দুর বাঁকে ইসলাম খাঁর সৈন্যের সহিত তাহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। আসাম রাজ পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় একদল সিপাহীও এগারসিন্দু হইয়া হোসেনপুরের দিকে ও অপর দল বেতালের দিকে চলিয়া যায়। আজিও বীর-মস্থয়া গ্রামের বৃদ্ধেরা 'সিপাহির গোরাট' দেখাইয়া দেয়।

এগারসিন্দুতে এখন আর কি আছে? বহু জন অধ্যুষিত স্থান এখন জনশূন্য। তাহার বিশাল প্রান্তর জুড়িয়া এক নিশ্চল বৈরাগ্য যেন দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর মত নির্ম্মম কালের চরণাহত হইয়া অন্তিম শ্বাসরোধের অপেক্ষায় নিষ্ফল করুণ-নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। রৌদ্র-দীপ্ত মস্‌জিদের শিরজাত শৈবাল, যেন বিষাদের গীতি গাহিয়া আজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে যেন একটা বিকট বিভীষিকা, একটা মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছায়া, শ্মশানের নীরব হাহাকার! এসব দৃশ্য দেখিয়া একটা আর্ত্তনাদ হৃদয়ের প্রতিতন্ত্রী ছিন্ন করিয়াদিয়া ছুটিয়া আইসে। মনে হয়—

যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতে! ক গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনস্থিরং
ন সদিদং জগৎ ইত্যব ধারয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

আগে প্রণয় হইয়া পরে বিবাহই ভাল, না আগে বিবাহ হইয়া শেষে প্রেম সঞ্চারই ভাল? এ সমস্যাটা আমাদের হিন্দুদের ঘরে উঠিবার অবসর নাই। তবে এ প্রসঙ্গের প্রস্তাব কেন? কালধর্ম্মে সকলই ঘটিয়া থাকে; সুতরাং বিলাতী সভ্যতার হাওয়ায় আমাদের হিন্দুর দেশেও আগে প্রণয়, পরে বিবাহের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। সমাজে সেটা এখন পর্য্যন্ত না চলিলেও, সাহিত্যের মধ্যে সে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে অনেক ফেণপুঞ্জের সঞ্চার হইয়াছে।

গল্প ও উপন্যাস প্রধান বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে এই শ্রেণীর গল্পের সংখ্যা খুব বেশী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মাসিক পত্রাদিতে যে সব গল্প আজকাল বাহির হয়, তাহাদের অধিকাংশই এই ছাঁচে ঢালা।

এই সব গল্প ও উপন্যাস পাঠ করিয়া নব্য কিশোর কিশোরীগণের মনে প্রণয়মূলক বিবাহের প্রতি একটা আগ্রহের সঞ্চার হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যে তাহা না হইতেছে তাহাও নহে। এই জন্যই এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা মন্দ নহে বিবেচনায়, এই প্রবন্ধের অনুষ্ঠান করা গেল। একটা উপলক্ষ ও হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল, অমৃত বাজার পত্রিকায় বিলাতী "Tit Bits" নামক পত্রিকা হইতে এই বিষয়ক একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা হয়। উহা পাঠ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আমার মনে হইয়াছিল।

আমার যত দূর মনে হয়, বিলাতী প্রণয়মূলক বিবাহ আমাদের দেশের জল-বায়ুর উপযোগী নহে। চেষ্টা করিলেও উহার চারা বা কলম এদেশে ফলিবে না। তাহার প্রমাণ এই যে, হিন্দু সমাজের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্ম সমাজেও ঠিক ঐরূপ প্রথা বোধ হয় প্রচলিত নাই। অন্ততঃ আমার ঐ সমাজ বিষয়ে যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে ঐরূপ ভাব নাই বলিয়াই জানি। তাঁহারা কতকটা মাঝামাঝি ভাবই অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দেশের মুশলমান সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, তথাপি যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাই, পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন অভিভাবকেরাই করিয়া থাকেন। কন্যার সম্মতির একটা প্রথা আছে বটে কিন্তু সেটা নাম মাত্র।

আমাদের হিন্দু সমাজের ত কথাই নাই, সেখানে অনেক স্থলেই পাত্র পাত্রীর কেহই কাহারও নাম পর্য্যন্তও জানেন না, পরিচয় ত দূরের কথা!

'Tit Bits' এর লেখক ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের বিবাহের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন এবং এতদুভয়ের মধ্যে ফরাসী প্রথাই তিনি ভাল বলিয়াছেন।

তিনি বলেন—ইংলণ্ডে পাত্রপাত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় প্রকট হইবার পরে তাঁহাদের বিবাহ উভয়ের ইচ্ছানুযায়ী নিষ্পন্ন হয়। তথাপি অনেক স্থলেই দেখা যায় বিবাহের অল্প দিন পরেই সেই প্রগাঢ় প্রেমের বন্যায় ভাটা পড়িয়া যায় এবং পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু ফরাসী দেশে অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচিত হইলেও বিবাহের পর দম্পতী প্রায়ই সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইয়া থাকেন। সুতরাং ইংলণ্ডীয় স্বৈর নির্ব্বাচনের মধ্যে প্রায়ই আসলে কোন মূল্য নাই। নবযৌবনকালে প্রকৃত পতি বা পত্নী নির্ব্বাচন ক্ষমতা অতি অল্প যুবক যুবতীরই থাকে। তাঁহারা যেটাকে প্রেম বলিয়া মনে করেন, অধিকাংশ স্থলেই সেটা একটা রূপজ মোহের সাময়িক বিকার মাত্র। তাহার ঘোরে পাত্র পাত্রী উভয়েই উভয়ের প্রতি একান্ত অনুরক্তা হইয়া সেই মোহকেই —সেই লালসাকেই প্রকৃত প্রেমের আসন প্রদান করেন। শেষে যখন বিবাহ হইয়া যায়, তখন লালসারও উপশম হয়, চোখের ঘোর কাটিয়া যায়, অল্প দিন মধ্যেই তাঁহারা দেখিতে পান যে আর চাঁদের সুধায়, ফুলের গন্ধে, কুলায় না; বাস্তব জগতে অনেক অনৈক্যই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে! কল্পনার বিমানসৌধ ভূমিসাৎ হইয়াছে। ফরাসী দেশে অভিভাবকগণ স্বীয় স্বীয় বিবাহ যোগ্য পুত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রী বা পাত্রের অনুসন্ধান স্বয়ংই করেন; সেরূপ স্থলে তাঁহারা ইষ্ট বস্তুর সর্ব্ব প্রকারের গুণের পরিচয়ই গ্রহণ করেন; বংশ, স্বভাব, শিক্ষা, দীক্ষা, চাল, চলন সবই তাঁহারা অনুসন্ধান করেন; যে সব পরিবারকে তাঁহারা হয়ত অনেক কাল হইতেই বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন, সেই সব পরিবারেই আগে তাঁহারা অনুসন্ধান করেন। সেখানে পাওয়া গেলে তো বড়ই আনন্দের কথা। আর নিতান্ত তাহা না হইলে, অন্যত্র ও তাঁহারা সব তথ্য জ্ঞাত হইয়া তাহার পরে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। উভয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেলে, তারপর পাত্র পাত্রীকে দেখাশুনা ও মেলামেসা করিতে দেওয়া হয়। তখন তাঁহারা স্বীয় ২ অভিভাবকগণের সম্মতি অনুসারে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইতে থাকেন।

ফরাসী দেশে কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের সংসার পাতিবার জন্য, কন্যার পিতাকে সাধ্যমত যৌতুক সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। পুত্রের পিতাকেও সেইরূপ করিতে হয়। তাহাদিগকে উদ্বাহ বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া তাহাদের সংসারে প্রবিষ্ট

হইবার মত অর্থ বর ও কন্যা উভয়ের পক্ষ হইতেই দিতে হয়। এইরূপ অর্থ সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ দেওয়া হয় না। সে দেশে যখন বিবাহের পর দম্পতীকে পৃথক সংসার পাতিতে হয়, তখন এইরূপ অবস্থা যে সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অগোমীবারে এ বিষয়ে আর আর বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

মিনতি।

'দিব' বলে এসে, চাই—
শক্তি মোর যত চাহিবার;
যা ও আছে, কেড়ে প্রভু,—
নিঃস্ব করে দিয়ো পুরস্কার!
'বলি শুধু দিয়েছ যা'
তার বেশী দাও নি কি আর?
তোমারি পূজার ছলে
স্বার্থপদে করি নমস্কার!
চাহি না তোমার দান,
লহ মোর যা আছে দিবার,—
রিক্ততায় ধন্য হোক
স্বপ্ন মোর চির-পূর্ণতার!
আমি প্রভাতের ফুল,
ছায়া ঘন সাঁঝের কাননে,
পূর্ণ হ'ব ঝরে গিয়া
সুমধুর আত্মবলিদানে!
সব নিয়ে, হে সুন্দর!
তোমা পরে দিয়ো অধিকার—
ভাল যেন বাসি তোমা,
আর কিছু নাহি চাহিবার!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

চন্দ্রালোক।

দেখিতেছি "সৌরভে" স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের "স্মৃতি," প্রকাশিত হইতেছে। স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহাশয় তদীয় স্মৃতি গ্রন্থের নাম "চন্দ্রালোক" রাখিয়াছিলেন, যথা—"উদ্বাহ-চন্দ্রালোক"। তাঁহার জীবন "স্মৃতিটাকেও" তাই আমি "চন্দ্রালোক" আখ্যা প্রদান করিতেছি। সমগ্র দেশ না হউক, অন্ততঃ সৌরভের কয়েকটি পৃষ্ঠা এই আলোকে উদ্ভাসিত হউক।

আমি কয়েক দিনের জন্য সংস্কৃত কলেজে পড়িতে গিয়াছিলাম; তন্মধ্যে দিন কয়েক তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট বেদান্ত শাস্ত্র—উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সেইবার তিনি সর্ব্ব প্রথম এম্. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ঐ উপনিষদাদি তাঁহার দ্বারা পরীক্ষণীয় বিষয় মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তিনি আমাদিগকে আর ঐ বিষয় পড়াইলেন না, অপর একজন তাঁহার স্থলে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিদ্যার্থিগণের তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের বর্ত্তমান প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী প্রমুখ আমরা সহাধ্যায়িগণ মিলিয়া প্রিন্সিপাল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত দেই যে তর্কালঙ্কার মহাশয় যেরূপ চমৎকার রূপে ব্যাখ্যাদি করেন, তাহাতে জটিল দর্শন শাস্ত্রের তত্ত্ব জলবত্তরল হইয়া যায়—আমরা উহা তাঁহারই নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রার্থী। ন্যায়রত্ন মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুরোধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের হস্তে অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করিতে পারেন নাই, পরন্তু স্বয়ং আমাদিগকে দর্শন পড়াইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পূর্ব্বে বোধ হয় ইংরেজীতে একেবারে অনভিজ্ঞ ও টোলের পণ্ডিত কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক বা প্রশ্নকর্ত্তা নিযুক্ত হন নাই। তখন পুণ্যশ্লোক স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস্ চ্যানসেলার ছিলেন—এই নিয়োগ তাঁহারই অন্যতম কীর্ত্তি। ব্যবস্থা হইল যে প্রশ্নের ভাষা ইংরেজীতে না হইয়া সংস্কৃতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে তদুপলক্ষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয় এত শাস্ত্রে প্রবিষ্ট, ইংরেজী ভাষাটাত ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে আরম্ভ করিতে পারেন!" উত্তরে বলিলেন, "বাপু এখন বৃদ্ধকাল, আর কি নূতন কিছু শিখিবার দিন আছে? বিশেষতঃ—ভাষা। *

---

* শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের ফেলোশিপ উপলক্ষে যে সকল বেদান্ত লেক্‌চার দিয়াছিলেন তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজী দর্শনাদির উল্লেখ আছে; এতদ্বিষয়ে তদীয় চিরবান্ধব শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ই বোধহয় প্রধানতঃ তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন।

ইংরেজীতে যাহাকে বলে Humbuggism, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তাহা একেবারেই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই সামান্য ইংরেজী বাক্য যথা—"Explain," "Write notes on" ইত্যাদি শিখিতে পারিতেন, নাম দস্তখতত সোজা কথা। এম্. এ. বা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-পরীক্ষার সমস্ত পরীক্ষক মিলিয়া যে রিপোর্ট সিণ্ডিকেটে দাখিল করিতে হইত, তাহাতে সমস্ত ইংরেজী স্বাক্ষরগুলির মধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা" এই স্বাক্ষরটি বিরাজ করিত—দেখিলে মনে হইত যেন কোট প্যাণ্ট বা চোগা-চাপ্‌কানধারী ইংরেজী নবিশদের সভায় আমাদের খাঁটি স্বদেশী এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটি চটি পায়ে ও থানের চাদর গায়ে বসিয়া আছেন!

তদীয় অধ্যাপনারীতির বিশেষত্ব এইটুকু ছিল যে তিনি অতিশয় দ্রুত পড়াইয়া যাইতেন। আমরা তাঁহার নিকটে নৈষধ ও কাদম্বরী পড়িতাম—নৈষধের উত্তরার্দ্ধের দীর্ঘচ্ছন্দের ১০। ১৫টী শ্লোক এবং কাদম্বরী পূর্ব্বার্দ্ধের ৪০। ৫০ পংক্তি তিনি ঘণ্টায় পড়াইয়া যাইতেন! আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছিল যে ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় পড়াইয়া গেলেও আবশ্যক কোনও কথা তিনি বাদ দিয়া যাইতেন না—অভিধান ব্যাকরণ বা অলঙ্কার ঘটিত সমস্ত বিষয়ই বলিয়া যাইতেন। গভীর মনোযোগ সহকারে ছাত্রকে তাঁহার ব্যাখ্যাদি শুনিতে হইত, অনাবিষ্ট হইলেই প্রমাদ। বাড়ীতে একবার অধ্যেতব্য বিষয় পড়িয়া আসিলেই সর্ব্ব সন্দেহ নিরসণ হইত। কেহ কেহ এই রীতির অপক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু কলেজের সর্ব্বোচ্চতম শ্রেণীতে ইহাই প্রকৃষ্ট রীতি—বহু পড়িতে হইবে, অথচ ৫০টী লেক্‌চার শুনিলেই পরীক্ষাধিকার জন্মিত; এতদবস্থায় একটা শব্দ বা ভাব নিয়া চিবাইবার অবসর কোথায়? তর্কালঙ্কার মহাশয় মহোপাধ্যায় শব্দ-ভাক্ মল্লিনাথেরই ন্যায় "নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নামপেক্ষিতমুচ্যতে" এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন—বৃথা পল্লবিতে সময় নষ্ট করিতেন না। খ্যাতনামা ইংরেজ অধ্যাপকেরাও অনেকে এইরূপই পড়াইয়া থাকেন। ঢাকা কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল মিঃ এ, সি, এড্‌ওয়ার্ডস্‌এর নিকট আমরা ইংরেজী সাহিত্য এই ভাবেই পড়িয়াছিলাম, তাই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রীতির অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

তিনি অধ্যাপনা বিষয়েই যে কেবল দ্রুতকর্ম্মা ছিলেন তাহা নহে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতোচিত কৃত্যাদির তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুষ্ঠান করিতেন—প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, শিবপূজা, নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ পূজাদি সমস্তই তিনি করিতেন—

অথচ অন্তের যাহা করিতে একঘণ্টা লাগিবে—তাহা তিনি ১৫ মিনিটে সারিতে পারিতেন। বৃথা বিলম্ব তাঁহার কোনও কাজে ছিল না; মন্ত্রাদি অনর্গল আয়ত্ত থাকাতে এবং সমস্ত কার্য্যেই যথাকালীনতা অবলম্বন করাতেই তিনি এইরূপ অনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়াও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে যথোচিত সময় ব্যয় করিতে পারিতেন। কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি বিষয়ী, কি ছাত্র, কি গৃহস্থ —সকলেরই এতদ্বিষয়ে তিনি আদর্শ স্থানীয়। কিন্তু, হায়! এ আদর্শের অনুসরণ আজকাল কে করিবে?

শ্রীপদ্মনাথ দেব শর্ম্মা।

জগতের উপাদান।

আমাদিগের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে সকলেরই কৌতুহল জন্মে। বর্ত্তমানে বিজ্ঞান যতদুর অবগত হইতে পারিয়াছে, তাহার অল্প বিস্তর বর্ণনই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা দেখিতে পাই যে বিজ্ঞানবিৎগণ এমন এক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহার প্রকৃতি সাধারণ জড় হইতে বিভিন্ন। এই পদার্থ অবলম্বন করিয়া জগতে মাধ্যাকর্ষণ সম্ভব হইয়াছে; তাপ, আলোক ও তড়িত-বীচিমালার গতি সম্ভব হইয়াছে; ইহাই শক্তির আধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ঈথার নাম দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, জড় পদার্থ ঈথারের ঘুর্ণিপাক জাত। অর্থাৎ সাধারণ জড় পদার্থ ঈথারের প্রকারান্তর। কিন্তু ইহা এখনও শুধু অনুমান মাত্র। ঈথার সর্ব্বস্থলে বর্ত্তমান। যেখানে কোনরূপ জড় পদার্থ নাই, তাহাতে এবং জড় পদার্থের মধ্যেও ইহা ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই বিশ্ব জগতের মধ্যে ঈথার সমুদ্রে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি জড় পিণ্ড সকল ভাসমান এবং ইহা দ্বারাই এক সূত্রে গ্রথিত। তাহারা একে অন্তের উপর নিজ শক্তি যে চালনা করিতে পারে, আকর্ষণ রূপে বা আলোক ও তাপ বিকীরণ দ্বারা বা উভয় প্রকারেই তাহা ঈথার দ্বারাই সাধিত হইতেছে। এমন কি এই ঈথারই পরমাণুদিগেরও বন্ধনের কারণ হইয়াছে। আমরা আরো দেখিতে পাইতেছি যে বৈজ্ঞানিকগণ অল্প দিন হইল আর একটী পদার্থের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও সাধারণ জড় হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা এই পদার্থের নাম দিয়াছেন—ইলেক্ট্রণ।

এই ইলেক্ট্রণ পদার্থটীর এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে ইহা যতই দ্রুত ধাবিত হইতে থাকে, ততই যেন তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ঈথার যেমন সর্ব্বদেশ ব্যাপক, তাহার মধ্যে যেন কোনরূপ রন্ধ্র নাই, তাহা টুক্‌রা করা যায় না; ইলেক্ট্রণ কিন্তু সেরূপ ব্যাপক নহে। ইহার সাধারণ জড় পদার্থের মত পরমাণু আছে। এই পরমাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া—পরস্পর অযুক্ত অবস্থায় বৈজ্ঞানিকের কাছে ধরা দিয়াছে। যেন ইহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া থাকিতেই চায়। দেখা যায় যে ইহারা পরস্পর আকর্ষণ না করিয়া বিকর্ষণ করে। কিন্তু সাধারণ জড় পরমাণু পরস্পর আকর্ষণ করিয়া থাকে। আবার এই বিকর্ষণ শক্তি জড় আকর্ষণের তুলনায় অতিশয় অধিক। বিজ্ঞানবিৎগণ মনে করেন যে প্রত্যেক জড় পরমাণু মধ্যেই কতকগুলি ইলেক্ট্রণ বর্ত্তমান আছে। আসল জড় পরমাণু ইলেক্ট্রণ পরমাণু অপেক্ষা কোন স্থলে ১০০০, কোন স্থলে বা ২০০,০০০ গুণ অধিক। সাধারণ জড় পরমাণু—আসল জড় পরমাণু ও গুটিকতক ইলেক্ট্রণ পরমাণু দ্বারা গঠিত। যদি দুইটী বস্তু ঘর্ষণ করা যায়, তবে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই জানেন। আরো ইহা জানা আছে যে দুই প্রকার তড়িতের একই সময়ে প্রকাশ হয়। ইহার কারণ এই যে কতকগুলি ইলেক্ট্রণ পরমাণু ঘর্ষণ শক্তি দ্বারা এক প্রকার জড় পরমাণু হইতে অন্য প্রকার জড় পরমাণুতে সহজেই আগমন করে। ইহাতে যে পরমাণুতে একটী বা দুইটী অধিক ইলেক্ট্রণ আসিল, তাহাতে ঋণ (negative) তড়িতের প্রকাশ হইল এবং যাহাতে পরমাণু সমূহের ইলেক্ট্রণ হ্রাস হইল তাহাতে ধন (positive) তড়িতের প্রকাশ হইল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে জড় জগৎ দুই প্রকার পরমাণু দ্বারা গঠিত। একপ্রকার জড় নামে অভিহিত; অন্যপ্রকার ইলেক্ট্রণ নামে বৈজ্ঞানিক জগতে পরিচিত হইয়াছে। ইলেক্ট্রণের বিষয় যতই জানা যাইতেছে, তাহাতে তাহাকে শক্তি কণা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এক্ষণে আমরা জড় পদার্থ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। বর্ত্তমানকালে রসায়ণের উন্নতির সহিত ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এই জগতে গুটি কতক পদার্থ আছে যাহাদিগকে মূল পদার্থ বলিতে পারি। তাহাদের সংখ্যা যে ঠিক কত তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে যে উপায়ে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কতকগুলি মূল পদার্থের অস্তিত্বের বিষয় ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন। সেই উপায় অবলম্বন করিলে বলা যায়, মূল পদার্থ একশতের অধিক না হইবার সম্ভাবনা। আর একটী বিস্ময়কর বিষয় বৈজ্ঞানিকদিগের গোচরীভূত হইতেছে

যে, কতকগুলি মূল পদার্থের পরমাণু ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে অর্থাৎ ধ্বংস পাইতেছে। কালে সেই সকল মূল পদার্থ জগত হইতে লোপ পাইবে। ইহার কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পরমাণু গুলিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরম-পরমাণু দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ যেমন ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু সংযোগে যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হইতেছে, সেইরূপ পরম-পরমাণু দ্বারা পরমাণুরও গঠন হইয়াছে। এই পরম-পরমাণু ও ইলেক্ট্রণদিগের পরস্পর সমাবেশ ও আকর্ষণ দ্বারা পরমাণুর উদ্ভব। যদি ঐ সমাবেশ ও আকর্ষণ এরূপ হয় যে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে, তবেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইবে ও ক্ষুদ্রতর সুশৃঙ্খলিত পরমাণুর সৃষ্টি হইবে। দেখান হইয়াছে যে রেডিয়ম ধাতুর পরমাণু সত্যসত্যই এইরূপ ছত্রভঙ্গ হইয়া হেলিয়ম মূল পদার্থে পরিণত হইতেছে। এই ছত্রভঙ্গ হইবার সময়ে ইলেক্ট্রণের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে।

এই সকল ব্যাপার হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে জড়-জগতের উপাদান প্রথম ঈথার, দ্বিতীয় ইলেক্ট্রণ, তৃতীয় পরম-পরমাণু। অল্প সংখ্যক ইলেক্ট্রণ ও বহুসংখ্যক পরম পরমাণু দ্বারা কোন মূল পদার্থের পরমাণুর উদ্ভব হয়। যে সকল পরমাণুর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে তাহারা ধ্বংস পাইতেছে না। মূল পদার্থের সংখ্যা এত অল্প হইয়াছে যে এই জন্য পরমাণুগুলি কোন এক আয়তনের অপেক্ষা বৃহৎ হইলে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভিন্ন জাতীয় পরমাণু আবার পরস্পর আকর্ষণ করিয়া যৌগিক পদার্থের অণু সৃজন করিয়া নানাপ্রকার গুণ বিশিষ্ট পদার্থের বায়বীয় অবস্থার উদ্ভব করিয়াছে। এই অণু সমূহ পুঞ্জীভূত হইয়া ক্রমশঃ তরল ও কঠিন পদার্থের আকার গ্রহণ করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ কল্পনা করেন যে ইলেক্ট্রণগুলি পরমাণুর চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ডবেগে ভ্রমণ করিতেছে। ইলেক্ট্রণ ও পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণই তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিতেছে না। যে সকল পরমাণু ধ্বংস পাইতেছে, তাহাদের ভিতর কেন্দ্রাভিমুখীণ ও কেন্দ্রাপসারীন গতির মধ্যে সামঞ্জস্য হয় না। কিন্তু দেখা যাইতেছে ইলেক্ট্রণ ও পরম-পরমাণু সমষ্টি পরস্পর বিযুক্ত। অতএব তাহাদের মধ্যে যোগ ও আকর্ষণ বিধানের হেতু নিশ্চয় ঈথার। ঈথারই এই সমগ্র জগতের একতা প্রতিপাদক পদার্থ। ইহার মধ্যে অপর দুই পদার্থের কি যে সম্বন্ধ তাহা এখনও কিছুই স্থির হয় নাই। তবে কেহ কেহ মনে করেন যে ঈথারের মধ্যে ইলেক্ট্রণের দ্রুত বৃত্তাকারে গতিই পরম-পরমাণুর সৃষ্টির কারণ ও তাহাতেই পরমাণুর উৎপত্তি।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতির অভিযান।

(একাঙ্ক নাটিকা)

বৈঠক—কলিকাতা।

আফিমের চৌরাস্তা—৪৯নং বাটী।

উপস্থিত—বাবু রমেশচন্দ্র দাস—ছাতাওয়ালা বিষ্টুপালের এজেণ্ট।

” মোহিনীমোহন ঘোষ—দোয়াত কলম বিক্রেতা।

” বিধুশেখর দত্ত—পটারী কোম্পানীর এজেণ্ট।

” হরকুমার পাল—ঘোষ বোষ কোংর ম্যানেজার।

” শ্যামলাল মিত্র মৎস্য ব্যবসায়ী।

” মধুসূদন বাড়ুযো টেনারী কোংর ডাইরেক্টার।

অধ্যাপক—সুরেন্দ্রনাথ ভড় এম. এ. সাহিত্যিক ও অন্যান্য বন্ধুগণ।

১নং বন্ধু।—ম'শায়, ছেলেবেলা "The wonders of the world" বইতে পড়েছিলুম গাছের মূলটা ঠিক মানুষের মত হয়ে আছে। তা আমাদের বিশ্বামিত্র নারকেল্ গাছে মানুষ ধরা'তে চেষ্টা করেছিলেন। দেখ্ছেন্ না, ঐ হুঁকোর খোলটা —কেমন মাথা, কেমন চোখ; মানুষ হয়ে ছিল আর কি? (পকেট হইতে ম্যাচ বাহির করিয়া, ফস্ করিয়া জ্বালাইয়া, মুখে লাগানো চুষীর মত চুরট ফুস্ করিয়া ধরাইয়া, সভঙ্গী) এমনি করে সেই মানষটাতে প্রাণটা চরাইয়া দিলে আর কোন আপড ঠাকটো না। (মুখ হইতে চুরট নামাইয়া) কিন্তু এখন—

২নং বন্ধু।—তা বই কি? মাটির তলে মানুষ জন্মালে, গাছের আগায় মানুষ ধল্লে, গিন্নিরা সব বেঁচে যেতেন। কেবল বাইব্রোণা, ছেনাটোজন, রাধ্কারিষ্ট, অশোকারিষ্ট, আর ধনেশ পাখীর তেল—ডাক্তার, কবিরাজগুলোর লম্বা চৌড়া বিল হ'তে বাঁচা যেত।

৩নং। পড়েন নি—জর্ম্মাণ পণ্ডিত হ্যের উইড়ম্যান ঠিক্ মানুষ তৈরি করেছেন। ঠিক চলে, ঠিক বলে, চাউনি টাউনি জ্যান্ত মানুষের মত—চমৎকার! এতো কলের পুতুল। প্রাণটা দিতে পাল্লে উইড্ম্যান বিশ্বামিত্রের উপর টেক্কা দিতেন। হরহুণ রুহিতণের কথা বল্ছিনে ম'শায়, পণ্ডিতকে স্বয়ং সৃষ্টি কর্ত্তা বিধাতাপুরুষ বল্লেই হয়।

রমেশ বাবু—মরুকগে তোমার বিধাতা আর বিশ্বামিত্র। আমরা যে ভাই, মরতে বসেছি ছাতার দোকানে দেখছি ঘিয় বাতি জ্বালাতে হবে।

১নং বন্ধু —খুলে বলুন না—বিষয়টা কি ?

রমেশ বাবু।—(পকেট হইতে একখানা ছবি বাহির করিয়া) এই দেখুন না, প্রকৃতি গাছে ছাতা ধরাতে সুরু করেছেন! তেম্নি ডাঁট, তেম্নি বাঁট, বিবিয়ানা, বাবুয়ানা—সব রকমের। বিলাতি কাগজে নামও বেরিয়ে গেছে। ছাতা গাছের বীজ চীন থেকে জাপানে গেছে; এখন জাহাজ বোঝাই হয়ে আমেরিকান বীজ বিক্রেতা স্যুটনের মারফৎ ভারতে এসে পড়্‌লো আর কি ?

Sunshadia elegans.

সুরেন্‌ বাবু।—ওহো, বীজের কথা তুলে ফেল্লেন! ফরাসী ঔপন্যাসিক Dumas তার Black Tulipএ কি আশ্চর্য্য তিনি বীজের কথা বলে গেছেন। নায়ক Cornelius Van Baerleর কি অসাধারণ অধ্যবসায়! কি প্রাণান্ত পরীক্ষা! নায়িকা Rosaর কি অপূর্ব্ব প্রেম! কাল টিউলিপের বীজ আবিষ্কার করে লাখ্‌ টাকা পুরস্কার, সঙ্গে স্ত্রী-রত্ন রোজাকে পত্নীলাভ।

রমেশ বাবু। রেখে দিন আপনার ডুমা আর টুলিপের বীজ! ছাতার বীজ এসে যে আমার অন্ন মারতে বস্‌বে—সে কথার কি ?

সুরেন্‌ বাবু। - ছাতা না থাক্‌লে কি মাথা থাক্‌তো না? সতের শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সভ্য ফরাসীদের ছাতা ছিল না,তাতেও তো সে দেশে ঢের মাথাওয়ালা লোক দেখা গেছে! গাছে ছাতা ধর্‌ছে—:সতো বেশ্‌! গরীবের কড়ি বেঁচে যাবে। তোমাদের অনেকে, বিদেশী জিনিষে মার্কা মেরে স্বদেশী করেছ; প্রকৃতি তা সইবে কেন? অভিমান তো করবেই।

মোহিনী বাবু।—তা ছাতা না হলেও চল্‌তে পারে। আমি ম'শায় একটা দোয়াত কলমের ছোট্ট দোকান করে থাচ্ছি—ঐ কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে, প্রকৃতি দেবী আমার পেছনেও লেগেছেন। এই দেখুন—

(একখানা ছবি তাসের মত সকলের সাম্নে ফেলিয়া দিলেন।)

১নং বন্ধু।—দেখি! দেখি! Inkbottleya Scribens — এ যে দিব্বি দোয়াত! গাছে ফলেছে ছেলে-দের খুব জুত। গাছে চড়্‌বে, ফল খাবে, দোয়াত পাড়্‌বে। শেষে বিদ্যের সরঞ্জাম-গু'লও যে গাছে ধর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে দেখ্‌ছি। এখন যদি—এম এ., বি এ, গুলিও গাছে ফলে, তাহলে কল্‌কাতা ইউনি-ভার্সিটী—ও আ-পদটাকেও তুলে দেওয়া যেতে পারে।

Inkbottleya Scribens

সুরেন্ বাবু। -আপনার যে দোয়াত কলম, সে কি দ্বন্দ্ব সমাস ?

মোহিনী বাবু।—দ্বন্দ্বসমাস—এর মানে কি ?

সুরেন বাবু।—তা জানেন না? একটা ভদ্র লোকের বাড়ীতে একটা বেল গাছ ছিল। একটা বামুন এসে ভদ্রলোককে বল্লে, "ম'শায় কিছু বিল্বপত্র পেতে পারি? ভদ্র লোকটী বল্লেন পূজো কর্‌বেন? নিন্ না।" বামন পাতা নিলে এবং পাকা পাকা কয়েকটা বেলও নিলে। তখন ভদ্র লোকটী

বল্লে "একি ঠাকুর, পাতা নিবেন কথা, তার উপর বেলও নিয়ে যাচ্ছেন? ঠাকুর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"বিল্বপত্র—তা আমি দ্বন্দ্ব সমাস মনে করেছি।"

মোহিনী বাবু।—সমাসে দ্বন্দ্ব না হইলেও প্রকৃতির সঙ্গে এখন যে একটা ঘোর দ্বন্দ্ব বেঁধে গেছে, তাতে আর সন্দেহ কি?

বিধু বাবু।—(মাথায় হাত দিয়া) হায়; হায়! পটারী আর টেকে না—টেকে না। দেশে দিন দিন চা'র কাটুতি বাড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে চাতালের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। হ্যারিসনরোড, মুরগীহাটা, ষ্টাণ্ডরোড, চুনোগলি—বড়রাস্তা ছোটরাস্তা, অলি-গলিতে দোকানের পর দোকান, আমাদের চা'র পেয়ালা খুব কাটুছিল। Cups-and-sauceri fragilis প্রকৃতির মাথা আর মুণ্ডু।

২নং বন্ধু।—এ যে দিব্বি চার পেয়ালা দেখ্‌ছি—এখন প্রকৃতি সুন্দরী গাছে যদি এক স্লাইচ রুটী ও মাখন ধরাতে পাত্তেন, তা'হলে ভারি মজা হতো। পাড়—আর—খাও।

Cups-and-sauceri fragilis

সুরেন্ বাবু।—তা শুনেন্ নি? মেক্সিকো দেশে মাংসের গাছ জন্মেছে। কারি—কোরমা, কাট্‌লেট—মটন চপের আর ভাবনা কি? উইলসেনের হোটেল একদম্ বন্ধ।

৩নং বন্ধু।—এ নিশ্চয়ই নিরামিষ। সব জাতেই খেতে পাবে—অথচ যাত যাবে না।

সুরেন্ বাবু।—আজ বৈঠকটা তোমরা বড় বেমজার করে ফেল্লে। কেবল

অন্ন আর অন্ন প্রাণ আর প্রাণ; আমি ভাই একটা গান গাইবো। ফুলেরা গাইছেন:—(ফরাসী সুরে গান আরম্ভ)।

C'est que-le ciel est notre patrie,
Notre veritable patrie puisque de lui,
Puisqu'a lui retourne notre ame,
Notre ame c'est-a-dire notre parfum. *

বিধু বাবু।—তুমি তো ভারি মজার লোক হে? আমাদের প্রাণ যায়, আর তুমি গান গাচ্ছ!

সুরেন্ বাবু।—কেন! কবিই বলেছেন:—

"জন্মি যেন গান মহাদেশে.　　শ্বাসি যেন গাণের বাতাসে,
বাঁচি যেন গান খেয়ে খেয়ে।"

হরকুমার বাবু।—রেখে দাও তোমার গান টান—তা আবার ফরাসী। আমি ম'শায় সবে সেদিন বিলেতে পঁচিশ হাজারমনি-ব্যাগের অর্ডার দিইছি। এই দেখুন—প্রকৃতি আমার বিরুদ্ধেও অভিযান করেছেন—Pursiflora mammona.

সুরেন্ বাবু।—অভিযান কল্লেনইবা! মানির জন্যইত মানিব্যাগ। টাকা,

Pursiflora mammona.

* স্বর্গ মোদের পিতৃ ভূমি, সৌরভ মোদের প্রাণ।
স্বর্গ হতে সৌরভ আসে, স্বর্গে অন্তে স্থান॥

পয়সা, গিনি—প্রকৃতি যদি গাছে ধরিয়ে দিতে পারেন—Three cheers for our benevolent—Nature! যৌথ কারবার তা আসামেই কর, আর আফ্রিকায়ই কর—খেজালত ঢের। সার সিসিলরোড্‌স্ বহু কষ্টে ঢের টাকা করে গেছেন। এডামস্মিথ এরি উপরে তাঁর "Wealth of Nation" লিখে গেছেন।—Money is sweeter than honey. পয়সার আকারে, টাকার আকারে, গিনির আকারে, গোলাকার পদার্থগুলি আজকাল সার পদার্থ। এ হতেই—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ। Mammona ঐ ইংরেজী নামটা রেখেই সর্ব্বনাশ করেছে। বাইবেলে লিখেছে:—"No man can serve God and mammon at the same time."

২নং বন্ধু।—ভায়ার বিদ্যে এখন পেটেই থাক। পেটে খেলে পিঠে সয়।

সুরেন বাবু।—তার আর ভাবনা কি? প্রকৃতি যখন শুরু করেছেন, এখন ক্রমে রুটি হবে, মাখন হবে, মাংস তো হচ্ছেই; চুলোরও আর দরকার হবে না—মেয়েরা আয়াসে বসে চা রুটী খেতে খেতে দিব্বি নভেল পড়্‌তে পার্‌বেন।

শ্যাম বাবু।—আমি মাছের ব্যবসায়টা ছেড়ে কাছিমের ব্যবসায় ধরে ছিলুম। "কচ্ছপাঃ বাত নাশকাঃ"—দেশে বাত যেরকম বেড়ে যাচ্ছে—বাড়ুয্যের বাত, চাটুয্যের বাত, ঘোষ, মিত্তির—বড় মানুষ হলেই বাত। লাভ হবে বলেই কাছিম ধরে ছিলুম—শেষটা প্রকৃতি তাতেও বাদ সাধলেন—Plumbunnia কি জানি কি—

Plumbunnia nutritiosa.

সুরেন্ বাবু।—ভায়াকে এক সময় কেঁকড়ার ব্যবসায়ও কর্ত্তে দেখেছি। শশি জেলেনীর সাজার পর হ'তে ভায়ার পৃষ্ঠ ভঙ্গ। তারপর মাছ—

এখন কচ্ছপ—এর পর —বরাহ নৃসিংহ বামন স্তথা—মীনরূপ ধৃত শরীরং জয় জগদীশ হরে। বিলাতে—বাথ, চেল্‌সি, বেন্‌বেরি প্রভৃতি স্থানে কাছিমের ঢের ব্যবসা হয়ে থাকে। পকৃতি যদি ওদের ব্যবসায় মাটি করেন, তবে না হয় তোমারও যাবে।

মধুসূদন বাবু।—আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলুম। আমাদের টেনারি কিন্তু আগেই তুলে দিইছি—প্রকৃতির কোন তোয়াক্কা রাখি না। তবু ঃই দেখুন—সাদা, কালো, কটা—জোড়ায় জোড়ায় বুট ধরে আছে। ময় বকৃলস্ Shoe-bootia pedestrianus.

Shoebootia pedestrianus.

সুরেন্ বাবু।—জুতোর কথা ঢের পড়া গেছে। রঞ্জিৎ সিংকে যখন কহিনূরের মূল্য জিজ্ঞেস্ করা গেছিল, তখন রঞ্জিৎ বলেছিলেন—"ইছকা কিস্মৎ পাঁচ জুতি।" জুতো, গুঁতো—ঢের দেখা গেছে। ডিউক অব ওয়েলিংটনের নামেও বিলাতে ঢের জুতো বিক্রি হতো। রবারের জুতোকে—ঠিক রবারের নয়—সেদেশে Galashers বল্‌তো। কাদার দিনে ওর খুব কাট্‌তি। মেয়েদের জন্য উহাকে শ্রীচরণকমলেshoe বলা যেতে পারে।

শ্যাম বাবু।—শ্রীচরণকমলেshoe—দুঃখের মধ্যে হাসালে দেখ্‌ছি।

মধু বাবু।—আমার ভায়া কোন দুঃখু নেই। টেনারি—যৌথ কারবার, তুলে দিয়েছি—আরো তুলে দিয়েছি—সেটা একটা মস্ত পুণ্যি।

"ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতং।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥"

গাভী হচ্ছেন দেবতা,চামারেরা লোভে আর গো হত্যা কর্‌বে না। মহাপুণ্য।

সুরেন্ বাবু।— মধু ভায়া বাস্তবিকই মহাপুণ্যবান্। আমি বলি কি—তাঁকে সভাপতি করে টাউন হলে একটা বিরাট সভা আহ্বান করা হউক এবং একটা ডিপুটেশন ফরম্ করে প্রকৃতি দেবীর কাছে ধন্যবাদ নিয়ে যাওয়া যাক্।

২নং বন্ধু।—বিধু বাবু বল্লেন চামারেরা চাম্‌ড়ার লোভে গরু মার্‌বে না; কাজেই জুতোও আর হবে না। আপনা হতে মর্‌বে যে সব গরু, তাদের চামরা দিয়ে কি হবে।

মধু বাবু —(মথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে তাইতো—তাইতো, তাতো ভাবিনি।

সুরেন্ বাবু —ভাবেন নি? আমি তো বেশ্ ভেবেছি। আমি বল্‌ছি কি - ঐ মরা গরুর চাম্‌রা দিয়ে * * তৈরি করে, যাঁরা পরের টাকায় পোদ্দারি করেন, তাঁদের মাথায় রঞ্জিৎ সিংহের ব্যবস্থা—পাচ পাঁচ * *।

মধু বাবু।—কি? আমায় অপমান?

১নং বন্ধু।—আপনার আবার একটা অপমান কি? গরীব দুঃখীর টাকা খেয়ে পেট মোটা করে বসেছেন—আপনার আবার—অপ, আপনার আবার —মান!

(মধুসূদন বাবু পা হতে জুতো খু'লে বন্ধুদের উপর আপনার উষ্ণ প্রকৃতির পরিচয় দিতে উদ্যত।)

সকলে।—কচ্ছেন কি? কচ্ছেন কি? থামুন! থামুন!

৩নং বন্ধু —বিপত্তে মধুসূদন! বিপত্তে মধুসূদন!

মধু।—অপমানের উপর অপমান! (জুতো ছুঁড়িয়া মারা)।

সকলে।—পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা!

একে আফিমের চৌরাস্তা, তাতে ৪৯নং বাড়ী, কোন পাহারাওয়ালা সাড়া দিল না। তখন সকলে জুতা হস্তে এক সঙ্গে অভিযান করিয়া মধুসূদনের উপর যথেচ্ছা প্রতিশোধ লইল।

(মধুসূদনের পতন ও মূর্চ্ছা। সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান)।

যবনিকা পতন।

বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা। (২)

ঢাকা, ২১শে মার্চ্চ, ১৯০৮।

সোণার কমল,

মা, গত ক'মাসে তোমাকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছি। প্রথম পত্রে লিখিয়াছিলাম, তোমাদের শিক্ষা, সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু লিখিব। এতদিন লিখি নাই। দু'এক খানা পত্রে উহার কারণ ও জানিতে চাহিয়াছ। চুপ করিয়া ছিলাম। আজ সেই বিষয় গুলির একটীর সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাও প্রথমটী নয়, দ্বিতীয়টী—উচ্চ শিক্ষিতা বঙ্গ মহিলা সমাজ।

পুস্তকের শিক্ষা চোখে, দেখার শিক্ষা মনে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া কাজে লাগাইলে পুস্তকের শিক্ষা ও দেখার শিক্ষা সার্থক হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৮৩ সনে একজন মহিলা প্রথম বি, এ, পাস করেন। এপর্য্যন্ত এম, এর সংখ্যা পাঁচ ছয়টী, বি এর সংখ্যা বাইশ, তেইশটী। সমাজের উচ্চশিক্ষা বিস্তৃতি প্রমাণের পক্ষে, এ সংখ্যা কিছুই নহে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি না পাইলেও অনেক মহিলা গৃহে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা রাজধানী; তথায় বহু শিক্ষিতা মহিলা বাস করেন। ভরসা করি, এরূপ অনেক মহিলার সঙ্গে এতদিনে তোমার পরিচয় হইয়াছে, অনেক মহিলা তোমার আত্মীয়া এবং তুমি অনেক পরিবার দেখিবার অবসর পাইয়াছ। এই সকল মহিলা ও পরিবার দেখিয়া অবশ্যই তোমার মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে। এই অবস্থায় আমার কথাগুলি বিচার করিবার, সুবিধা হইবে। এবং এই বিচারের ফল জীবণে সফল হইবার সম্ভাবনা অধিক।

বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করিয়া দিতে না পারিলেও অনেক সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তোমাদের দেখিবার, শিখিবার, বুঝিবার এবং ভাবিবার পথ সুগম হইয়াছে। সকল দেশের জ্ঞানের খনি তোমাদের সম্মুখে। খনি থাকিলেই তাহা হইতে মণি সংগ্রহ করিবার মতন শক্তি জন্মে না। তোমাদের বাড়ীতে দশসের দুধ দেয় এরূপ একটী গাই থাকিলেই বুঝিতে হইবে না যে, তোমাদের বাড়ীর সকলেরই অপর্য্যাপ্ত দুধ মাখন ঘি জীর্ণ করিবার সামর্থ্য আছে। শিক্ষাই বল আর আহারই বল, যিনি যত আত্মস্থ করিতে পারিবেন, তিনি তত সুস্থ ও সুখী।

(১) যদি দেখিয়া থাক দুহিতা গর্ব্বিতা এবং বিলাশ ব্যসন নিরতা নহেন; বধূ শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন এবং এইরূপ দুহিতা ও বধূর সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ, বঙ্গমহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

(২) যদি দেখিয়া থাক—বিদ্যার সঙ্গে সখ্য হেতু হাতা বেড়ির সঙ্গে শত্রুতা ঘটিয়াছে, উনুনের নিকটে যাইতে অণুরাগের উপসর্গটী খসিয়া পড়িতেছে, এবং এই শ্রেণীর মেয়ের সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ, উচ্চ শিক্ষা বঙ্গ মহিলা সমাজে সার্থক হয় নাই।

(৩) যদি দেখিয়া থাক—গৃহে দুস্থঃ আত্মীয় স্বজনের স্থান আছে, গৃহিনী আত্মসুখে নিরতা নহেন এবং এইরূপ মহিলার সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

(৪) যদি দেখিয়া থাক—অর্থের গতি ব্যাঙ্কের দিকে ও গহনার দিকে অধিক, গৃহ কর্ত্রীর হীরক-খচিত কঙ্কণ-শোভিত হস্ত দীন দরিদ্রের জন্য মুক্ত নহে, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ, বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হয় নাই। "দানেনপাণির্ণতুকঙ্কণেন।"

(৫) যদি দেখিয়া থাক—অতিথি গৃহে সমাগত হইলে, গৃহ কর্ত্রীর অস্বস্তি উপস্থিত হয় নাই. তাহার হস্ত অতিথির সেবার জন্য ব্যস্ত, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ. বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

(৬) যদি দেখিয়া থাক—শিশু সন্তান মাতৃ স্তন্য পানের জন্য আকুল হইয়াছিল, জননী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া "স্ত্রী জাতির কর্ত্তব্য অবধারণ" বক্তৃতা সভায় উপস্থিত হইয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছেন এবং এইরূপ জননীর সংখ্যাই অধিক, তবে অবশ্যই বুঝিয়াছ, উচ্চ শিক্ষা বঙ্গমহিলা সমাজে সার্থক হয় নাই।

(৭) তোমাকে বাইবেলের আখ্যায়িকা গুলি অতি যত্নে পড়াইয়াছিলাম। যদি দেখিয়া থাক—মহিলা সমাজে 'হিরোদিয়ার' স্থান নাই, তাঁহারা অক্রোধ এবং ক্ষমা গুণে প্রাতস্মরণীয়া দ্রৌপদীর অনুরূপা, তবে বুঝিয়াছ—বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

(৮) যদি লক্ষ্য করিয়া থাক—পার্শ্ববর্ত্তী কোন পরমাত্মীয়ের গৃহে রোগের আক্রমণ দেখিয়া সংক্রমণ অছিলায় মহিলাগণ সুদূরে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, উচ্চ শিক্ষা বঙ্গ মহিলা সমাজে ব্যর্থ হইয়াছে।

(৯) যদি দেখিয়া থাক—আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহারে অহমিকা ও অবিনয় দীপ্যমান হইয়া উঠে নাই, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ—বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

(১০) যদি দেখিয়া থাক—ধর্ম্মনিষ্ঠা পোষাকী বসন ভূষণের ন্যায় বাক্স ডেস্কে কিম্বা আলমারিতে আবদ্ধ থাকে, সময় ও সুযোগ অনুসারে মহিলাগণ তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৈনিক জীবনে উহা দীপ্তি পায় না, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ - বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

(১১) যদি দেখিয়া থাক ইয়ুরোপীয় মহিলাদের আদর্শ অণুকরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সীতা ও সাবিত্রী, গার্গী ও মৈত্রেয়ী, বিহুলা ও চূড়ালার চরণধূলি পাইবার জন্য অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, তবে অবশ্যই বুঝিয়াছ—বঙ্গমহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

(১২) যদি দেখিয়া থাক কোন মহিলার সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্য রক্ষার উপযুক্ত সম্বল নাই, অথচ তিনি বস্ত্র এবং অলঙ্কারের জন্য নিত্য মহা অনর্থ ঘটাইয়া থাকেন এবং এইরূপ মহিলার সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিয়াছ—বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের আদর্শে উচ্চ শিক্ষা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে পুরুষ এবং রমণী সমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এখন এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ড নহে; সমন্বয় হইতে পারে কিন্তু ভারতের নর নারীর প্রকৃতি ইংরেজ জাতির সম্যক অনুরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। রোম মিশর জয় করিয়াছিলেন, মিশর রোম হয় নাই। নর্ম্মান জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল, ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ নর্ম্মান হয় নাই। ইসলাম প্রায় সমগ্র ইয়ুরোপ গ্রাস করিয়াছিল, ইয়ুরোপ ইছলাম হয় নাই। ইংরেজ ভারত জয় করিয়াছেন—ভারত ইংলণ্ড হইবে না। ভারতের মানচিত্র বিপর্য্যস্থ করিয়া ধরিলে ইংলণ্ডের মানচিত্রের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে কিন্তু ভৌগোলিক বিপর্য্যয় অসম্ভব। এইরূপ অসম্ভব যত্ন করিলে তাহা কখনও সফল হইবে না, তাহাতে কখনও সুফল ফলিবে না।

এই অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষায় তোমার অধিকার বস্তুতই অতি প্রশংসনীয় "উত্তর চরিতে" সীতা চরিত্র বুঝাইতে "ইয়ংগেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্ণয়নয়ো" এবং "ম্লানস্যজীব কুসুমস্য বিকাশনানি" ইত্যাদি ব্যাখ্যায় মহিলাদের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহা তুমি ভুলিয়া যাও নাই।

সোণার কমল, তুমি সোণার তুল্য উজ্জ্বল, সহনশীল ও রমণীয় হও; কমলের তুল্য সুন্দর, সুরভি ও কমনীয় হও। মা, যে দিন তোমাকে সর্ব্বগুণে ভগবচ্চরণে নিবেদনের যোগ্যা দেখিব, সে দিন আমার চক্ষু সার্থক হইবে।

তোমার

চির স্নেহানুগত কাকা।

— —

অপ্রস্তুত।

সেবার খ্রীষ্টমাস্ অবকাশটা আমি আমার একটী আত্মীয় পরিবারের সহিত কাটাইব স্থির করিয়াছিলাম।

ইহার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে চিকাগো প্রত্যাগত একটী বন্ধুর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে আমেরিকাবাসীদের সময়ের মূল্য জ্ঞান ও তাহার সূক্ষ্ম ব্যবহার বিষয়ক কতকগুলি কৌতূহলজনক প্রথার মধ্যে একটীর প্রতি আমার মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বন্ধু বলিয়াছিলেন—যদি চিকাগো ট্রামে কোনও ভদ্রলোককে তুমি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমার সম্মুখে "I am deaf and dumb" লেখা একখানি কার্ড ধরিয়া—তোমার সহিত অনর্থক আলাপে সময় নষ্ট করিবার হাত এড়াইবেন।

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশে, বাজে বকিবার প্রবৃত্তির বাহুল্য অত্যন্ত অধিক। ট্রেনে বা ষ্টীমারে যাতায়াত কালে চুপটী করিয়া বসিয়া থাকা, কোনও খবরের কাগজ দেখা, কিম্বা জলে স্থলে প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্য উপভোগ করা, দেশেরও নিজের কথা ভাবা—আমাদিগের স্বভাব বিরুদ্ধ। বন্ধুর মুখে গল্পটী শুনিয়া ভাবিলাম—আমেরিকার এ সুন্দর প্রথাটী আমাদের দেশে প্রচলন করা যায় নাকি? এরূপ হইলে, দেশের জন সাধারণের একটী বিশেষ উপকার সাধন করা হয়। মনে মনে স্থির করিলাম—এবার ইহার পরীক্ষা করা যাউক।

কয়েক দিন পরেই মুঙ্গেরের টীকেট করিয়া সেকেণ্ড ক্লাসের একটী কামড়ায় চাপিলাম।

মুখে মুখে অনেকেই গ্ল্যাড্ষ্টোনের উদারমতের সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যকালে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তৃতীয় শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভদ্রলোকের বিশেষ অভাবই দেখা গিয়া থাকে। যাই হউক, আমার কামরায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি

কেহ ছিলেন না। ট্রেন ছাড়িয়া দিবে, ঠিক এমন সময় একটী মহিলা গার্ডের সাহায্যে সেই কামরায় আসিয়া উঠিলেন।

আমার সহযাত্রীর বয়স অনুমাণ ২৫ বৎসর সৌখীন পোষাক পরিচ্ছদে ভদ্র মহিলা বলিয়াই মনে হইল। রৌদ্রতাপে এবং ট্রেন মিস্ করিবার ব্যস্ততায় তাঁহার গণ্ডস্থল অধিকতর গোলাপী আভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মুখে বিরক্তির ভাব ফুটীয়া বাহির হইতেছিল। নিঃসঙ্গ মহিলাটীকে আমার সহযাত্রী পাইয়া, আমি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। আমার কি এক স্বভাব, অপরিচিতা কোনও মহিলার সহিত একা পড়িলে, আমি নিজকে বড়ই বিপন্ন মনে করি। উপায় নাই দেখিয়া আমি সংবাদ পত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। স্ত্রীলোকটী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মাপ কর্‌বেন মশায়, কটা বেজেছে বলতে পারেন কি?—নিশ্চয় আমার গাড়োয়ান স্নুকিয়া ষ্ট্রীট হ'তে এখানে আন্‌তে পূরোপূরি ১টী ঘণ্টা নিয়েছে। বেটাদের যদি একটু সময়ের মূল্যজ্ঞান থাকতো—"

আমি মহিলাটীর সম্মুখে আমার সেই চিকাগোর বন্ধু প্রদত্ত Deaf and Dumb লেখা কার্ড খানা ধরিলাম। মহিলাটী কার্ড খানা পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—ও, তাই! So sorry!" অতঃপর তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনে বড়ই অশান্তিভোগ করিতে লাগিলাম। পরবর্ত্তী জংসনে আর একটী প্যাছেঞ্জার আমাদের কামরায় আসিয়া উঠিলেন। ইনিও স্ত্রীলোক—যুবতী। ভাবেবু ঝিলাম, আমার প্রথমা সহযাত্রীর কোন আত্মীয়া; কেননা এ ষ্টেসনে গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই রমণী গবাক্ষ পথে মুখ বাহির করিয়া ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যুবতী দেখিতে অতি সুন্দরী তাহার পরিহিত স্বর্ণসূত্র গ্রথিত ফেরোজা রংঙ্গের সাড়ী খানা তাহার ঢল ঢলে গৌর কান্তির উপর সুন্দর মানাইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া সে প্রথমতঃ একটু সঙ্কোচ চিত্তে রমণীর প্রশ্নের উত্তরগুলি যথাসম্ভব মৃদুস্বরে দিতে ছিল। তাহার এইরূপ সলজ্জ ভাব দেখিয়া বর্ষিয়সী রমণী উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ও লোকটা বদ্ধ কালা, আবার তেমনই বোবা—ও আমাদের কথা এক বর্ণও শুন্‌ছে না। আমরা এখানে নিঃশঙ্কোচে যেরূপ খুসী, গল্প গুজব কোত্তে পারি।"

যুবতী আমার প্রতি এবার নূতন দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর, তাহারা দুইজনে তাহাদের পারিবারিক নানা বিষয়ের আলাপ জুড়িয়া দিলেন।

রমণীদ্বয় ইহারই মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে এমন অনেক বিষয় আলোচনা করিয়া ফেলিলেন, যাহা কখনও কোন অপরিচিত ব্যক্তির শুনিবার পক্ষে নিতান্ত আপত্তি

জনক। বিষয়টী শেষ ঠিক এইরূপ দাঁড়াইবে এবং আমি ঠিক এইরূপ বিপদে পড়িব তা পূর্ব্বে কখনো ভাবিতে পারি নাই। মিথ্যার আবরণে নিজের অস্তিত্ব ঢাকা দিয়া, এই অজ্ঞাত রমণীদিগের গোপনীয় কথা শুনিয়া, আমি মনে মনে বড়ই অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি ইহাদের পারিবারিক সমস্ত কথা শুনিতে পাইতেছি, অথচ ইহারা জানেন—আমি Dumb and deaf (মূক ও বধির)। কি লজ্জা! কি প্রবঞ্চনা!! যদি কখনও কোন কারণে আমি ইহাদের নিকট পরিচিত হই—হায়, হায়, তবে ইহারা আমাকে কি মনে করিবেন? জঘন্য প্রতারক বলিয়া কি ঘৃণা করিবেন না?

আমি হৃদয়ে বল সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়া, একান্ত মনে সংবাদ পত্রে মনোনিবেশ করিলাম।

কিন্তু একি কখনও সম্ভব! আমি যতই আমার মনকে বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, মন ততই অসংযত ভাবে অবাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় রমণীর বাক্যগুলি আমার কর্ণে যাইয়া গুরুতর আঘাত করিতে লাগিল, আমি কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম।

রমণী বলিতেছেন—"লোকটা নাকি ভারি বেরসিক, কারো সঙ্গে মিস্‌তে চায় না—কেবল সমাজ সংস্কার—ধর্ম্ম প্রচার-স্ত্রীজাতির উন্নতি। কোন কাজ ছিল —এমন আপদ ডেকে জোটাবার?

যুবতি বলিল—"আচ্ছা মামী মা। তোমাদের সেই অতিথিটীকে না দেখেই কি করে বুঝ্‌লে তিনি কেমন লোক? এখনোতো তার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি—

রমণী বাধাদিয়া বলিল—"পুস্তকগুলি বুঝি ওঁর তুমি পড়নি? পল্লেই বুঝ্‌বে—লোকটা নেহাৎ একটা সমাজ ছাড়া জীব। মেয়ে মানুষের স্বাধীনতা টা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের মেয়েদের চলা ফেরার ভেতর কত রকম দোষ হতে পারে, লোকটা বসে বসে তাই বের করে অনর্থক মাথা ঘামিয়েছে।"

যুবতী—রমেশ বাবুর বয়স কত?

রমণী—আমি তা জানব কেমন করে? তবে লোকটার বিয়ে হয় নি—কেই বা অমন আস্ত পাগলকে গছ্‌বে?

যুবতী—বেশ, স্বাধীন মততো ওঁর। ওঁর শিক্ষিতা মেয়েদের বিষয় যে মতের

কথা বলচো, তাতে বুঝ্‌তে পাচ্চি—উনি মেয়েদের বেশ স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাদের শক্তিতে তাঁর বিশ্বাস আছে; তাই তিনি দেশের নারী শক্তিকে বিপথ থেকে সরিযে আন্‌তে চাচ্ছেন। মুঙ্গেরে গিয়ে আমি ওঁর বই গুলো পড়বো এখন।

রমণী—তোমাকে কিন্তু আমি এরি জন্য মুঙ্গেরে আসতে লিখিনি। ওঁর বন্ধু যদ্দিন বাড়ী থাক্‌বে, একটু আমোদ আহ্লাদ হওয়ার জো নেই। কয়েকটা দিন বড় অসুখে কাট্‌বে তোমার। ভেবেছিলুম—তুমি আছ, সুকুমারী আস্‌ছে, একদিন বরদা বাবুর বাড়ীর মেয়েদের আনিয়ে একটু আমোদ কোরবো। বরদা বাবুর দুইটী মেয়ে বেশ গাইতে পারে—তারা গান গাইবে। তা সে ভাব্‌না কিছুদিনের জন্য ছাড়্‌তে হচ্ছে। কে জানতো এমনটী হবে, এমন আপদ এসে জুটবে। তোমার মামার জ্বালায় আমি মর্‌লে বাঁচি।

পরবর্ত্তী ষ্টেসনে গাড়ী থামিলেই আমি নামিয়া একটী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে স্থান করিয়া লইয়া হাঁফ ছাড়িলাম। তখন আমার আর এক চিন্তা হইল। মুঙ্গেরে পরেশের সঙ্গে যদি ষ্টেসনে দেখা হইয়া পড়ে, তবে বিপদ; পরেশ এমন লোকই নয় যে কোনও ওজর আপত্তি শুনিবে।

বাকী পথটা এই চিন্তায় আমি ক্লিষ্ট হইতে লাগিলাম। নিরুপায়—মালগুলি মুঙ্গেরে লগেজ করা হইয়াছে। কিন্তু মুঙ্গেরে আমার থাকা হইবেই না।

গাড়ী মুঙ্গের আসিয়া পহুছিল। প্লেটফর্‌মে পরেশকে দেখিয়াই আমি গাড়ীর এককোণে সরিয়া বসিলাম—পরেশ আমাকে দেখিতে পাইল না। সে পশ্চাৎ ফিরিবা মাত্র আমি যাইয়া বুকিং আফিসে ঢুকিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম পরেশ না যাওয়া পর্য্যন্ত বুকিং আফিসেই লুকাইয়া থাকিব। তার পর ডাউন ট্রেনে কলিকাতা ফিরিয়া যাইব।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর পরেশের ফিরিয়া যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া প্লেট ফর্‌মে আসিলাম। আমি যেই প্লেটফর্‌মে আসিয়াছি, অমনি দেখি কোথা হইতে পরেশ আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল।

"বাঃ এই যে তুমি—বেশ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান্‌। ডাউন ট্রেনে সুকুমারী আসবার কথা—তারই প্রতীক্ষায় আছি। তা না হ'লে কি ব্যাপারটা দাঁড়াতো বল দেখি?"

আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম—কল্‌কাতা থেকে একখানা টেলি পেয়েছি—গুরুতর কাজ—আমায় আসছে ডাউ:নই ফিরতে হবে। ভয়ানক বিপদ—আমিও টেলি করেছি—এই ট্রেনেই ফিরে যাচ্ছি।

"কারো অসুখ করেছে কি ? কি হয়েছে- দেখি—" অতি ত্রস্ত ভাবে পরেশ টেলিগ্রাফ খানার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল।

আমি পকেটে হাত দিয়া টেলিগ্রাফ খানা খুজিবার ভান করিয়া উত্তর করিলাম —"সে কি—সে খানা আবার কোথায় পড়ে গেল।—কাকা টেলি করেছেন। তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছেন। হটাৎ এরূপ বিপদ হবে তা ভাবিনি—ওঃ।"

"সেকি ? তিনি হটাৎ মারা গেলেন, আবার তিনিই টেলি করেছেন, কি বল্‌ছ। চল যাই আফিসে নকল ফরম্ খানা দেখিগে।" বলিয়া পরেশ আমায় টানিয়া টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল।

আমি বলিলাম -"থাক, আমার মনটা ভাল নয়, আমার বড় বিপদ, আমায় ক্ষমা কর পরেশ। আমি কল্‌কাতায় পৌছে তোমায় সব কথা লিখে জানাব। আমার মন বড়ই খারাপ, এখন তোমায় আমি সব কথা বলতে পচ্ছিনে। আমার জীবনে আমাকে এরূপ অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হ'য়েছে।"

"চল যাই বাসায়—সেখানে যেয়ে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। কাকা মরেচেন, তারপর টেলি করেচেন—কি বলে পাগোল!"

আমি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, এই সময় আমার সহযাত্রী সেই যুবতী মহিলাটীর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। সে আমার সকল কথা শুনিয়াছিল— সুতরাং আমার অসুখের বিষয়টা তাহার বুঝিতে বোধ হয় অনুমাত্রও বিলম্ব হইল না।

যুবতী মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল—"মামা ইনিই কি রমেশ বাবু ?"

সে মৃদু হাস্য যেন আমাকে কঠোর ধিক্কারে আরও অপ্রস্তুত করিয়া তুলিল। তখন মনে হইল—সেই মুহূর্ত্তে যদি পৃথিবী দ্বিধা হইয়া যাইত, আমি তাহাতে আমায় এই নির্লজ্জ মুখ লুকাইয়া শান্তি লাভ করিতাম।

পতঙ্গ ও দীপশিখা।

পতঙ্গ কহিছে ক্ষোভে, অয়ি দীপ-শিখা,
ভাল বেসে পু'ড়ে মরি এই ছিল লিখা!
দীপ কহে—পু'ড়ে সুধু রাখি নিজ প্রাণ;
নতুবা আমারে দিতে করিয়া নির্ব্বাণ।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

"তবে আমার কাছে এসো, অমন দূরে দূরে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থেকো না —আমার হাতে হাত রেখে আমার পাশে এসে দাঁড়াও।"

Asutosh Press, Dacca.

সৌরভ

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, ফাল্গুন ১৩১৯ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

কপিল ও সাংখ্যদর্শন।

মহর্ষি কপিল ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণের বহুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী সত্য যুগের লোক। তিনি মহাযোগী এবং তপঃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তপঃপ্রভাবে সগর-বংশ ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার তপঃশক্তি সর্ব্বত্র প্রচারিত। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণে কপিল ঈশ্বরের পরম ভক্ত বলিয়া বর্ণিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কপিলের নাম এবং কপিলের জ্ঞান গৌরব পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে।* এমন কি, আর্য্যশাস্ত্রে কপিলদেব ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত।

এদিকে বুদ্ধদেবও ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত। বুদ্ধ সংসার ত্যাগী পরমযোগী ও তপঃসিদ্ধ পুরুষ। তিনি তপোবলে কামজয়, সর্ব্বজ্ঞতালাভ ও নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। † কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত মহাপুরুষ দুইটীর একজনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাঁহারা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কথিত, তাঁহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বেই অবিশ্বাস—এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। কপিল বেদ মানেন, আত্মা মানেন, জন্মান্তর মানেন, পাপপুণ্য মানেন, সাধন মানেন, মুক্তি মানেন, বন্ধন মানেন, ইহার কিছুতেই অবিশ্বাস করেন না; তিনি মানেন না কেবল—ঈশ্বর।

*ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি—ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

† কামকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধের এক নাম মারজিৎ। সর্ব্বজ্ঞতালাভ করাতে বুদ্ধের অপর এক নাম সর্ব্বজ্ঞ।

কপিলের ন্যায় বুদ্ধদেবও পাপ-পুণ্য, মুক্তি-বন্ধন প্রভৃতি সমস্তই স্বীকার করিয়া থাকেন, কেবল ঈশ্বর মানিতেই তাঁহার আপত্তি। কপিল ও বুদ্ধ দেবের মতে আমরা এইমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই যে, কপিল সমস্ত বেদকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া থাকেন আর বুদ্ধদেব বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে একেবারেই বিশ্বাস করেন না। তিনি বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির ঘোরতর বিরোধী, পশু হিংসা দ্বারা যজ্ঞাদি সম্পাদন বৌদ্ধমতে ঘোরতর পাপজনক। অহিংসা বুদ্ধের পরম ধর্ম্ম, কারুণ্য বিস্তার তাঁহার অবতারের কারণ।

• বুদ্ধদেব এ প্রবন্ধের সমালোচ্য নহেন, ভগবান্ কপিল কিরূপ নিরীশ্বর বাদী ছিলেন, তাহাই আমরা সাংখ্যদর্শন হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ রসাদির সংযোগ জন্য জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। কপিল-মতে সাংখ্যদর্শনে প্রত্যক্ষের লক্ষণে এই কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি হইল যে—ঈশ্বরের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নাই, অথচ সমস্তই তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিছুই তাঁহার অগোচর নাই, সুতরাং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের বেলায় এই লক্ষণ খাটে না। কপিলদেব সাংখ্যদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের ৯২ সূত্রে এইকথার উত্তরে বলিলেন—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।

যখন ঈশ্বরই অসিদ্ধ, তখন তাহাতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ থাকিবে কিরূপে। ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু এই সূত্রে আভাস দিয়াছেন যে, এ স্থলে ঈশ্বরের অপলাপ করা কপিলের উদ্দেশ্য নহে, বাদীকে নিরুত্তর করাই কপিলের উদ্দেশ্য। যদি ঈশ্বর নিষেধ করাই উদ্দেশ্য হইত, তবে তিনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্র না করিয়া "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র করিতেন।

ভাষ্যকার যাহাই কেন বলুন না, আমরা দেখিতেছি—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" আর "ঈশ্বরাভাবাৎ" একই কথা বটে। বিশেষতঃ কেবল এই সূত্রে নহে, তিনি আরও অনেক সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্নতৎ সিদ্ধিঃ।" কপিল বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঈশ্বর মুক্তস্বভাব, কি বদ্ধস্বভাব? মুক্ত বলিলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না; যিনি মুক্ত তাহাতে ইচ্ছা, যত্ন, অনুরাগ দ্বেষাদি কিছুই থাকিতে পারে না; যাহার অনুরাগ নাই, ইচ্ছা নাই, তিনি কখনও সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না।‡ যাহার অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, প্রয়োজন নাই, তিনি কেন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? আর যদি বল ঈশ্বর বদ্ধস্বভাব, তবে তিনি মনুষ্যের ন্যায় মায়ামুগ্ধ; তিনি কিছুতেই সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ হইতে পারেন না।

আমরা ভাল মন্দ যত কার্য্য করি, ঈশ্বর আমাদিগকে তাহার ফল বিভাগ করিয়া দেন। রাজা যেরূপ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনে রাজ্যরক্ষা করেন, সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের কুকার্য্যের কুফল ও সৎকার্য্যের শুভফল দানে জগৎ রক্ষা করিয়া থাকেন। কপিল বলেন—ইহাও কোন কাজের কথা নহে। যেহেতুক, কার্য্য-ফল লাভের জন্য ঈশ্বরের আবশ্যক হয় না, ফলের প্রতি কর্ম্মই একমাত্র কারণ। * যিনি যেরূপ কাজ করিবেন তিনি সেইরূপ ফল পাইবেন ইহা কর্ম্মের শক্তি, ভাল কাজ কর—ভাল ফল পাইবে, মন্দ কাজ কর—মন্দ ফল পাইবে, ইহাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথায়?

আস্তিকগণ বলেন ঈশ্বরে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নাই, † সুতরাং ঈশ্বর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, কিন্তু অনুমান প্রমাণ দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। কার্য্যদর্শনে কারণের অনুমান হয়। যেরূপ কুম্ভদর্শনে তাহার জনক একজন কুম্ভকার আছে বলিয়া অনুমান হয়, সেইরূপ জগৎ দর্শনে জগৎ কর্ত্তা ঈশ্বরের অনুমান হইয়া থাকে।

কপিল বলেন—একথা অতি অকিঞ্চিৎকর; অনুমান প্রত্যক্ষ-মূলক। যেখানে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হয় নাই, সেখানে অনুমান সিদ্ধি হয় না। ধূম দেখিলে যে তাহার মূলে বহ্নির প্রতীতি হয়, তাহার কারণ এই, আমরা যেখানেই যখন ধূম দেখিয়াছি, সেইখানেই তাহার মূলে বহ্নি দেখিয়াছি। এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমাদের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে ধূম থাকিলে তাহার মূলে নিশ্চয় বহ্নি থাকিবে। আমরা কখনও যদি ধূম ও বহ্নির একত্র সমাবেশ না দেখিতাম তবে কেবল ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতে পারিতাম না।

এইরূপ ঘট পট প্রভৃতির কার্য্য করিতে আমরা সর্ব্বদা মানুষকে দেখিয়াছি, দেখিতে দেখিতে সংস্কার জন্মিয়াছে যে, এইরূপ কার্য্যগুলির এক এক জন মানুষ কর্ত্তা আছে, সুতরাং আজ একটা নূতন ঘটের কর্ত্তাকে না দেখিলেও, পূর্ব্ব সংস্কারে অনুমান করিতে পারি যে, এ ঘটেরও এইরূপ একজন কর্ত্তা আছে; যদি কখনও কাহাকে ঘট প্রস্তুত করিতে না দেখিতাম, তবে প্রথমেই ঘট দেখিয়া তাহার জনকের অনুভূতি হইত না।

‡ নরাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়ত কারণত্বাৎ; সাংখ্যসূত্রং।

* নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণাতৎসিদ্ধেঃ। সাংখ্যসূত্রং।

† অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয় মিত্যাদিশ্রুতিঃ।

যেরূপ কুম্ভকারকে ঘট প্রস্তুত করিতে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সেইরূপ মাটী জল বায়ু প্রস্তুত করিতে কখনও কাহাকে দেখি নাই, সুতরাং উহার যে একজন কর্ত্তা আছে তাহা অনুমানে লাভ হয় না। এই কথাই কপিল সাংখ্য সূত্রে বলিলেন—"সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং"।

মাটীজল প্রভৃতির সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ নাই, ইহারা যে জন্য পদার্থ তাহার কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং ঈশ্বর যে ইহার জনক তাহাও অনুমানে অনুভব হয় না। তাই কপিল আবার বলিলেন 'প্রমাণাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ' প্রমাণ নাই বলিয়াই ঈশ্বরাস্তিত্বের সিদ্ধি হয় না।

বেদও ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ নহে, বেদ প্রকৃতিকেই জগৎকর্ত্রী বলিয়াছেন।‡ এই তো কপিলের নাস্তিকতার নমুনা, কিন্তু এই নমুনাদৃষ্টে মহর্ষি কপিলকে নিরীশ্বরবাদী মনে করা আমরা যুক্তিযুক্ত বোধ করি না। কারণ বর্ত্তমানে সাংখ্যশাস্ত্রের যতগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার একখানিও কপিলের প্রণীত নহে। সাংখ্যশাস্ত্র মধ্যে আজকাল দুইখানি প্রধান গ্রন্থ দৃষ্ট হয়; তাহার প্রথম গ্রন্থ "সাংখ্যকারিকা", দ্বিতীয় খানি "সাংখ্যসূত্র বা সাংখ্যপ্রবচন"।

"সাংখ্যকারিকা" ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রণীত। ঈশ্বরকৃষ্ণ গ্রন্থের প্রথমে বলিয়াছেন, মহর্ষি কপিল এই সাংখ্যশাস্ত্র আসুরিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আসুরি পঞ্চশিখকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, পঞ্চশিখ সেইমত নিয়া নিজে অনেগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে ঈশ্বরকৃষ্ণ শিষ্য পরম্পরাগত সেইমতের সংক্ষেপে সংস্কার করিয়াছিলেন। ইহারই নাম "সাংখ্যকারিকা"।

শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌরপাদস্বামী এই সাংখ্যকারিকার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ষড়্‌দর্শনের টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র এই সাংখ্যকারিকার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাদের সময় "সাংখ্য প্রবচন" ছিলনা, এই সাংখ্য কারিকাই "সাংখ্যদর্শন" বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। অন্যান্য দর্শনের ভাষ্যাদিতে এবং চরক সুশ্রুতের টীকায় এই সাংখ্যকারিকার বচনই সাংখ্য দর্শনরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। সাংখ্য প্রবচনের কোন সূত্রই কেহ প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে তৎকালে সাংখ্যকারিকাই সাংখ্যদর্শন নামে প্রচলিত ছিল, সাংখ্যপ্রবচন নামে কোন গ্রন্থ ছিলনা।

‡অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং ইত্যাদি শ্রুতি প্রকৃতিকেই জগৎকর্ত্রী বলিয়াছেন। কোনও শ্রুতিতে ঈশ্বরের কথা থাকিলেও সাংখ্যমতের পণ্ডিতগণ প্রকৃতি পক্ষে তাহার অর্থ করিয়া থাকেন।

থাকিলেও তাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। এই সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কথাই পরিলক্ষিত হয় না, কেবল সাংখ্যপ্রবচনেই ঈশ্বর নিষেধক কয়েকটী সূত্র দৃষ্ট হয়।

সাংখ্যপ্রবচন যে প্রামাণিক বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলে গৃহীত নহে, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, সাংখ্যশাস্ত্র প্রায়ই কালের কবলগত, কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি নিজের কথাদ্বারা তাহাই এখন পরিপূর্ণ করিব। *

সুতরাং সাংখ্য প্রবচন যে বিজ্ঞান ভিক্ষুর কল্পিত, তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই প্রমাণিত হইতেছে।

বাচস্পতি মিশ্র সাত কি আটশত বৎসরের লোক, তিনি সাংখ্য কারিকার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু ভাষ্যে এই বাচস্পতি মিশ্রেরও মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মত যে নিতান্ত আধুনিক তাহাও অনায়াসে বুঝা যায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিলেই বুঝিতে পারেন যে এক একটী সাংখ্য কারিকা অবলম্বন করিয়া সাংখ্য প্রবচনের ২।৩টী সূত্র রচিত হইয়াছে। অতএব অপ্রামাণিক আধুনিক একখানা গ্রন্থের কয়েকটী সূত্র দেখিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে বিখ্যাত মহাজন-পূজিত মহর্ষি কপিলকে নাস্তিক চূড়ামণি বলা আমরা সমীচীন মনে করি না।

পক্ষান্তরে তর্কের অনুরোধে সাংখ্য প্রবচন কপিলের প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিলেও, আমরা তাঁহাকে নাস্তিকবিশেষণে অভিহিত করিতে পারি না। যেহেতুক কপিল নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না, কিন্তু জন্য ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি বলেন লোকে ও শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের কথা বলে তাহা জন্য ঈশ্বর। অর্থাৎ উপাসনা দ্বারা (যোগবলে) তাঁহারা ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন। †

তপঃপ্রভাবে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইলে ঐশী শক্তি হয়। সুতরাং তিনি সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। যেরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আমাদের ঈশ্বর। ইহাদেরও কালে বিনাশ আছে, এরূপ ঈশ্বর কপিলের অনভিপ্রেত নহে।

---

* কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞান সুধাকরং।
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোমৃতৈঃ॥

† মুক্তাত্মনঃ প্রসংশা উপাসাসিদ্ধস্য বা ইতি সাংখ্য সূত্র।

বৈদান্তিকাদি দার্শনিকগণ সগুণ ব্রহ্ম স্বীকার করিয়া থাকেন। সত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটীর নাম গুণ, মিলিত গুণ ত্রয়ের নাম প্রকৃতি বা মায়া। প্রকৃতি জড়া ; ব্রহ্ম এই প্রকৃতি যুক্ত হইলেই তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তি হয়, এবং তিনি ঈশ্বর পদ বাচ্য হইয়া সৃষ্টি কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। কপিলের মতে ব্রহ্ম প্রকৃতিযুক্ত নহেন, কেবল প্রকৃতিই জগন্নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম কিছুই করেন না, কেবল সাক্ষীরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত। প্রকৃতি জড়া, চেতনের সাহায্য ব্যতীত জড়পদার্থে কার্য্য করে কিরূপে, একথার উত্তরে কপিল বলেন—যেরূপ চুম্বকের সন্নিধ্য বশতঃ জড় লৌহের গতি শক্তি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সান্নিধ্য বশতঃ জড়া প্রকৃতির ও কার্য্যকারিণী শক্তি জন্মে। অথবা যেরূপ গৃহে প্রদীপ আছে বলিয়া আমরা সমস্ত কার্য্য করিতে পারি, প্রদীপ না থাকিলে পারি না, প্রদীপ কিন্তু কিছুই করে না। সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম তাহার কিছুই করে না।

ইহাতে কপিলের নাস্তিক উপাধি দেওয়া কতদূর সঙ্গত তাহা শিক্ষিত সমাজ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। অন্যান্য দার্শনিকগণ যাহা মানেন, কপিলও তাহা মানেন। তবে বৈদান্তিক বলেন ব্রহ্ম প্রকৃতি যুক্ত হইয়া সৃষ্টি করেন, এই অবস্থার নাম ঈশ্বর, আর কপিল বলেন তাহা নহে, প্রকৃতিই সৃষ্টি করেন, ব্রহ্ম আছেন বলিয়া তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, সুতরাং প্রকৃতিপুরুষের মুক্তা-বস্থা হয় না। ইহাতে একটু মতভেদ ভিন্ন আর কিছুরই কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

সার্থক।

মরি যেন আমি চাঁদের মতন কাঁদায়ে নিখিল ধরা,
লয়ে উপহার তপ্ত নিশাস বিরহ আবেগ ভরা!
নিজে যদি কাঁদি মেঘের মতন—ঝর্ ঝর্ আঁখিজল,
তাপিত জনের ব্যথিত পরাণ করে যেন সুশীতল।

———

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

আমরা গতবারে ইংলণ্ডীয় ও ফরাসীয় বিবাহ প্রথার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের নিকট ইংলণ্ডীয় ও ফরাসীয়—উভয় প্রথার মধ্যে তুলনায় ফরাসীয় প্রথাই ভাল বলিয়া মনে হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকে আবাল্য বাঙ্গালাও ইংরেজি উপন্যাসাদিতে প্রণয় মূলক বিবাহের বিবরণ পড়িয়া উহার দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হওয়াটা নিতান্তই একটা বন্ধন স্বরূপ মনে করেন। সুতরাং আমাদের হিন্দু শাস্ত্র কর্ত্তাগণের ব্যবস্থাটা তাঁহাদের নিকট অতীব গর্হিত বলিয়াই বিবেচিত হয়।

এবিষয়ে আমাদের দেশের উপন্যাস ও গল্পাবলী কত দূর দায়ী তাহাও বিবেচ্য। এইরূপ প্রণয়-মূলক গল্প দ্বারা সমাজের অস্থি মজ্জায় যে কিরূপ দোষের সঞ্চার হইতে পারে, গল্প লেখকগণ তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা ছোট গল্পে সিদ্ধ হস্ত, সেই সব লেখকের গল্পের মধ্যে ঐরূপ ভাবের সমাবেশ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কবিবর রবীন্দ্রনাথ গল্পের ক্ষেত্রে একরূপ প্রতিদ্বন্দী হীন; তাঁহার সবগুলি গল্পে সরল গ্রাম্য হিন্দু সমাজের চিত্রই আমরা দেখিতে পাই; তাঁহার চিত্রগুলি অতি স্বাভাবিক ভাবে আমাদের হৃদয়ের উপরে একটা রেখা আঁকিয়া দিয়া যায়; বিসদৃশ ভাব আনয়ন করে না। আর একজন প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর গল্প গুলিতেও নানাভাবে নানারূপে আমাদের হিন্দুর ঘরেরই চিত্র অঙ্কিত। সে গুলিও বিনা আড়ম্বরে সরল ভাবেই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। এইরূপ আরও দুই চারি জনের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু আর আর অনেকেরই লিখিত ঐরূপ গল্পের মধ্য হইতে বিদেশী গল্প এমন ভাবে বাহির হয় যে তাহা চাপিয়া রাখা কঠিন। যাঁহারা বিলাতি গল্পের অনুবাদ করিয়া বিলাতী নাম গোত্র সহিত পাত্র পাত্রীগণকে উপস্থাপিত করেন, তাঁহারা বরং ভাল; কিন্তু যাঁহারা উহাকে দেশী পরিচ্ছদ দিয়া সাজাইয়া বাহির করেন, তাঁহারা সমাজের বেশী অনিষ্ট করেন। নব্য যুবকগণ এবং কুললক্ষ্মীগণ ঐ সব গল্প পড়িয়া স্বীয় স্বীয় মনে ঐরূপ কল্পনার আশ্রয় দেন। তাহার ফলে তাঁহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে।

এবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে হইতে পারেনা। তবে প্রসঙ্গতঃ একটু না বলিয়া পারিলাম না। গল্প এবং উপন্যাস লেখকগণ দয়া করিয়া যেন এ কথাটা একটু প্রণিধান করেন, এই প্রার্থনা।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্র কর্ত্তারা চারিদিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই স্বৈর নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা না করিয়া অভিভাবকগণের উপর সে ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। বিলাতী কোর্টসিপের ব্যবস্থাটা যে তাঁহারা আমাদের মধ্যে প্রবর্ত্তন করেন নাই তাহাতে সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিছুই নাই।

বিলাতী উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া এই কোর্টসিপ ব্যবস্থার বিষয় যাহা আমরা বুঝিতে পারি তাহাতে দেখিতে পাই যে, অনেক সময়েই উভয় পক্ষ উভয়ের নিকট প্রকৃত ভাবে অপরিচিতই থাকিয়া যান। বাহিরে খুব পরিচয় খুব মাখা মাখি হইলেও সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির মত মধ্যে ব্যবধানই থাকিয়া যায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ছন্দানুবর্ত্তন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা পাইয়া থাকেন। অনেক সময়ে কন্যা কুলের মাতৃগণ কোনধনী অনূঢ় যুবকের সন্ধান পাইলে, তাহাকে বশ করিবার জন্য কন্যাগণকে কৌশলজাল বিস্তার করিতে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে থাকেন। এইসব কি হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের লক্ষণ ? না কেবল স্বার্থ সিদ্ধির ফাঁদ ?

এইরূপ নীচ উদ্দেশ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও যুবক যুবতি পরস্পরের প্রতি একটু আকৃষ্ট হইলে তাহাদের গুণাগুণ বিচারের অবকাশ তাঁহাদের থাকেনা, ক্ষমতাও থাকে না। নবযৌবনের মোহমদিরায় আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহারা ভবিষ্যতকে একেবারে ভুলিয়া যান, মনে করেন যে, এইরূপ মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়াই চিরকাল কাটিয়া যাইবে ; কিন্তু বিবাহের পরেই সে উত্তেজনার কতকটা উপশম হইয়া পড়ে ; তখন বাস্তব জীবনে অনেক বৈসাদৃশ্যই প্রতিদিন লক্ষিত হয় এবং উভয়ে সাবধান হইয়া না চলিলে, অল্প দিনের মধ্যেই সংসারে অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বৈর নির্ব্বাচনে গুণাগুণ বিচার করিয়া উপযুক্ত পাত্র নির্নীত হইলে বিবাহের 'পরেই ব্যভিচারাদি কারণে বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের মোকদ্দমা হইবার অবসর থাকিত না।

হিন্দুসমাজের বালক বালিকা আবাল্য শিখিয়া আসিতেছে যে, পিতামাতা যাহাকে স্ত্রী বা স্বামী বলিয়া প্রদান করিবেন তাহাকে লইয়াই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহাকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে হইবে ; তাহার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে ; সে সুরূপই হউক, আর কুরূপই হউক,

—সে যাহাই হউক। সুতরাং তাহাদের মন বাল্যকাল হইতে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সেইরূপেই প্রস্তুত হয়। যখন কৈশোরের অন্তিম শয্যার পার্শ্বে যৌবনের মৃদু মধুর হাস্যচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়, যখন স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি ধারায় প্রেমধারা পরিপুষ্ট হইয়া হৃদয়ে একটা নবীন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টিকরে, তখন এই কিশোর কিশোরীগণ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে এই পবিত্র অমৃতধারা সঞ্চয় করিয়া রাখে—কাহার জন্য? কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের জন্য নহে, অথচ একজনের জন্য? হিন্দু বালিকা হৃদয়ে প্রেম সঞ্চয় করিয়া রাখে নিজের স্বামিত্বের জন্য, হিন্দু যুবক রাখেন তাঁহার স্ত্রীত্বের জন্য। হিন্দুর অনূঢ়া কন্যা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তাঁহার হৃদয়ের প্রেমদান করিতে পারেন না; কারণ সে বিষয়ে তিনি স্বাধীনতা বর্জ্জিত; সুতরাং স্বামী ভাবের উদ্দেশ্যেই তাঁহার প্রেমপূজার উপহার তিনি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, সেই স্বামিত্ব যাঁহার উপরই বর্ত্তিবে, তিনিই তাঁহার সেই পূজা পাইবার অধিকারী হইবেন। তাঁহার স্বামীর কোন বিশেষরূপ বা গুণের উপরে তাঁহার ভালবাসা নহে;—কারণ বিবাহের পূর্ব্বে তাহার বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ ই অজ্ঞ; তাঁহার স্বামিত্বের উপরই তাঁহার ভাল বাসা। সুতরাং রূপ বা গুণের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই। স্ত্রীর সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং অজ্ঞাত বস্তুর উপর তাঁহাদের ভালবাসা সঞ্চিত হওয়াতে ইহা রূপজ বা গুণজ ভালবাসা নহে। ইহা তাহার অনেক উপরে স্থাপিত।

প্রভাত বাবুর একটী গল্পে স্ত্রীর মুখের একটি কথায় তিনি এই ভাবটি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সে গল্পের বই খানি আমার কাছে নাই, এজন্য তাহা বিস্তৃত ভাবে দেখাইতে পারিলাম না; তাহার মর্ম্ম এই যে স্বামী নব্যরোগ গ্রস্থ, বিনা প্রণয়ে বিবাহটা গ্রাহ্যই নহে, এজন্য তাঁহার পিতৃ দত্ত স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতেছেন। পথে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে স্ত্রী তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া স্বামী যেন বিস্মিত হইলেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন এত কষ্ট আমার জন্য করিতেছ?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন—করিবনা? তুমি যে আমার স্বামী।"

ইহাই হিন্দু স্ত্রীর কথা, হিন্দু কন্যার কথা। আমার স্বামিত্ব যাঁহাতে বর্ত্তিয়াছে তিনিই আমার প্রেম পাত্র, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব; তাঁর জন্য আমি

সব করিতে পারি ; তিনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করুন আর নাই করুন, তাঁর সঙ্গে আমি কথা বার্ত্তা বলিয়া থাকি—আর নাই থাকি ?

এই শিক্ষার বলেই হিন্দু রমণী সতীধর্ম্মে আদর্শ স্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। 'যেটা পছন্দ হইবে বাছিয়া লইব" এই ধারণা বাল্যকাল হইতে থাকিলে এইরূপ তদ্ভাব-ভাবিত প্রেম সঞ্চার হওয়া অসম্ভব হয়, কারণ সেরূপ ভাবনার প্রয়োজনই থাকে না ; সুতরাং একনিষ্ঠা রতি হইতে পারে না। অবশ্য আমি এতদ্দ্বারা এইরূপ প্রমাণের প্রয়াস পাইতেছিনা যে বিলাতী রমণীর মধ্যে পবিত্র স্থায়ী একনিষ্ঠ প্রণয় নাই ই। এবং ইহাও বলিতেছিনা যে হিন্দু রমণীগণের সকলেরই মধ্যে এইরূপ সতী ভাব দেদীপ্যমান। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে আমাদের সমাজের ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথা এইরূপ একনিষ্ঠা রতি জন্মিবার পক্ষে বড়ই অনুকূল ; বিলাতী ব্যবস্থা ততদূর অনুকূল নহে। বিলাতী ব্যবস্থাতে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বড়ই বেশী। এ ব্যবস্থাতে ভ্রান্ত হইবার অবসরই নাই। কারণ ভাবের উপরে ভ্রান্তি আসিতে পারে না। স্ত্রীর স্বামিত্বের প্রতি ও স্বামীর স্ত্রীত্বের প্রতি ভালবাসা ; উহা যাহাতেই বর্ত্তিবে, সেই উহার পাত্র হইবে—তার-রূপগুণ থাকুক বা না থাকুক। তাই হিন্দু শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন যে, স্বামী চিরকাল সকল অবস্থাতেই—সুরূপ হউক, কুরূপ হউক যাহাই হউক—সে স্বামী। ধর্ম্ম ও নীতি হিসাবে দেখিতে গেলে এতদপেক্ষা উচ্চতর নীতি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

তারপর নির্ব্বাচন ব্যবস্থা অভিভাবকগণের হাতে ন্যস্ত হওয়া নানা প্রকারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গলকর। কেহ সুরূপ বা সুরূপা হইলেও চরিত্রে অতি কদর্য্য হইতে পারে। গুণেরই প্রাধান্য চিরকাল থাকে ; রূপ দুই দিনের জন্য —যৌবন জোয়ারের জল। তাহার দ্বারা চিরকাল চলেনা। সুতরাং অভি-ভাবকগণ পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনে সুধু রূপের দিকেই দেখেন না, রূপ অপেক্ষা তাঁহারা গুণের, ও বংশের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। সৎবংশের পুত্র বা কন্যা সাধারণতঃ সৎই হইবে আশা করা যায়। বংশের মধ্যে কোন কঠিন ব্যাধির প্রকোপ আছে কিনা, তাহাও তাঁহারা দেখিবেন। সামুদ্রিক শাস্ত্রে ও ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং মন্বাদি ঋষি প্রণীত সংহিতাদিতে পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনের যে সমুদয় উপদেশ ও সঙ্কেত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারাও উপযুক্ত নির্ব্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। বস্তুতঃ অভিভাবকগণ স্বীয় স্বীয়

পুত্র ও কন্যার ভাবী মঙ্গলের দিকে, সুখ শান্তির দিকে, দৃষ্টি রাখিয়াই প্রধানতঃ নির্ব্বাচন কার্য্য করিবেন, তাঁহারা সুধু রূপের আকর্ষণে ভুলিবেন না; কারণ তাঁহাদের বিচার শক্তি স্থির ও ধীর হইবে এই সৎ উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র কারগণ এইরূপ বিধান করিয়াছেন। ঘর ও বর দেখা একটা সাধারণ কথা। উহার মধ্যেই সব কথা নিহিত আছে।

তবে দুঃখের বিষয় আমাদের হিন্দুসমাজ আজকাল শাস্ত্রের আদেশ উপদেশ ভুলিয়া রূপ চাঁদের মায়া জালে বেশী বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত নির্ব্বাচনের দিকে বেশী দৃষ্টি না করিয়া মুদ্রা স্থালীর উপরেই লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। পুত্রের পিতা কন্যার রূপ গুণের দিকে বেশী দৃষ্টি না করিয়া টাকা কত পাওয়া যাইবে তাহারই হিসাব করিতেছেন, কন্যার পিতা এই সব হাঁক ডাকে ভীত, ও বিহ্বল হইয়া সুপাত্র নির্ব্বাচনের চেষ্টায় বিরত হইয়া কোনরূপে দায় মুক্ত হইবার উপায় দেখিতেছেন; তাহার ফল যাহা হইতেছে, সকলেই চক্ষুর উপরেই দেখিতে পাইতেছেন; আরও পাইবেন।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

দাই নিপ্পন।

এশিয়ার উত্তর পূর্ব্ব কোণে যে উজ্জ্বল দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, যে দ্বীপপুঞ্জের জ্যোতি সমগ্র প্রাচীন মহাদেশকে আজ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, সেই দ্বীপপুঞ্জের নাম জাপান। কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জাপান সর্ব্বপ্রথম পাশ্চত্য জাতির একটুকু সংস্পর্শে আইসে। ঐ সময় পর্য্যন্তও সেইদেশ জাপান নামে পরিচিত ছিল না। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের ওলন্দাজ জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে জাপানে পদার্পন করে। উহাই জাপানের সহিত পাশ্চত্য জাতির প্রথম সংস্পর্শ। জাপান-বার্ণিশের সুন্দর সুন্দর জিনিষ ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইত। সেই বার্ণিশের নামানুযায়ী বৈদেশিক জাতি এইদেশকেই জাপান নামে অভিহিত করিতে থাকে। আজ পর্য্যন্তও কোন কোন পল্লীর বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ জানেন না যে, তাঁহাদের

দেশের নাম জাপান। তাহারা জানেন—তাঁহাদের দেশের নাম নিহন বা নিপ্পন। আজ কয়েক বৎসর যাবত জাপানিরা গ্রেটব্রিটেনের অনুকরণে তাহাদের দেশের নাম গ্রেট জাপান (দাই নিপ্পন) রাখিয়াছে।

জাপান সাম্রাজ্য প্রায় ছয়শত দ্বীপের সমষ্টি। উহার মধ্যে হনসু, কিউমিউ, মিকোকু, হোক্কাইদো এবং ফর্ম্মোজা দ্বীপ উল্লেখ যোগ্য। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে চীনের সহিত যুদ্ধের সন্ধিতে জাপানিরা ফর্ম্মোজা দ্বীপটি আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছে। এবং গত রুষজাপান যুদ্ধের সন্ধিতে সাগালিয়েন দ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে। উহারা সাগালয়ান দ্বীপের নাম কারাফুতো রাখিয়াছে।

সমগ্র জাপান আয়তনে ২০০৬২ বর্গ রি অর্থাৎ ১৬৮১০০ বর্গমাইল। উহার শতকরা কেবলমাত্র ১৫·৭ ভাগ কৃষি ও মনুষ্যের বাসোপযোগী। অবশিষ্ট ৮৩·৩ ভাগ পর্ব্বতাকীর্ণ। দেশটি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, নদী, হ্রদ ও প্রস্রবনে পূর্ণ। জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। জাপানিদের নিকট শুনিতাম যে, যতদিন বৈদেশিক জাতি প্রত্যক্ষভাবে জাপানের সংস্পর্শে যায় নাই, ততদিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তাঁহারা ইউরোপের সুইজার-ল্যাণ্ডকে শীর্ষস্থান প্রদান করিতেন। কিন্তু অধুনা জাপান দেখিয়া উহারা জাপানকেই প্রকৃতিদেবীর বাসভুমি বলিয়া বর্ণন করেন। স্বচক্ষে সে মনোরম দৃশ্য দেখিলেও এমন শক্তি নাই, যাহাতে সেই অনির্ব্বচনীয় চিত্তবিমোহন অপূর্ব্বদৃশ্যের চিত্র পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারি। কালিদাসের সমুদ্র তট বর্ণন পাঠ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কল্পনায় ধারণা হইত না। স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিলাম, প্রশান্ত মহাসাগরের বিক্ষোভিত নীলাম্বুরাশি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া যখন তটস্থ পর্ব্বতমালাকে ঘাতপ্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকে, তখন নাস্তিকও সৃষ্টিকর্ত্তার গরিয়সী শক্তির উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া পারে না। আবার অন্যদিকে বন জঙ্গল এবং পাহাড়ের নিভৃত প্রদেশ দেখিলে আমাদের প্রাচীন মুণিঋষিদের তপোবনের কথা মনে পড়িত। মানস সরোবরের বর্ণনা শুনিয়াছিলাম—জাপানের নিকোনামক স্থানে মানস-সরোবর দেখিয়াছি। কয়েক মাইল পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিয়া সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে এক সরোবর তীরে উপস্থিত হইতে হয়। কল্পনার অতীত দৃশ্য তথায় নয়ন গোচর হয়। এই সরোবর (চুজেঞ্জি হ্রদ) সাত মাইল দীর্ঘে এবং আড়াই মাইল প্রস্থে—চতুর্দ্দিক সমুন্নত পাহাড়ে

বেষ্টিত। পাহাড় হইতে কল্‌কল্‌ রবে কত জল প্রপাত আসিয়া হ্রদে মিলিত হইয়াছে। আবার নিম্ন প্রদেশে হ্রদ অন্য কতকগুলি প্রপাতের জল সরবরাহ করিতেছে। হ্রদের পার্শ্বে বুদ্ধদেবের মন্দির, ডাকঘর, হোটেল, বন্দর প্রভৃতিতে বেশ একটী ছোটখাট সহর। জাপানী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—"নিকো মিলাকেরেবা কেকো গাঁ নাই" অর্থাৎ যিনি নিকোনামক স্থান না দেখিয়াছেন দুনিয়াতে তাঁহার তৃপ্তি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। নিকোর ন্যায় সুন্দর সুন্দর জায়গা যেন জাপানের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইলাম। শিণ্টোধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রকৃতিদেবীর আরাধনা করিয়া থাকে, এইজন্যই বোধ হয়, প্রকৃতিদেবী তথায় পূর্ণবিকাশে বিরাজিতা।

কেবল মাত্র ১৫.৭ ভাগ ভূমি কৃষি ও মনুষ্যের বাসোপযোগী হইলেও তুলনায় জাপানের লোক সংখ্যা অতিবেশী। কোন কোন জেলায় গড়ে প্রতি বর্গমাইলে একহাজার লোকের উপর ; আবার স্থল বিশেষে কেবলই পাহাড়, তথায় প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ২৫ জন মাত্র।

১৮৯৭খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের হিসাবে দেখাগিয়াছে, লোকসংখ্যা প্রতিবৎসর ১.০৩ হইতে ১.০৯ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু তারপর হইতে বৃদ্ধির হার ক্রমেই বাড়িতেছে ১৯০৩খ্রীঃ শতকরা ১.৫৪ বাড়িয়াছে। জাপানের লোকসংখ্যা পৌণেপাঁচকোটী ; ফর্ম্মোজার অধিবাসী সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের উপর।

আইনু নামক এক অসভ্য বর্ব্বর জাতি জাপানের আদিম অধিবাসী। তাহারা নব্য অধিবাসী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া জাপানের উত্তর প্রদেশের পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় লয়। আজ পর্য্যন্তও হোকাইদো অঞ্চলে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উহারা ক্রমেই নব্য জাপানীদের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। আকৃতিক গঠনে জাপানীরা মঙ্গোলিয়ান জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ন্যায় জগতের অন্যান্য জাতিরও বিশ্বাস ছিল যে উহারা মঙ্গোলিয়ান জাতি। বাস্তবিক মঙ্গোলিয়ান জাতি হইলেও গতযুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব লাভের পর হইতে, আধুনিক কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে মধ্য এসিয়া এবং ভারতবর্ষ হইতে আর্য্যেরা আসিয়া ক্রমে ক্রমে এসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব মালয় উপদ্বীপে এবং শ্যাম প্রভৃতি স্থানে বসতি বিস্তার করেন। বর্ত্তমান সভ্য জাপানীদের পূর্ব্বপুরুষেরা আর্য্যদের সেই শাখা হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ জাপানের দক্ষিণভাগে কিউসিউদ্বীপে বসতি বিস্তার করিয়া ক্রমে

ক্রমে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়েন। বাস্তবিক জাপানের অতি প্রাচীন রাজধানী দক্ষিণভাগেই ছিল। এবং আজ পর্য্যন্তও দেখা যায় জাপানের অধিকাংশ বড় বড় মেধাবী মনস্বী এবং বীরগণ দক্ষিণ প্রদেশ হইতেই বাহির হইতেছেন। পণ্ডিতেরা আরও প্রমাণ করেন যে, যেসময় আর্য্যগণ দক্ষিণদিকে বসতি বিস্তার করেন, সেই সময়ই মঙ্গোলিয়ানগণ চীন ও কোরিয়া হইতে জাপানের পশ্চিম প্রদেশে বসতি বিস্তার করিতে থাকে। উক্ত কালে এই আর্য্য ও মঙ্গোলিয়ানদের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান নব্য জাপানীর উৎপত্তি। আকৃতিতেও ক্বচিৎ কাহারো কাহারো আর্য্যদের ন্যায় উচ্চ নাসিকা ও বড় চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জিমুতেন্নো জাপানের পবিত্র সিংহাসনে অধিরোহন করেন। জাপানীদের বিশ্বাস জিমুতেন্নো জাপান শাসনের জন্য স্বর্গরাজ্য হইতে প্রেরিত হন। এই জন্যই জাপানের মিকাদো অর্থাৎ সম্রাটগণ দেশে তেন্নোহেইকা (দেবতার প্রতিনিধি) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মিকাদো জিমুতেন্নোর সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে জাপানের ইতিহাস আরম্ভ হয়। কোন দেশের ইতিহাস—এই কথা বলিলেই মনে হয়, উক্ত দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজার ভিন্ন ভিন্ন শাসন প্রণালী-এক রাজবংশের পতন, অপরের অভ্যুত্থান, এক রাজার হত্যা, অপর রাজার সিংহাসনাধিরোহন, সাময়িক রাষ্ট্র বিপ্লব, যুদ্ধ বিগ্রহ, যুদ্ধে অসংখ্য লোকের হত্যাকাণ্ড এবং রক্তস্রোত প্রবাহ—ইত্যাদি। কিন্তু জাপানের ইতিহাস আলোচনা করিলে তেমন কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। ২৫শতাব্দী ব্যাপিয়া একই রাজবংশ নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান মিকাদো ইয়োশিহিতো এই বংশের ১২২শ সম্রাট। এরূপ পৃথিবীর কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মূলে—জাপানিদের অসাধারণ স্বদেশ বৎসলতা এবং রাজভক্তি। জাপানের আবাল বৃদ্ধ বণিতা দেশ ও রাজার নামে পাগল; যে কোন মূহুর্ত্তে দেশ ও রাজার সেবায় যে কেহ মহামূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে উগ্রীব। ভারতে শিক্ষিত সমাজ আজ ঘরে বসিয়াও তাহার অসংখ্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে জাপান সভ্য জগতে অপরিজ্ঞাত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, গ্রন্থকারগণও যে দেশের নাম উল্লেখ করিতে ভ্রুকুঞ্চিত করিতেন, আজ সকলের মুখেই সেই দেশের নাম! আজ সকলেই সেই দেশের

সভ্যতা, সেই দেশের রীতিনীতি, শিক্ষা, রণকৌশল. ব্যবসা—বাণিজ্য প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। আজ সেই জাপানের অধিবাসী ভারত প্রমুখাৎ প্রাচীন সুসভ্য দেশের অধিবাসীকে রাস্তা ঘাটে কুরোম্বো (নিগ্রো) বলিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। অধিক আর বলিব কি, যে সময় ওলন্দাজগণ জাপানে আগমন করে, তখন উহাদের যাহা কিছু সকলি জাপানীদের নিকট নুতন বলিয়া বিবেচিত হইত। জাপানীরা বলিত এসব—খ্রীষ্ট। ওলন্দাজদের নুতন ধরণের তৈজসপত্র, কার্য্যপ্রণালী, রীতিনীতি প্রভৃতি সমস্তই উহাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত; তাই তাহারা সেই সকলকে ভোজের খেলা এই অর্থে 'খ্রীষ্ট' নামে অভিহিত করিত। জাহাজ, কলকারখানা, পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন সমস্তই—খ্রীষ্ট। সহরের কোন কোন লোকের কাছে শুনিয়াছি, অদ্যাপিও গণ্ডগ্রামে অনেক প্রাচীন লোক ফণোগ্রাফ, গ্রামোফোণ, বাইয়োস্কোপ প্রভৃতিকে খ্রীষ্ট বলিয়া থাকেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্বে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বের আর কোন ইতিহাস জানা যায় না। প্রায় বারশত বৎসর রাজ্য শাসন প্রণালী অনেকটা একভাবেই চলিতে থাকে।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন দেশীয় প্রচারকগণ কোরিয়ায় এবং কোরিয়ার প্রচারকগণ জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় সাম্রাজ্ঞী ছুইকো রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনিই জাপানের প্রথম স্ত্রীশাসন কর্ত্রী। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহার চেষ্টায় অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম সাদরে গ্রহণ করিতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপনে বদ্ধমূল হয়। এই শতাব্দীতে মোট ৭ জন সম্রাট এবং ৫ জন সাম্রাজ্ঞী রাজত্ব করেন। আমাদের দেশের ন্যায় জাপানেও পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের ভিতর ধর্ম্মভাব প্রবল।

উল্লিখিত পাঁচজন সম্রাজ্ঞীই জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টাতেই জনসাধারণ এবং শিক্ষিত ভদ্র সমাজ উক্তধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করেন। আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে অশোক যেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সাম্রাজ্ঞী কোমিও এবং কোকেনো জাপানে ঠিক তেমনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রাজ্ঞী কোমিওই সর্ব্বপ্রথম জাপানে ৫৩ ফিট উচ্চ নারার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপন করেন। নারার মূর্ত্তি ব্যতীত রাজ্ঞী কোমিও দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনাথ আশ্রম

পান্থশালা এবং চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সর্ব্বজন হিতকর কার্য্যে অজস্র, অর্থ ব্যয় করেন। ঐ সকল কার্য্যের জন্য তিনি হিন্দুরাজা শিলাদিত্যের ন্যায় অনেকবার রাজকোষ নিঃশেষিত করেন। ইহার পর প্রায় দেড়শত বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে কোন সম্রাট কিংবা সাম্রাজ্ঞী বিশেষের তেমন চেষ্টা এবং সহানুভূতি দেখা যায় নাই। তৎপর পুনরায় ফুজিওয়ারার সময় কতিপয় সম্রাট এবং সাম্রাজ্ঞীর প্রযত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ প্রসারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্যের সর্ব্বত্র ফুজিওয়ারা বংশের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠায় ঐ সময়কে ফুজিওয়ারা সময় বলে। এই সময় মুরাছাকি সিকিবু নাম্নী জনৈক ভদ্রমহিলা "গেঞ্জিমোনো গাঁতারি" নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতা ও ক্রমশঃ জাপানে বিস্তৃত হইতে লাগিল। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই লোক চতুর হইতে লাগিল। ক্রমে সুশৃঙ্খল ভাবে একাকী রাজ্য শাসন সম্রাটের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইলে, তিনি দেশের প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তিকে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জায়গীর প্রদান করতঃ সুশাসনের বিধি ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন। ১২শ শতাব্দীতে জাপানে প্রথম জায়গীর প্রথার (Feudal system) প্রবর্ত্তন হয়। জায়গীরদারগণকে জাপানী ভাষায় দাইমিও বলিয়া থাকে। বড় বড় দাইমিও স্ব স্ব প্রদেশ সংরক্ষণের খরচ পত্র বাদে নিজেদের জীবিকার জন্য বার্ষিক ১০০০০ কোকু অর্থাৎ ৩০০০০/০ মন ধান্য পাইতেন। রাজ্যে শান্তি রক্ষণের নিমিত্ত এই সময় বহু রক্ষকের আবশ্যক হয়। সামুরাই নামক এক শ্রেণীর লোক ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা আমাদের দেশের প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতীর ন্যায়। অধুনা সেই সামুরাই জাতিই ক্ষাত্রবীর্য্যে সমগ্র ধরণীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

ধনী ও ধন।

একদা কহিছে ধনী, হে ধন ভাণ্ডার !
তুমি ভিন্ন এসংসারে কি আছে আমার,
ধন কহে, মিছে কথা, আমি প্রতারক ;
নিশিদিন খুঁজিতেছি তোমার ঘাতক।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

সোমেশ্বর ও সোমেশ্বরী।

সুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সোমেশ্বর পাঠক প্রকৃতির রম্য নিকেতন গারো পাহাড়ের সানুদেশে সুসঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন এক সল্পতোয়া পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী সোমেশ্বরের আবাস বাটীর অনতি দূরে, পাহাড় পুরীতে আপন মনে প্রবাহিত হইত। সোমেশ্বর দেখিলেন, এই স্রোতের গতি ফিরাইলে রাজধানীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। সোমেশ্বর সেই স্রোতস্বতীর গতি ফিরাইবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার অশেষ চেষ্টার ফলে কল্লোলিণী পুণ্যভূমি সুসঙ্গের পাদদেশ প্রক্ষালন করিবার জন্য পাগলিনী হইয়া ছুটিল। সেই স্বল্পতোয়া নদী আজ বিশাল কায় হইয়া সোমেশ্বরের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে এবং "সোমেশ্বরী" নামে পরিচিত থাকিয়া রাজধানীর পাদদেশ প্রক্ষালন করিতেছে।

পার্ব্বতী সোমেশ্বরী।

সোমেশ্বর রাজধানীর উন্নতি কামনায় ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকস্থ গারো, হাজং প্রভৃতি অসভ্য পাহাড়ীয়া জাতি সকল তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল বটে কিন্তু সেই অঞ্চলের কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঞা তখনো আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বহু স্থান শাসন করিতেছিলেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঞাগণ আপনাদিগকে জোয়ারদার বলিয়া পরিচিত করিতেন *। সোমেশ্বর এই

* তখন সুসঙ্গ রাজ্য নিম্নলিখিত জোয়ারে বিভক্ত ছিল যথা (১) বওলা জোয়ার

জোয়ারদারদিগকে আয়ত্ত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সোমেশ্বরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই জোয়ারদারগণ আত্ম সমর্পণ করিয়া সোমেশ্বরের পদানত হইলেন।

যখন রাজধানীর চতুর্দ্দিকে তাহার শাসন দণ্ড সুপরিচালিত হইতে লাগিল, তখন তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় তিনি খসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন। খসিয়া-রাজ সীমা রক্ষার জন্য সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। যুদ্ধে সোমেশ্বর জয়লাভ করিলেন। খসিয়া রাজ পরাজিত হইয়াও পরাজয় স্বীকার করিলেন না; যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এবার অগণন গারোবাহিণী লইয়া সোমেশ্বর প্রভূত বিক্রমে খসিয়া-রাজকে আক্রমণ করিলেন। খসিয়া রাজ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। সোমেশ্বর খসিয়ার রাজধানী নংস্তিংপুঞ্জি আক্রমণ করিতে আপন বাহিণী চালনা করিলেন।

সোমেশ্বরকে রাজধানী আক্রমণ করিতে হইলনা। খসিয়া-রাজ সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ৬৯৫ বঙ্গাব্দে সুসঙ্গরাজ সোমেশ্বরের সহিত খসিয়া রাজের সন্ধি সংস্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে খসিয়া-রাজ সুসঙ্গকে নিজ রাজ্যের সীমান্ত স্থান সমূহ হইতে নংদিন, নংখালু, নসফা, বংসু প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিলেন। * এই সময় সুসঙ্গ রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত হইয়া উত্তরে নেংজা পর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে মহিষখলা নদী, পশ্চিমে নেতাই নদী ও দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমি পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

অতঃপর সোমেশ্বর শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়া বহু বিস্তৃত স্থান স্বীয় অধিকার ভুক্ত করেন। সময়ে তাঁহার অধিকৃত এই সুবিশাল স্থান "হোসেন প্রতাপ বাজু" নামে অভিহিত হয়।

সোমেশ্বর প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী চেষ্টায় সুসঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ৭১৪ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

(২) রায়পুর জোয়ার (৩) ভাটি জোয়ার (৪) বারসহস্র জোয়ার (৫) সুসঙ্গ জোয়ার ও (৬) উজান জোয়ার।

* বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে খসিয়ার রাজা এই সকল স্থান দাবী করিয়া সুসঙ্গ রাজের সহিত এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ মোকদ্দমায় সুসঙ্গ রাজ জয়লাভ করেন। অধুনা এই স্থানগুলি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট গারোহিলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়াছেন।

জন্মতিথির উপহার।

ডোভার বন্দরে রণতরী, বাণিজ্য পোত, যাত্রী জাহাজের ভিড় সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। চারিদিকে কর্ম্মের কোলাহল, ব্যবসায়ের দরদস্তুর, ব্যস্ত লোকের ছুটাছুটীর আর বিরাম নাই। মানুষের কর্ম্মের বিরাট চেষ্টার মধ্যে প্রকৃতির শোভা ম্লান। তাই বনলক্ষ্মী বন্দর ছাড়িয়া দিয়া পল্লীরদিকে সরিয়া আসিয়া সাগরের উপকূলে আপনার সাঝিটী ফুলে পাতায় ভরিয়া রাখিয়াছেন! বসন্তের হাওয়া লাগিয়া ইংলণ্ডের দুরন্ত শীত উত্তর মেরুর আবিষ্কারে চলিয়া গিয়াছে। সাগরের কূল ধরিয়া বন্য ডেইজী ফুলের রাশি হাসিমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যেন সাগরের নীল বসনের জরির পাড়খানি, সোণায় সবুজে ফুলপাতার মাধুরী দিয়ে বুনানো! মিঃ ল্যাসেলাসের্ মেয়ের ঘরের নাত্‌নি, আট বছরের মেয়ে, সাঁঝের মুখে বনফুল তুলিয়া তার ঝক্‌ঝকে সোণার তারের সাঝিটী ভরিতেছিল। মেয়ের নাম ভায়োলেট্। সদ্য প্রস্ফুটিত ভায়োলেট ফুলের রং মাখানো চোখদুটী দেখিয়া তার মা বড় সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন—ভায়োলেট্! নাম রাখিয়া নামের সঙ্গে আপনার স্মৃতি মাখিয়া মা তার স্বর্গে চলিয়া গেছেন, যেন শুধু নাম রাখিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। আজ ভায়োলেটের জন্মোৎসব তিথি। এমনি এক বসন্তের ফুল ফোটা চাঁদনিমাখা রাতে ভায়োলেট মায়ের কোলে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! আজ আবার আট বছর পরে সেই রাতটী ফিরিয়া যেন ভায়োলেটের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে আসিয়াছে। ভায়োলেট ব্যথায়, অভিমানে চোখদু'টী অশ্রুপূর্ণ করিয়া যেন আজ তার জন্মতিথিকে বলিতেছিল, "তুমি যদি আসিলে, তবে মা আসিলনা কেন! না হয়, একটীবার শুধু চোখের দেখাদিয়া সে চলিয়া যাইত, আমি তো আর তাকে আটক করিয়া রাখিতাম না।"

ডোভার বন্দরে আজ তাদের বাড়ীখানি ফুলে-পাতায়, ঝাড়ে-ফানুশে, পরদায়-নিশানে, গানে-মালায় উৎসবের বেশ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া ভায়োলেটের হৃদয়ের ক্ষত স্থানেই তার হাত পড়িতেছিল। জন্মতিথির কাঁকলি-মুখর আনন্দের মাঝে মাতৃহীণার অন্তরনিহিত গভীর ব্যথাখানি বারবার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল; তাই আজ ভায়োলেট

সাগরের নির্জ্জনকূলে একলা আপন মনে বসিয়া মায়ের শীতল সমাধির জন্য একখানি উপহার, একগাছি শিশির মাখা বনফুলের মালা গাঁথিতেছিল। একটী অপরিচিত ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক বালক হাসিভরা চোখে নিঃশব্দে ভায়োলেটের মালাগাথা দেখিতেছিল!

তখন সন্ধ্যার পেছনে দিবা, সমুখে নিশি! বসন্তের মোহনস্পর্শে মুগ্ধসাগর যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিল! ফ্রান্সের উপকূলস্থিত ক্যালে বন্দরের কমলালেবু গাছের উপর দিয়া চাঁদের একখানি সোণালি রেখা সাগরের নীল ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় ঝিকিমিকি দিয়া ইংলণ্ডের কূলের দিকে পাড়িদিবার যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে মাত্র!

ভায়োলেট তখনো ঘরে ফিরে না দেখিয়া পাশে দাঁড়ানো বালকটী বয়স্থ অভিভাবকের মত একটু মুরুব্বিয়ানা স্বরে বলিয়া উঠিল ঃ—

"রাত হয়ে এলো ঘরে যাবে না তুমি?"

ভায়োলেট নীলচোখে সেই অপরিচিত বালকের পানে একবার চাহিয়া হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটুখানি বালকের অতটা মুরুব্বিয়ানার ভাব দেখিয়া সে যেন হাসি সামলাইতে পারিলনা। স্বেচ্ছাচারিণী ছোট্ট বনদেবীটীর মত, হাসিখুসী বালিকাটীকে সহসা অমন হাসিয়া উঠিতে দেখিয়া বালকটী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল ঃ—"হাস্‌চ যে বড়! ভারি দুষ্টু তুমি!"

বালকের ভৎর্সনায় ভায়োলেটের হাসির ফোয়ারা আবার উৎসরিত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পরে হাসি থামাইয়া বলিল ঃ—

"দুষ্টু আমি? মাইরি ভাই, দুষ্টু আমি কখ্‌খনো নই! দাদামণি বলে আমায়—তুই বড্ডো সোহাগী মেয়ে, দিদিমণি বলে—লক্ষ্মী বনের পাখীটী আমার! "দুষ্টু" আমায় কেউ বলে না; দুষ্টু তুমি!"

ভায়োলেটের স্নেহের তিরস্কার লাভ করিয়া বালকটী যে খুসী হইল না তা নয়, পরে একটু হাসিয়া বলিল—"যে ভাল মেয়ে তাকে এতক্ষণ একলাটী ঘরের বাইরে থাক্‌তে হয়না! তোমার মা তোমায় আজ কত বক্‌বে এখন দেখো!" ভায়োলেট ছলছল চোখে বালকের দিকে চাহিয়া বলিল ঃ—

"আমার মা নাই যে! মা মরেছে থেকে কেউ আমায় বকেনা!"

বালক ছোট্ট মেয়েটীর মর্ম্মস্থানের ব্যথাটীর উপর না জানিয়া আঘাত করিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইল। পরে মেয়েটীকে খুসী করিবার চেষ্টায় স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার উপর মোলায়েম ভাবে হাত বুলাইয়া তার মন ভুলাইবার

জন্য অনেক কথা বলিল। এইরূপে সেই অপরিচিত বালক ও বালিকার মধ্যে সেই নিরালা সন্ধ্যায় অনেক কথা হইল।

তারপর ভায়োলেট্ তাহার সেই অপরিচিত সাথীটীকে আপন অকৃত্রিম স্নেহপাশে বন্দীকরিয়া তাহাদের বাড়ীতে তার জন্মতিথির উৎসবের মাঝে লইয়া আসিল। ভায়োলেট নূতন সাথী লইয়া গৃহে আসিয়াই তার মাতামহ ভাই কাউণ্টকে একগাছি বন ফুলে গাঁথা মালা দেখাইয়া বলিল ঃ—

"দাদামনি, এই নাও আমার জন্মদিনের উপহার।"

বৃদ্ধ ভাইকাউণ্ট ইচ্ছা করিয়া ভুল করিলেন। তিনি বালকের দিকে চাহিয়া উদার স্নেহে জবাব দিলেন ঃ—

"খাসা উপহার—কার ছে'লে এটী?"

রিচার্ড তার পিতার নামটী বলিতে যাইতেছিল,—অধবের মূলে আসিয়া কথাটী আর তার মুখে ফুটিল না। ভায়োলেট্ আহ্লাদে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল ঃ— ও! তুমি তা বুঝি জাননা, এ যে আমার 'ভালবাসা'। সকলে হাসিয়া উঠিল! রিচার্ড লজ্জায় লাল হইয়া গেল! ভায়োলেটের প্রৌঢ়া মাতামহী তাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিল ঃ—

"পাগলিনীর পছন্দ আছে কিন্তু!"

(২)

ধীরে ধীরে কুঁড়ি হইতে ফুলটী যেমন রূপে-রসে-গন্ধে-মাধুর্য্যে বিকাশিত হইয়া উঠে, তেমনি রিচার্ড ও ভায়োলেটের মধ্যে একখানি স্নেহের সম্পর্ক, একখানি কোমল সমপ্রাণতা, ধীরে ধীরে মঞ্জরিত হইয়া উঠিল! অথচ এ প্রণয় খেলার—প্রেমের নয়! সে স্বচ্ছ গিরি নির্ঝরের শুভ্র লাবণ্য ধারা তখনো ভালবাসার গৈরিক রাগে রক্তিম হইয়া উঠে নাই। ভায়োলেট্ তাসের ঘর বাঁধিয়া রিচার্ডকে ডাকিয়া দেখাইত, রিচার্ড তাকে পক্ক রক্তিম ফল পাড়িয়া দিত, কখনো ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের কবিতা শিখাইত! এমনি করিয়া যখন আরো আটটী বৎসর কাটিয়া গেল, তখন জীবননাট্যের শৈশব নামক অঙ্কের সমুদয় অভিনয়গুলি শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার শীতের কুহেলী কাটিতে না কাটিতে পুষ্পবনে নুপুর ধ্বনি করিয়া বসন্ত লক্ষ্মী দিকে দিকে আনন্দের ঝঙ্কার তুলিয়া জাগিয়া উঠিলেন। এবারকার বসন্তের আকাশে নীলের উজ্জ্বল্য—রং বেরঙ্গের মাখা মাখি—আরো চমৎকার! গাছে গাছে, লতায় পাতায়, ফুলের দেয়ালী আপনা আপনি সাজিয়া উঠিয়াছে।

বনের পাখীগুলি নুতন পালকের পোষাক পরিয়া গানের সুরে বনভূমিকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। এবারকার বসন্তে কোকিলের পঞ্চম ঝঙ্কারে দিন রাত্রির ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে।

ভায়োলেট্ তখন কৈশোরের নব পল্লবিত যোজক খানির উপর আসিয়া সবে রাঙ্গা পা ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে! একপারে তার শৈশব, অপর পারে যৌবন; একদিকে কূলের তরুচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত তরঙ্গহীন সুদূর হ্রদের নির্ম্মল প্রশান্ত মূর্ত্তি. অপরদিকে বর্ষার কূলপ্লাবিনী তরঙ্গিণীর উন্মত্ত-আবিল অশান্ত-ফেনিল অধীর-উচ্ছ্বসিত বিশাল তরঙ্গভঙ্গ! সেই স্বর্ণ সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আজ রিচার্ডের পানে তাকাইতে গিয়া ভায়োলেটের চক্ষু পল্লব লাল হইয়া আপনা আপনি মুদিয়া আসিল! সে এখন আর রিচার্ডকে তেমন সরস সরল উচ্চ মধুর কণ্ঠে ডাকিতে পারে না। কণ্ঠস্বর আজ তার বিচিত্র রসের মধুরতায় গাঢ়তর; অঙ্গে অঙ্গে লজ্জার কোমলতা জড়িত। ভায়োলেটের প্রৌঢ়া মাতামহী দুটী সরল হৃদয়ের ভাব বিনিময় লক্ষ্য করিয়া খুসী হইলেন। তিনি ভাবিলেন ভায়োলেট যদি সুন্দর, রিচার্ডের স্বপ্নোজ্জ্বল চক্ষুদুটী সুন্দরতর। রিচার্ড যদি ভায়োলেটের রূপে মুগ্ধ, ভায়োলেট তার প্রণয়ের পাগলিনী! বৃদ্ধ ভাইকাউণ্ট কিন্তু তাদের প্রণয় সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "ওর নাম নেশা, ভালবাসা নয়। শুধু নিশিথের বাতাসে জড়ানো হেসন-হেনার একটু খানি অবয়বহীন মিষ্টতা; এ কখনো দিনের আলো সহিতে পারিবেনা। রিচার্ড নিঃস্ব দরিদ্রের সন্তান, স্বচ্ছলতার চাকচিক্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে ওর মাথা বিগড়াইয়া যাইবে। আগে ওকে উপার্জ্জন করার দুঃখ সহিতে দাও, তবে তো ওর অর্থের উপর মমতা হইবে—সদ্ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে। উচু হইতে নীচের মানুষকে অনুগ্রহ করা যায়, কৃপা করা যায়, ক্ষমা করা যায়; তার নাম ভালবাসা নয়। আর নিচু হইতে উপরের মানুষের নিকট ভিক্ষা করা যায়, খোসামুদী করা যায়, প্রার্থনা করা যায়; তারো নাম ভালবাসা নয়। এক সমতল ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষ না দাঁড়াইলে একজন কখনো আরেক জনকে যথার্থ ভালবাসিতে পারেনা!"

সাগরের কূলে শ্লেটের রং একখানি পাথর;—তার চারিদিকে বন্য ডেইজী ফুলগুলি তারার মত দল বাঁধিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর একটী চেরীগাছে ফুল সবে ধরেছিল। তার শাখা হতে একটী পরগাছা পাণ্ডুর

বেগুণি রংএর ফুলে ফুলে ভরা শীষ খানি ফুলের বেণীর মত বসন্তের মৃদু পবনে দুলাইয়া দিয়াছে। সমুখে তীর-তল হীন নীলসাগরের বিরাট মূর্ত্তি—হৃদয়ে তার তরঙ্গের ছন্দোময় উচ্ছ্বাস, আর বনতরু সমাকুল তীর কুঞ্জরেখায় মৌমাছিদের ঘুমন্ত সুরের গুঞ্জনধ্বনি। পাথর খানির উপর রিচার্ড ও ভায়োলেট্ পাশাপাশি বসিয়াছিল। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল; রোদের আলোতে আর তেমন জোর ছিলনা, চারিদিক নির্জ্জন! ভায়োলেট্ রিচার্ডের হাতখানির উপর আপন কিশলয় সদৃশ করপল্লব খানি আবেশে তুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিলঃ—"দাদামণি বলেন, যে ডার্ব্বির মালিক হবে, তাকে কেবল নিরেটপ্রেমিক হলে চলবে না, খাঁটি সংসারীও হতে হবে তাকে। উপার্জ্জন করার কষ্ট আগে তাকে সইতে হবে, নৈলে সে কখনও সদ্ব্যয় কর্ত্তে শিখবে না।"

রিচার্ড বলিল—টাকার লোভে আমি তোমায় ভালবাসিনি ভায়োলেট্। আমার ভালবাসা বনের পাখীর ভালবাসার মতো টাকা পয়শার ধারধারেনা। ভায়োলেট্—"দাদা বাবু হেসে বলেন 'তোর যে স্বামী হবে তার খালি ভালবেসে নিস্তার নাই। তার ডার্ব্বির মালিক হওয়ার যোগ্য হওয়া চাই।"

রিচার্ড—"ভালবাসার সঙ্গে আবার বিষয় বুদ্ধি! তাদের ছজনার মধ্যে যে তীর ধনুর ছুটে পালানো সম্পর্ক! একজন দুনিয়ার যা কিছু সব নিজের করে সুখী। আর একজন নিজের যা কিছু সব পরকে বিলিয়ে দিয়ে সুখী। বিষয় বুদ্ধির সঙ্গে ভালবাসা খাপ খাবে কি করে?"

ভায়োলেট্—বুড়োদের ঐ এক রকমের খেয়াল আর কি! তর্ক কর্ত্তেগেলে তারা চটে যায়। তা তুমি একটা কিছু কাজ হাতে নিয়ে দেখাও না কেন যে, তুমি নিজে রোজগার কর্ত্তে শিখেচো। তবেই তো সব চুকে যায়।"

রিচার্ড—"তাতে বেশী কি হবে?"

ভায়োলেট্—"তা হইলে বুড়ো নিশ্চয় রাজি হবে।"

রিচার্ড—সে জন্য শুধু উপার্জ্জনের কষ্ট কেন ভায়োলেট্, মৃত্যুর কষ্ট ও সইতে রাজী আছি। কিন্তু তাতে যে বুড়ো রাজি হবে, তা কে বল্লে তোমায়?"

ভায়োলেট্—"সে নিজের মুখে আমায় বলেচে, তাতেই তো তোমায় এখানে আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে লিখেছিলাম।"

ভায়োলেটের হাত দুখানি আপনার কাম্পত অধরে স্পর্শ করাইয়া একটু ম্লান হইয়া রিচার্ড বলিলঃ—"যদি কপালে থাকে তবে হবে, নচেৎ হবে

না। কিন্তু তুমি যে আমায় ভালবাস, সেই আমার জীবনের সব চেয়ে গৌরবের জিনিষ।”

ভায়োলেট্—“ও কথা বলোনা, ডিক্! দাদা বাবু আমায় ঠাট্টা করে বলে, মেয়েদের ভালবাসা নাকি শ্যাম্পেনের নেশা—খালি হাওয়ায় বাড়ে।”

(৩)

একটী জুটমিলের অধ্যক্ষের পদভার গ্রহণ করিয়া রিচার্ডভিন্‌সেণ্ট আজ দুই বৎসর হইল বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা সহরে বাস করিতেছে। বহু সরিৎ-সাগর-ভূধর পার হইয়া শুধু ভায়োলেটের কল্পিত ভালবাসাটুকু বুকে করিয়া কর্ম্মের উত্তেজনার মধ্যে সে আপনাকে সমগ্র ভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছে! উপার্জ্জনের কষ্টের মধ্যে যদি তার ভালবাসার স্বপ্ন খানি স্বার্থক হয়, সেই আশার ক্ষীণ, অতিক্ষীণ, উজ্জ্বল রেশমী সুতাখানির সহিত তার জীবন মরণ ভবিষ্যৎ এক সূত্রে গাঁথা। প্রতিমাসে দুইবার করিয়া বিলাতী ডাকে ভায়োলেট তারে চিঠি লিখে, রিচার্ড সারা রাত জাগিয়া কাঁদিয়া—তার পর তা ডাক কাগজ লিখিয়া—ভিজাইয়া, স্নেহ-বাসনায়, প্রেম-উৎকণ্ঠায়, অশ্রুতে-চুম্বনে—চিঠি-সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া ফেরত ডাকে জবাব খানি নিজে অতি সাবধানে ডাক বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসে। ভায়োলেটের চিঠিগুলি যেন সোণালী সন্ধ্যার মুখে চক্রবাক বধূর বিরহ বিধুর রোদন ধ্বনি! আর রিচার্ডের চিঠিগুলি যেন শরবিদ্ধ সারসের মর্ম্মন্তুদ অন্তিম গীতি ঝঙ্কার। এমন করিয়া দুইটী চির তৃষিত প্রণয় হৃদয় সাগরের দুই কূলে বসিয়া একজন আরেক জনকে ডাকাডাকি করিয়া মরিতেছে। মাঝে অকূল অফুরন্ত নীল নিষ্ঠুর সাগরের তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ বারি রাশি।

সেদিন মাঘের শেষ—দিনটা কিছু মেঘাচ্ছন্ন ছিল; তাই ঘন কুহেলী জালে সমাচ্ছন্ন আমাদের শ্যামল পৃথিবীখানি সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় একখানি মুছা মুছা ছবির মত নিতান্ত অস্পষ্ট দেখাইতে ছিল। সে ছায়াময় বন কুঞ্জ হইতে একটী অদৃশ্য কোকিলের কুহু তান বার বার কুহরিত হইয়া অদূরবর্ত্তী বসন্তের আগমনীর বাঁশী বাজাইতেছিল। আজ বিলাতী ডাক আসিবার কথা। তাই রিচার্ডের চিত্ত আজ ভারি প্রফুল্ল। বিশেষতঃ ভায়োলেট গত ডাকে লিখিয়াছে আজকার ডাকে সে ভাইকাউণ্টের চিঠিও পাইতে পারে। হয়তঃ এই চিঠিতেই তিনি তার কাছে ভায়োলেটের তরফ হইতে শুভ বিবাহের পাকা প্রস্তাব করিয়া তাকে দেশে যাইবার আ হ্বান করিয়া পাঠাইবেন।

আর কয়েক মুহূর্ত্ত! এখন সে জুটমিলের অধ্যক্ষ মাত্র। হয়তঃ আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ভায়োলেটের পতিরূপে ডার্ব্বি সায়ারের উত্তরাধিকারীপদে অভিষিক্ত হইয়া যাইবে। এই কয়টী মুহূর্ত্ত যেন কত যুগের ব্যবধান!

সন্ধ্যার পর ৭৷৷০টার সময় ডাক আসিবে। চাপরাশির ডাক লইয়া আসিতে আসিতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া যায়। আজ এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া বাড়ীতে বসিয়া অপেক্ষা করা রিচার্ডের নিকট অসম্ভব বোধ হইল। সন্ধ্যার ঘন কুয়াশার মধ্যে রাস্তার ল্যাম্প পোষ্টে নিষ্প্রভ বাতিগুলি সারি বাঁধিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না উঠিতেই রিচার্ড জেনারেল পোষ্টাফিসে আসিয়া হাজির। তখন সে খানে "window delivery"তে বিলাতী ডাক লইবার জন্য, সাহেব মেম্, আর্দ্দালী চাপরাসী, সরকারী বেসরকারী লোকের হাট বসিয়া গিয়াছে। এমন সময় বিলাতী ডাকের আগমন সূচক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। রিচার্ডের মনে হইল সে ঘণ্টাধ্বনী যেন গির্জ্জায় শুভবিবাহের ঘণ্টাধ্বনির মতই মধুর আওয়াজ দিতেছিল।

পোষ্টাফিসের জানালা দিয়া ডাকের চিঠি বিলি আরম্ভ হইল। সমাগত জনতার মাঝে একটা ছুটা ছুটি পড়িয়া গেল। কত সাহেব টেবিলের উপর লাল ফিতায় বাঁধা আফিসের ফাইলটী দীপোজ্জ্বল ল্যাম্পের সামনে রাখিয়া দিয়া স্ত্রীর চিঠিখানির জন্য উদগ্রীব হইয়া বার বার বাহিরের দিকে আর্দ্দালীর অপেক্ষা করিতেছেন। কোথাও লণ্ডনের বিশেষ সংবাদ দাতার পত্রখানির জন্য সম্পাদক খবরের কাগজ খানি এখনো প্রেসে দিতে পারেন নাই, তাই ডাকের দিকে তাকাইয়া আছেন। কেহ দালালের পত্রে ম্যানচেষ্টারের বাজার দর জানিতে আসিয়াছে। কোনও মেমের ফ্রান্স হইতে ফ্যাসন দুরস্ত হইয়া ওরণ সিল্কের পেষাক আসিতেছে। মেম সাহেব তাই ছট্ ফট্ করিতেছেন। ষ্টেট্-সেক্রেটারী কর্ত্তৃক ফার্লো মঞ্জুর হইয়া চিঠি আসিতেছে—কোন সাহেব সেই আশায় আশায় হাভানার চুরুট ডজনে ডজনে ছাই করিতেছিলেন। প্রায় সকলেই চিঠি পত্র লইয়া ভির ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল! এক চিঠি পাইল না হতভাগ্য রিচার্ড। ভাইকাউণ্টের পত্রে ভায়োলেটের সহিত তার বিবাহের পাকা প্রস্তাব পাইবার আশার স্বপ্ন শ্যাম্পেনের ফাটা কাচের ছোট্ট গ্লাসটীর মত ঠুন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। হাউয়ের উজ্জ্বল আলোক রেখা ফুস করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া খানিকের তরে নীল

আকাশে রঙ্গ বেরঙ্গের ফুলের মালা ফুটাইয়া দিয়া চোখের নিমেষে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল! স্বপ্ন ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আজ তার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া কলিজা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিতেছিল। তবু সে জোর করিয়া ভাবিল স্বপ্ন ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, তাতে ক্ষতি নাই। স্বপ্ন এমন ভেঙ্গেই থাকে। কিন্তু ভায়োলেটের চিঠি আজ আসিল না কেন? এমনতো আর কখনও হয় নাই। তার কোন অসুখ করে নাইতো?

রিচার্ড যখন রিক্তহস্তে কম্পিত পদে শূন্য নয়নে রাস্তায় বাহির হইয়া আকাশের পানে চাহিল, তখন কুয়াশার মাঝে শীর্ণ চন্দ্রালোক মায়ের মত পরম স্নেহে তার পাণ্ডুর রক্তহীন মুখমণ্ডল চুম্বন করিয়া তার মনোভঙ্গের সুগভীর বেদনা অপসারিত করিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু জলশীকর সিক্ত চন্দ্রালোকের ইন্দ্রজালে আজ আর তার শূন্য হৃদয় ভরিলনা, আজ তার জরোঞ্চ ললাট শীতল হইলনা। সে যখন শূন্য হাতে ম্লান চন্দ্রালোকোজ্জ্বল রাজ পথে বাহির হইল, তখন তার মনে হইল আজ তার মত দীন, তার মত রিক্ত, তার মত হতভাগ্য, আজ কোন পথের ভিখারীও নয়। সে কলের পুতুলের মত বাড়ীর দিকে চলিতেছে। শুধু চলিয়াছে, চলিতে হইবে—তাই চলিয়াছে। অথচ যাইবার যেন কোন লক্ষ্য ছিলনা, প্রয়োজন ছিলনা, বা উৎসাহ ছিলনা। নানা পথে মাতালের মত ঘুরিয়া যখন সে ঘরে ফিরিল, তখন রাত্রি ১১টা। ঘরে ফিরিয়া হৃদয় যেন আজ আরো উতলা হইয়া উঠিল! আজ যেন মনকে বুঝাইবার সে কিছু পাইতেছিল না। এত বড় কর্ম্ম বহুল সংসারে জীবন যাত্রার এত খুঁটিনাটির মধ্যে, সে যেন করিবার মত একটী কাজও হাতের কাছে পাইলনা। হতাশ হইয়া একবার জানালা খুলিয়া দেখিল,—আজ অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে নিশীথের জগত নিতান্ত ছায়াময়। চারিদিকে নিৰ্ম্মম শূন্যতা। মহাশূন্যে ক্লান্ত ক্ষীণ শশী বিকলা হইয়া অস্তশিখরে মুহুর্মুহু ম্লান হইতেছে। তারাগুলি ঘন কুহেলীর ভিতরে যেন বাষ্প কুল চোখে পৃথিবীর পাণ্ডুর নীল বুকের দিকে চাহিয়াছিল। রাস্তার কুকুর গুলির কাঁকা আওয়াজে স্তব্ধ রাত্রির গভীরতা যেন গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল। আজ তার অন্তর শূন্য, তাইআজ নিশীথ প্রকৃতির ভীষণ নীরবতা শূন্যতার মত তার বুকে আসিয়া বাজিল। তাড়াতাড়ি সে জানালার সাশি বন্ধ করিয়া দিয়া সঙ্গীহীন শিশুটির মত নিরুপায় ভাবে আপনার শুভ্র শয্যা খানিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপন্নের চির করুণাময়ী নিত্যজননী নিদ্রা তার তপ্ত চোখে আপনার স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিয়া তাহাকে অপানার শান্তিময় কোলে তুলিয়া লইলেন। শেষ রাত্রিতে রিচার্ড ঘুমের রাজ্যে এক আশ্চর্য্য স্বপ্নের দেখা পাইল। তার বোধ হইল, যেন দেশ-কালের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে এক রাত্রিতে ডোভারের উপকূলবর্ত্তী সাগরের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। সেখানেও যেন বাঙ্গালা দেশের নির্গলিতাম্বুগর্ভ সুনীল আকাশ, বাঙ্গালা দেশরই চাঁদের কনক রেখা খানি তখন যেন ইংলিশ চ্যানেলের নীল জলে ডোবে ডোবে! উপকূলের বায়ুচালিত বন্য ডেইজী গুলি সব আজ যেন আকাশের তারার মত উজ্জ্বল প্রভাময়। শ্লেটের রং সেখানকার সেই পুরাতন স্মৃতিমাখা পাথর খানার উপর রিচার্ড পা দুলাইয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধ ভাইকাউণ্ট সাশ্রুনেত্রে ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে লজ্জাকুণ্ঠিতা আনত-মুখী বিবাহের বেশে ভূষিতা ভায়োলেটের হাতখানি রিচার্ডের হাতে তুলিয়া দিয়া যেন বলিতেছেন ঃ— "ভায়োলেট এই নাও তোমার জন্মদিনের উপহার।" রিচার্ড সে স্নেহ-তপ্ত অনুরক্ত প্রেমস্পর্শে শিহরিয়া জাগিয়া শুনিল—সত্য সত্যই ভায়োলেট তাহাকে ডাকিতেছে—"আমার প্রিয়তম, এই যে আমি আসিয়াছি।"

রিচার্ড গায়ের কম্বল খানা উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া ঘর্ম্মাক্ত শিরে বিছানার উপর বসিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল—সত্য সত্যই ভায়োলেট! তারি সেই ভায়োলেট—জন্ম জন্মান্তরের পরিচিতা, অনন্ত কালের প্রণয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী—তারি সেই ভায়োলেট!

ভায়োলেট রিচার্ডের শুইবার কামরার ভিতরে, দ্বারের রুদ্ধ কপাটের কাছে, দুই হাতে পরদার দরজা উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া! তার মাথার উপর তরল মলমলের ওড়ণা আলুলায়িত চুলের উপর হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে! গায়ে ফরাসী সাদা সাটিনের পাতলা লেসদার জ্যাকেট, পরণে সাদা সিল্কের ঘাগরী গুচ্ছে গুচ্ছে কুঞ্চিত হইয়া নামিয়া আসিয়া পায়ের দিকে অবস হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। যেন পরদার আড়ালের ঘন অন্ধকার তার অঙ্গরাগের অস্ফুট জ্যোৎস্নায় আলো হইয়া গিয়াছিল! দুই হাতে তার রিচার্ডের উপহারের সোণার চুড়ি দুগাছি; জোড়ের মুখের কাছে হীরার ফুল দুটী, তেমনি উজ্জ্বল টলমল করিতেছে! তার সদ্য প্রস্ফুটিত অপরাজিতার মত সেই অপরূপ রূপ!—সেই অমিয় মাখা চাহনি! তবে এবার তাতে যেন কেমন একটা অতৃপ্তির সহিত বিষাদের ছায়া জড়ানো!

"এসেচো, তুমি এসেচো ভায়োলেট। আমি তো খালি তোমার চিঠি-খানার আশে পথ পানে চেয়েছিলাম। আজ তার বেশী কিছু তো চাই নি!"

ভায়োলেট বীণার কণ্ঠে বলিল ঃ—"এসেচি,—সত্যি এসেচি প্রিয়তম! সব বন্ধন পিছনে ফেলে দিয়ে এসেছি।"

রিচার্ড শয্যায় বসিয়া মাতালের মত ভাব বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল ঃ—"তবে আমার কাছে এসো, অমন দুরে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থেকোনা! আমার হাতে হাত রেখে আমার পাশে এসে দাঁড়াও!"

ভায়োলেট কোমল কণ্ঠে একখানি বেদনার করুণ সুর পল্লবিত করিয়া তুলিয়া বলিল ঃ—"না, প্রিয়তম, আমি তোমার মনের উপর মন রেখে দাঁড়ায়েছি, হাতে হাত দিয়ে দাঁড়াবার আমার আর শক্তি নেই।"

রিচার্ডের মুখে আর কথা সরিল না। রিচার্ড উন্মত্তের মত দুই হাতে আলিঙ্গন প্রসারিত করিয়া ভায়োলেটের দিকে ছুটিয়া আসিল!

* * * * * * *

প্রত্যুষের স্নিগ্ধ বায়ু যখন তাহার শীতল হাত রিচার্ডের মাথার উপর ধীরে২ বুলাইয়া তার মূর্চ্ছা অপনোদন করিয়াদিল, তখন সে দেখিল দ্বারের কপাট রুদ্ধ ; পরদার দ্বার খানি আপনা আপনি মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। আর সেই পরদার লুণ্ঠিত ঝালরের উপর—সে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সারা অঙ্গে বেদনা, রুদ্ধ কপাটে মাথা লাগিয়া কপালের জায়গায় জায়গায় চিরিয়া রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। চেতনার সঙ্গে সঙ্গে গত রজনীর প্রত্যক্ষ স্বপ্নখানি তার স্মৃতিপটে অস্ফুট ছবির মত উন্মীলিত হইয়া উঠিল।

দ্বারের ফাঁকে ফাঁকে তখন প্রভাতের সাদা আলো কামরার ভিতরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে মাত্র। বাহিরে গাছে গাছে পাখীর গানে প্রভাতী নহবতের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিতেছে। এমন সময় কামরার বাহির হইতে বেহারা ডাকিয়া বলিল ঃ—"তার সে বেলায়ত কো খবর আয়া হুজুর।"

রিচার্ড কম্পিত করে দ্বারের হুড়কা খুলিয়া পাগলের মত বেহারার হাত হইতে টেলিগ্রামখানি ছোঁ মারিয়া লইয়া একবার পড়িয়াই আবার ছিন্নমূল বনতরুটীর মত মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

টেলিগ্রাম করা হইয়াছে—ডোবার হইতে গত রাত্রি ৪টার সময়। টেলিগ্রাম করিয়াছেন—ডার্ব্বির বৃদ্ধ ভাইকাউণ্ট। তাহাতে লেখা এইরূপ—
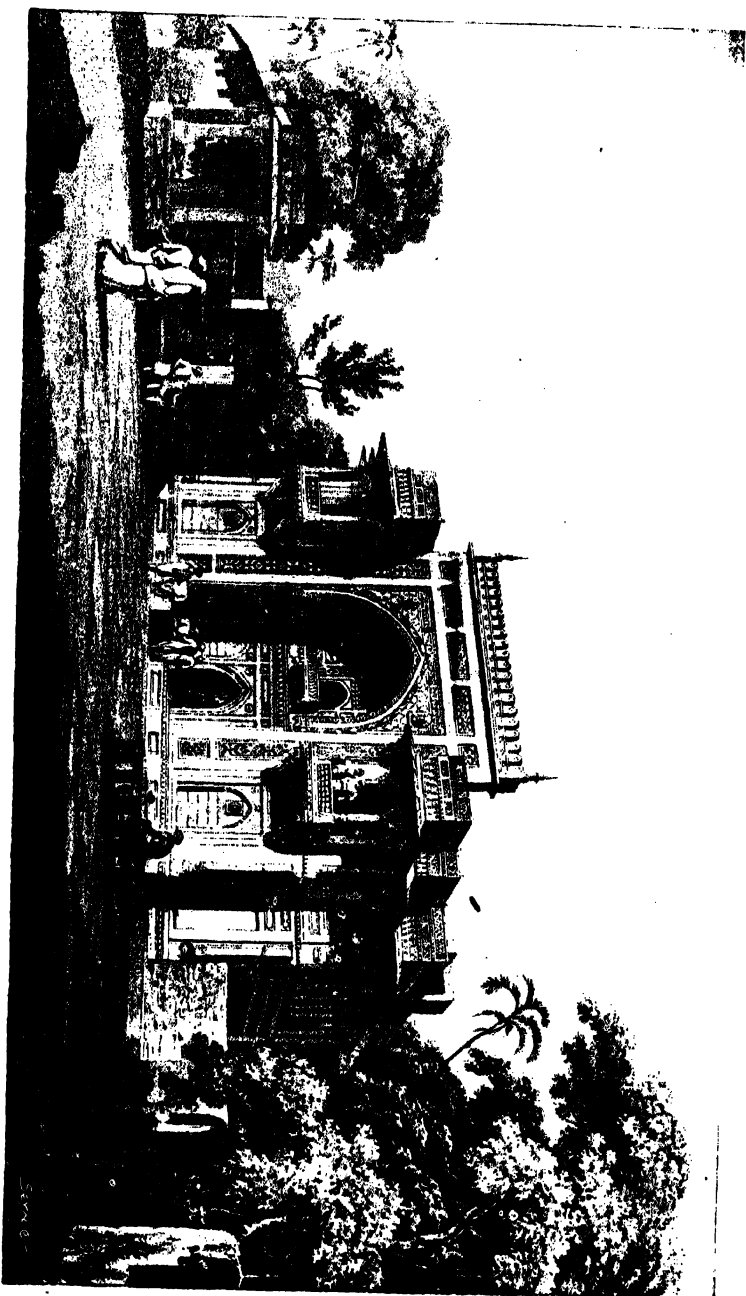
মসজিদ তোরণ—চুনার।

'আজ তিন সপ্তাহ আমাদের বড় সাধের ভায়োলেট নিউমোনিয়ায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল আজ রাত্রি ২টার সময় তার সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

চূণার ভ্রমণ।

চূণার ছোট হইলেও বড় মনোরম ও স্বাস্থ্যকর সহর। তাই আমি চূণারকে খুব ভালবাসি। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার চূণার গিয়াছিলাম, আবার ভগ্নস্বাস্থ্য জোড়া দেওয়ার অভিলাষে দ্বিতীয়বার চূণার যাত্রা করিলাম।

১৩১৮ সালের ১২ আশ্বিন অপরাহ্নে বাক্স, ব্যাগ, বিছানা, টব, বাল্‌তি প্রভৃতি গৃহস্থালীর খুঁটি নাটি আসবাব গরুরগাড়ী বোঝাই করিয়া শকটা-রোহণে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া রেলগাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভীষণ চিৎকারে বংশিধ্বনি করিয়া হুস হুস শব্দে ট্রেণখানি চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে রজনীর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল; এদিকে শীত ও নিদ্রাদেবী দু'জনে যেন পরামর্শ করিয়া আক্রমণের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরাও আস্তে আস্তে শয্যারচনা করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

এক এক ষ্টেসনে গাড়ী থামে, আর গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বটে, কিন্তু 'রিজার্ভ' গাড়ী বলিয়া তাহাতে নিদ্রার বড় বেশী একটা ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। নিদ্রাদেবী একেবারে প্রভাতেই বিদায় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। আমরা উঠিয়া হাত মুখ ধুইলাম। এদিকে কোয়াসার আবরণের ভিতর হইতে সূর্য্যদেব গাছ পালা ও শস্য ক্ষেত্রের উপর উঁকি ঝুঁকি দিয়া উঠিলেন। তখন দূরস্থিত পাহাড়গুলি মেঘের ন্যায় তরঙ্গায়িত দেখা যাইতে লাগিল। প্রকৃতির মনোহর দৃশ্যে ব্যাধি ক্লিষ্ট শরীরে আমি যেন নূতন বল-লাভ করিলাম।

ষ্টেসনের পর ষ্টেসন পার হইয়া শোণ নদীর সেতু দেখা দিল; এতবড়

প্রকাণ্ড সেতু নাকি ভারতবর্ষে আর নাই। উহা দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্য্যন্ত নদীটির সম্বন্ধেও ঐরূপ অদ্বিতীয় বলিয়া ধারণা হওয়াই সম্ভব পর, কিন্তু প্রত্যক্ষ হইলে সেতুটীর অস্তিত্বেও অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। নদীতে জলের সম্বন্ধ অতি বিরল, কেবল বহুদূর ব্যাপী বালুচর বলিয়াই প্রতীয় মান হয়। যাহা হউক সেতুটী পার হইতে যথেষ্ট সময় অতীত হইয়াছিল। তারপর আরও কতকগুলি ষ্টেসনের পর 'মোগলসরাই' আসিয়া গাড়ী থামিল। সেখানে আমাদের গাড়ী দুইখানি কাটিয়া রাখিয়া, শত শত আরোহী লইয়া ট্রেণখানি ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমরা স্নানাহার সমাপন করিলাম। তৎপর আমাদের গাড়ীও চূণারাভিমুখে চলিল। চূণার ষ্টেসনের কাছাকাছি আসিলেই 'ফোর্ট' দেখা গেল। আমার মনে চূনারের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল।

আমরা যখন চূণারে পৌঁছিলাম, তখন বেলা দু'প্রহর। প্রখর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, আমাদের বাঙ্গালা দেশের সোণা ভাঙ্গা রোদ; এদেশে যেন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রস্তর হইতে অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। আমরা তাহার প্রচণ্ডতেজে দগ্ধ হইতে হইতে একায় চড়িয়া বাঙ্গলার দিকে ছুটিলাম।

আমার সঙ্গীরা সকলেই সেখানে নূতন যাত্রী; কেবল আমার সঙ্গেই চূণারের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। কাজেই আমি পথ প্রদর্শকরূপে সব দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে চলিলাম। রাস্তার দুইদিকে কতকগুলি খণ্ডগিরি বা পাথর গড়. কোথাও কতকগুলি লোক গড়ে আগুণ জ্বালাইয়া দিতেছে। কোথাও তাহারা প্রকাণ্ড চৌকির ন্যায় প্রস্তর খণ্ড গুলির তক্তা কাটিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিতেছে, কোথাও বা দালানের বিম, পিলার, টালি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। কেহবা শিল নোড়া ও দেবমূর্ত্তি খোদাই করিতেছে; অপরদিকে বজরা জনার ক্ষেত্র ও আমগাছ নিমগাছের সরির ভিতর দিয়া বালুকা পূর্ণ নদীর ক্ষীণ রেখা দেখা যাইতেছে।

ষ্টেসন হইতে সোজা কিছুদূর আসিয়া রাস্তাটী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একটী 'ফোর্টের' দিকে, অপরটী টিকোরের দিকে। টিকোরে মুসলমানের কবরের উপর বড় সুন্দর দু'টি মস্জিদ। ঐ স্থান হইতে মস্জিদের গম্বুজের উন্নত চূড়া দেখা যাইতে থাকে।

আমাদের একা ফোর্টের রাস্তা ধরিয়াই চলিল। রাস্তায় দু'একখানি দেবমন্দির আছে; মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কি দেবতা, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া

দেখি নাই, কেবল একটীতে হনুমানজীর মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এইবার আমাদের গাড়ী একেবারে ফোর্টের সন্মুখ দিয়া চলিল; তখন উর্দ্ধ দৃষ্টিতে সকলেই ফোর্ট দেখিতে দেখিতে চলিলাম; উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড প্রাচীর বেষ্টিত ঘরগুলির দিকে দৃষ্টি মাত্রই যেন উহার ভিতরের দৃশ্য দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে আমাদের গাড়ী নিম্ন গামী হইতে লাগিল। এই রাস্তাটী উপর হইতে ঢালু হইয়া জাহ্নবীতীরে নামিয়াছে। এইবার পতিত পাবনী গঙ্গা দর্শন লাভ হইল। এখানকার গঙ্গার পরিসর কলিকাতার গঙ্গাপেক্ষা কম নয়, তবে প্রভেদ এই যে, সেখানকার ন্যায় গভীর নহে এবং ষ্টীমার, লঞ্চ, নৌকা প্রভৃতির উৎপীড়নে গঙ্গাদেবী কর্দ্দমাক্ত বসন পরিধান করেন নাই,—নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক শুভ্র বস্ত্রের ন্যয় ধপ্ ধপ্ করিতেছে।

রাস্তার নীচের দিকে গঙ্গা, অপরদিকে কয়েক খানি দেবালয়; তার পরেই সারি সারি বাঙ্গলা গুলি দেখা যাইতে লাগিল। এক নম্বর, দুই নম্বর করিয়া চার নম্বর 'ক্যাণ্টনমেণ্টের' বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এটি আমাদের আত্মীয়ের বাড়ী বলিয়া এখানেই আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

পরদিন আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। সেখানে বেড়াইবার পক্ষে সাহেব কোয়ার্টার; ফোর্টের দিক ও গঙ্গার ধারের রাস্তাই প্রশস্ত। দুঃখের বিষয়; বজরা ও জনার ক্ষেত্রের আড়ালে গঙ্গা লুক্কায়িত; রাস্তা হইতে আর তাহার তরঙ্গলীলা দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহেব কোয়ার্টারের সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রকাণ্ড ময়দান আছে; সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলা হইয়া থাকে। পশ্চাতের ময়দানে কয়েকটী ইষ্টক স্তূপ আছে; শুনিলাম যে সকল রমণী জ্বলন্ত চিতায় সহমরণ গিয়াছেন, উহা তাঁহাদেরই স্মৃতি স্তম্ভরূপে বিদ্যমান। ঐ স্থানটী "সতী স্থান" বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে।

সাহেব কোয়ার্টারে প্রায় আড়াইশত, তিনশত মেম ও সাহেব বাসকরে; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধ—সৈনিক বিভাগের পেন্সন প্রাপ্ত। বোধ হয় স্বাস্থ্যকর স্থান ও খাওয়া দাওয়া সুলভ বলিয়া অবসরময় জীবন এখানেই কাটাইয়া গোরস্থানে গমনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এখানে গোরস্থান দুটি। পুরাতন গোরস্থানটীর সীমানা শেষ হইয়া যাওয়াতে আর একটী নূতন করা হইয়াছে; সেটিও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

এখানকার অধিবাসীরা সকলেই হিন্দুস্থানী; বাঙ্গালী বাসিন্দা নাই। কিন্তু শীত ঋতুতে বহু বাঙ্গালী হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়া থাকে। চুণারে দুধ, মাছ মাংস ও তরি তরকারী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দুধ টাকায় বার চৌদ্দ সের, এক একটা ছাগলে ও আড়াই সের, তিন সের দুধ দিয়া থাকে। বজরা ও জনারই এখানে প্রধান শস্য; চাল কিছু দুর্ম্মূল্য, দাইলের মধ্যে অড়হড়ের দাইলই উৎকৃষ্ট। এখানকার অধিবাসীরা এক বেলা বজরার ভাত খায়, এক বেলা জনারের ময়দা হইতে রুটী প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকে। রামদানা নামে আর এক প্রকার শস্য, আছে, তাহা ভাজিয়া খৈ প্রস্তুত করা হয়। ছোট, বড় সকল প্রকার মৎস্যই এখানে সুলভ। ইলিস মাছ এক পয়সায় একটী পাওয়া যায়। ভেড়া, পাঁঠা ছাগ প্রভৃতির মাংস তিন আনা, চারি আনা সের। মুরগী, গিনি ফাউল প্রভৃতি ও যথেষ্ঠ পাওয়া যায়। গৃহস্থেরা এই সব পাখী পুষিয়া থাকে, স্ত্রীলোক, পুরুষ সকলেই খুব পরিশ্রমী। তাহারা মিলিয়া কেহ ক্ষেত্রের কাজ, কেহ ফলের বাগান রক্ষা, কেহ বা গরু ছাগল ও পাখী চড়াইয়া বেড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলা স্ত্রীলোকেরা দু'জনে এক জোড়া জাঁতা লইয়া মুখোমুখি হইয়া বসিয়া গম পেষে, ও জাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরিশ্রম লাঘবের জন্য সুন্দর সুর তুলিয়া গান গাহিতে থাকে। ইহাকে তাহারা "গজল" গাওয়া কহে।

চুনারের দর্শনীয় স্থান ফোর্ট, রাম বাগ, আচার্য্য কুয়া, দুর্গাবাড়ী ও মসজিদ। মসজিদটী 'সা-কাসেম সোলেমাণীর দর্গা' নামে প্রসিদ্ধ উহা লোকালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে নিরিবিলি স্থানে। তাহার পশ্চাৎ দিক বেষ্টন করিয়া কুলকুলরবে জাহ্নবীর অনাবিল ধারা বহিয়া যাইতেছে। মসজিদের ছাদে দাঁড়াইলে শীতল সমীরণে মুহূর্ত্তে পথশ্রম দূর হইয়া প্রাণমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সেখানে সন্ধ্যা বেলটী এমন গম্ভীর মূর্ত্তিতে দেখা দেয় যে, মানুষের মন ভক্তি ভরে ভগবানের চরণে নত হইয়া পড়ে। বাস্তবিক ঐ স্থানটী ঈশ্বর চিন্তার উপযুক্তই বটে। মুসলমানেরা যখন নমাজ পড়িতে আরম্ভ করে, তখন কি যে একটা মহান ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহা কেবল অনুভূতির বিষয়, ভাষায় প্রকাশ্য নহে। মসজিদ ও তোরণ দ্বারের প্রস্তর খচিত কারুকার্য্য বহু পূরাতন বলিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি ভস্মে ঢাকা অগ্নির ন্যায় কোন ও কোন স্থান তাহার

লুপ্ত সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মস্‌জিদ প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকের প্রস্তরের প্রাচীর গুলি লৌহ নির্ম্মিত জাল বলিয়া ভ্রম হয়। চুনারের এই মস্‌জিদ ভারতীয় স্থপতি শিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

চূণার ফোর্ট একটী পাহাড়ের উপর স্থাপিত। পাহারটী ত্রিকোণাকারে জাহ্নবীগর্ভ হইতে উথিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। উহার পাদদেশের দের ভাগই জাহ্নবী ধারায় বেষ্টিত। ফোর্টের উপর বসিয়া গঙ্গার পর পারের দৃশ্য, তরঙ্গলীলা ও সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে আত্ম বিস্মৃতি উপস্থিত হয়। ফোর্টের অপর নাম 'চণ্ডাল গড়'। কথিত আছে এইখানে গুহক চণ্ডালের রাজধাণীছিল। বাদসাহী আমলে এই ফোর্ট স্থাপিত হইয়াছে। ফোর্টের ভিত্তি গাত্র-সংলগ্ন একটী সিঁড়ি ও কতকগুলি ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সিঁড়ি নিম্নগামী হইয়া কতদূর গিয়াছে, তাহা দৃষ্টি গোচর হইল না, কেবল চামচিকার বিকট দুর্গন্ধই অনুভূত হইল। শুনিলাম ঐ সিঁড়ি বাহিয়া নামিলেই একটী সুড়ঙ্গ পথ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পথ রাজধানী দিল্লি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, চূণার গড় হইতে গোপণীয় সংবাদাদি ঐ পথেই প্রেরণ করা হইত। একথা কতদূর সত্য তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ সাহস করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া প্রমাণ করিতে পারে নাই। এখন আর গুহকালয় বা বাদসাহের দুর্গের বিশেষ চিহ্ন নাই। কেবল প্রকাণ্ড লৌহ কবাট ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরই তাহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানে চূণারেশ্বরী ও ভর্ত্তৃনাথ দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে। এখন সেখানে শিশু-চরিত্র সংশোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে দশ বৎসর বয়স হইতে পূর্ণ বয়স্ক শতাধিক কয়েদা আছে। তাহারা সকলেই এক একটী শিক্ষাপ্রদ কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। ছোট ছেলেরা লেখা পড়া করে। বয়স্কদের তাঁত বোনা, বেতের ও কাঠের কাজ, চামড়া ট্যানিং, লোহার কাজ, পাথরের এবং মাটির জিনিষ প্রস্তুত করা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। চূণার মৃৎ-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। সেখানে মৃন্ময় ফুলদানী, দোয়াতদানী, ব্র্যাকেট, নানাবিধ সুন্দর সুন্দর খেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এক প্রকার চূণারী সাড়ী প্রচলিত ছিল; বোধ হয় তাহা চূণার হইতেহ আমদানী হইত। গঙ্গায় নৌকা করিয়া ফোর্টের পিছনে গেলে প্রকাণ্ড সুন্দর একটী গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকে।

চূণার হইতে বিন্ধ্যাচল পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় পাহাড়ের মধ্যে দুর্গা বাড়ীর পাহাড়ই বৃহৎ। তদ্ব্যতীত অনেক খণ্ড গিরি আছে। দুর্গা বাড়ীর পাহাড়ের গুহাভ্যন্তরে দুর্গামূর্ত্তি স্থাপিত এবং পাহাড়ের উচ্চ প্রদেশে একটী ডাক বাঙ্গলা আছে। প্রতি বৎসর শীতকালে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে সাত আট শত গোরা শিখ ও গুর্খ্যাসৈন্য এক সঙ্গে আসিয়া পাহাড়ের নীচে ছাউনি করিয়া শিকার ও কুচ কাওয়াজ করিয়া থাকে।

"আচার্য্য কুয়ার" বিষয়ে অসম্ভব একটি কিম্বদন্তি আছে, তাহা বিশ্বাস যোগ্য নয় বলিয়া প্রকাশ করা অনাবশ্যক বোধ হইল। "আচার্য্য কুয়ার" দুটি পুষ্করিণীতে বহু মৎস্য আছে, তাহারা নির্ভয়ে মানুষের নিকট আসিয়া খেলা করিতে থাকে, হাত দিয়া ধরিলেও পলাইবার চেষ্টা করেনা। সেখানে অনেক গুলি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত এবং ঐ মন্দিরের প্রস্তরের কারুকার্য্য ও মনোহর। পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সেখানে একটী মেলা হয়; তাহাতে দেশ বিদেশ হইতে বহুতীর্থ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

আমরা এইসব দেখিয়া শুনিয়া প্রায় দুই মাস কাটাইয়া সকলেই সুস্থ শরীরে সেখান হইতে বেনারস রওনা হইলাম।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ

গ্রন্থ সমালোচনা।

ছেলেদের নূতন গল্প:— শ্রীঅনুকূল চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী ঢাকা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি এই গ্রন্থ দ্বারা কোমল মতি বালক বালিকাদের প্রাণে নীতি শিক্ষার বীজ বপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন,তাঁহার সেশ্রম সার্থক হইয়াছে। গল্প বলিলেই রূপকথা এবং রূপকথা বলিলেই রাজপুত্র ও রাজ কন্যার উৎকট প্রেমের বিকট চিত্র সর্ব্বদা মনে পড়ে। একদিন এই রূপকথায় বাঙ্গালার শিশু-মস্তিষ্ক ক্রমশ গঠিত হইত; এখন সে দিন কাল নাই, অকাল পক্কতা দেশ জুড়িয়া বসিয়াছে সুতরাং সেইরূপ রূপ-কথায় হিতে বিপরীত ঘটিতেছে। সুখের বিষয় সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এই গল্প গুলিতে সেই অপক্ক প্রেমের আবিলতা রাখেন নাই। গল্পগুলিতে নীতির খরস্রোত রহিয়াছে। প্রত্যেকটী গল্প এক একটী নীতির হার। বালক বালিকার হাতে হাতে এ গ্রন্থ শোভা পাইবার যোগ্য। ইহার ছবি সুন্দর, ছাপা উৎকৃষ্ট।

ASUTOSH PRESS, DACCA. ময়মনসিংহে পণ্ডিত সম্মিলন Photo. By R. Dey & Co.

সৌরভ

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

চন্দ্রালোক।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

ধর্ম্মোপদেশে প্রাঞ্জলতা।

সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ে ধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অথবা সামাজিক রীতি-নীতি বিষয়ে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইলে মধ্যে মধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতেও যাইতাম। চোরবাগানের রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া একটী ছোট গলিতে তাঁহার বাসা বাড়ীটি ছিল—ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ;* কিন্তু ছাত্র ও অভ্যাগতে প্রায়শঃ পরিপূর্ণ থাকিত।

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যুক্তি ও তর্কপ্রণালী তেমন পছন্দ করেন না; কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এবিষয়েও অসাধারণত্ব ছিল। তিনি তাঁহার বক্তব্য বেশ হৃদয়গ্রাহী করিতে পারিতেন এবং নানা গল্প ও উদাহরণ দ্বারা উপদেশ বাক্য চিত্তে দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দিতেন। আমার পরে, আত্মীয় কল্প যে সকল ছাত্র এল, এ, বি এ, পড়িবার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমি প্রায়শঃ উপদেশ দিতাম, ধর্ম্মবিষয়ের কোনও সংশয় উপস্থিত হইলে তন্নিরসনার্থ যেন তাঁহারা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। ইহাতে দুই এক জনের উপকারও হইয়াছিল।

---

* ধর্ম্মাত্মা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহোদয় নাকি এই বাড়ী তাঁহাকে দিয়াছিলেন—এখনও তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণেরই দখলে আছে।

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।

তাঁহার একটী গল্প আজিও মনে আছে। কথা হইয়াছিল উপবাসাদি ব্রত নিয়া; যুবকাবস্থায়ই তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য কিনা। তিনি বলিয়াছিলেন "ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ত্যাগ ইত্যাদি কঠিন কার্য্য যাহাতে শারীরিক ও মানসিক বলের প্রয়োজন, তাহা যুবকালেই সম্ভাব্য; বার্দ্ধক্যে শারীরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনেরও বল কমিয়া আইসে। একদিন আকবর সাহের দরবারে একথা উঠিয়াছিল। একজন বৃদ্ধ অমাত্য তদুপলক্ষে তাঁহার নিজের একটী কাহিনী বলিলেন—"একদা যখন আমি নবযুবক, গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া সশস্ত্রে অশ্বারোহণে যাইতেছিলাম; হঠাৎ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিলাম। তৎক্ষণাৎ শব্দ অনুসরণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, একটী শিবিকার মধ্যে বহুমূল্য অলঙ্কার পরিহিতা পরম সুন্দরী কিশোরী আর্ত্তনাদ করিতেছে; তাহাকে ঘিরিয়া লইয়া দস্যুরা তাহাকে অলঙ্কারাদি খুলিয়া দিতে বলিতেছে। আমি অমনি অস্ত্রাঘাতে দস্যুদিগকে বিনষ্ট ও বিতাড়িত করিয়া বলিলাম—ভয় কি মা, বল তোমার বাড়ী কোথায়, সেখানে নিরাপদে পৌছাইয়া দিতেছি। অতঃপর স্ত্রীলোকটীকে আপন আলয়ে নিয়া গেলাম—তাহার আত্মীয় স্বজন প্রভৃত অর্থ পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিলেন, তাহা গ্রহণ না করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু, জাহাঁপনা, বলিতে কি—এখন এই বৃদ্ধ বয়সে মনে হয়, সেই সুন্দরী রমণীটিকেত আমি স্বচ্ছন্দে নিজ বাড়ীতে আনিয়া ফেলিতে পারিতাম! অথবা তাহার অভিভাবক প্রদত্ত অর্থরাশি আনিলেওতো নিজের কত উপকার হইত।" আজ প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের সন্ধিস্থলে পৌছিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপদেশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি।

সর্ব্বান্তঃকরণে ছাত্রহিতৈষণা।

তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বভাবতঃই ছাত্র বৎসল ছিলেন। এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতি তাঁহার স্নেহভাব স্মরণ করিলে আজিও চক্ষে জল আইসে। একটী উদাহরণ কৃতজ্ঞচিত্তে প্রদান করিতেছি। তখন সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছি, নানাকারণে সংস্কৃত সাহিত্যে এম্, এ, দেওয়া ঘটিলনা; কিন্তু মহামহোপাধ্যায়গণের পদপ্রান্তে বসিয়া চিরদিন যে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া ছিলাম, তাহারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ—একটি উপাধি গ্রহণের বাসনা হইল। কিন্তু বিনা পরীক্ষায় উহা গ্রহণের অভিলাষ ছিলনা। তাই মদেকান্তবৎসল পূজ্য-পাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সারস্বত সমাজের উপাধি পরীক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইলাম। কিন্তু

ইহাতে এক বিপত্তি ঘটিল—সম্পাদক বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুরোধ সত্ত্বেও সারস্বত সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—আমি টোলের অধ্যাপকের ছাত্র নই—সেইজন্য আমাকে পরীক্ষা দিতে দিবেন না, এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ভগ্ন মনোরথে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিলাম, তিনি উত্তরে জানাইলেন "আমি টোলের অধ্যাপক; আমি তোমাকে সার্টিফিকেট দিতেছি"। তৎসঙ্গে সঙ্গেই আমি যে তাঁহার নিকটে সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি পড়িয়াছি এতন্মর্ম্মে এক প্রশংসা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার টোলে থাকিয়া পড়িয়াছি কিনা, ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্নের আবির্ভাব দর্শনে পরীক্ষা দিবনা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। ইত্যবসরে মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় টোল পরিদর্শনে ঢাকায় আসেন; সারস্বত সমাজ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনার্থ এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত-সভা হয়; দৈবাৎ তাহাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়েরও শুভাগমন হয়। সভার কার্য্য শেষ হইয়াছে এমন সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় একপ্রকার 'করযোড়ে' সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রার্থনা করেন, যাহাতে তাঁহার এই অকৃতি ছাত্র উপাধি পরীক্ষা প্রদানে অধিকারী হয়। ৺ন্যায়রত্ন মহাশয়ও ইহাতে সমর্থন করায় সেই সভাতে এই নিয়ম হইল যে সংস্কৃত বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র উপাধি পরীক্ষা দিতে পারিবে কিন্তু কোনও রূপ পুরস্কারাদির অধিকারী হইবেনা।

বিত্তশাঠ্য বিমুখতা।

তর্কালঙ্কার মহাশয় পরিচ্ছদ বা ভোজনাদিতে সম্যক্ বিলাসিতা বিবর্জ্জিত ছিলেন; ছাত্রাদির সঙ্গে একইরূপ আহার-অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ট্রেনে চলিতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতেন; চিকিৎসা করাইতে তিনি বড় ভিজিট্ দিয়া সিবিল সার্জ্জন অথবা তৎকল্প ডাক্তার বা কবিরাজ ডাকাইতেন; মাতাপিতার শ্রাদ্ধে তিনি কলেজের সমস্ত অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরি ভোজন করাইতেন; বাড়ীতেও দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকাণ্ডে প্রচুর ব্যয় বিধান করিতেন। ফলকথা তিনি বিত্তশাঠ জানিতেন না। তাঁহার বাড়ীর অবস্থা স্বচ্ছল ছিল; নিজেও বেতন বাবদ এশিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যে, পরীক্ষক হইয়া এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতরূপে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নানাদিক হইতে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেন; তদ্দ্বারা উদরপূরণ অপেক্ষাও পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্তে এবং ধর্ম্ম ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান জন্য খরচপত্র করাটাকে অর্থের সদ্ব্যয় বিবেচনা করিতেন।

প্রহসনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।

তিনি অর্থলোভী ছিলেন না। এতদ্বিষয়ে অবান্তরভাবে কিছু বলিব। তখন কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিষয় কর্ম্মে—ঢুকিয়াছি—কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়াছি। ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম। অমৃত বাবুর লিখিত" কালাপাণি" নামক প্রহসন সে দিন অভিনীত হইয়াছিল। বিলাত যাত্রার আন্দোলনের তখন সূত্রপাত ; ৺ ন্যায় রত্ন মহাশয় ৺ রাজা বিনয়কৃষ্ণের সহায় হইয়াছেন। ঐ প্রহসনে তাঁহারা উভয়েই নায়ক উপনায়ক ভাবে বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। প্রহসনে পণ্ডিতদের সভা বসিয়াছে ; সকলেই টাকা পয়সা টেঁকে বাঁধিয়া "বিলাতগমনং" এর পক্ষে ফতুয়া দিতেছেন ; এক 'বাঙ্গাল' পণ্ডিত কিন্তু কিছুতেই বাগ মানিলেন না—প্রত্যুত টাকার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার টাকার উপর প্র * ব করি—মা কমলা আমার শিরে থাকুন।" কৌতূহল বশতঃ পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আমাদের বরেণ্য অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয়ই এই বাঙ্গাল পণ্ডিত। তবে, অমৃত বাবুর তুলিকায় রংটা একটু গাঢ় হইয়া পড়িয়াছিল ; তর্কালঙ্কার মহাশয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া প্র পূর্ব্বক স্ু পাতুর এতাদৃশ ব্যবহার করিবার পাত্র ছিলেন না। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি"—তিনি এই দলেরই ছিলেন।

সে দিন আমার সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার থিয়েটার দেখা। তাই চিত্তে ঘটনাগুলি দৃঢ় মুদ্রিত রহিয়াছে। বাঙ্গালের ভাষা শুনিয়া দর্শকবৃন্দ হাসিতেছিলেন, বাঙ্গালেরও বাঙ্গাল আমি কিন্তু ভাবিতেছিলাম—যা হউক, এটা বড় শ্লাঘার বিষয় যে এত তেজের কথা বাঙ্গালের ভাষায় বলান হইয়াছে। ধন্য অমৃত বাবু!

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

প্রেমিকা।

তুমি না বাসিলে ভাল কিবা ক্ষতি-তাহে মোর!
আমি তোমা ভাল বেসে—ভাবা বেশে রব ভোর।
কুসুম চয়ন করি শূন্যে ঝরাইয়া দিব,
গ্রহণ করেছ বলি নির্ম্মাল্য তুলিয়া নিব।

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

বাঙ্গলা ভাষা।

বানানের পরিবর্ত্তন।

সংসারে সর্ব্ববিষয়েই পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য এবং অনেক স্থলে বাঞ্ছনীয়। কেননা পরিবর্ত্তনের অভাব দ্বারা জবনী শক্তির নির্ব্বাণোন্মুখতাই সূচিত হয়। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনই শুভলক্ষণ বা উন্নতির পরিচায়ক নহে। সকল ভাষাতেই বানান উচ্চারণানুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু এই সাধারণ বিধির ও বিশেষ বিধি আছে। যে সকল শব্দের উচ্চারণ সর্ব্বত্রই একরূপ সে সকল শব্দের বানান উচ্চারণানুযায়ী হইলে কোনরূপ গোল যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দী ভাষা যেখানেই প্রচলিত আছে সেখানেই বিশ (২০) এবং বিষ (গরল) এই দুই শব্দের উচ্চারণ—বীস। সুতরাং লিখিতও হইয়া থাকে বীস। আসামের সর্ব্বত্রই মাসকে মাহ্ এবং হাঁসকে হাঁহ্ বলে। সুতরাং সে দেশে মাহ্ হাঁহ্ লিখিলে দোষ হয় না। কিন্তু যে দেশে প্রায় সমস্ত শব্দেরই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন উচ্চারণ, সে দেশে প্রত্যেক শব্দের একটা উচ্চারণ আদর্শরূপে স্বীকৃত হইয়া সাহিত্যিক বানানে গৃহীত না হইলে দেশের লোকের সম্পূর্ণ একতা সংসাধন হইতে পারেনা। নাগা দিগের দেশে এক গ্রামের লোক আর এক গ্রামের লোকের ভাষা বুঝিতে পারিত না। গ্রাম গুলির মধ্যে সৌহৃদ্যও তদনুরূপই ছিল; সর্ব্বদাই মারা মারি কাটাকাটি চলিত। কিন্তু শুনিয়াছি যে অঙ্গামী নাগাদিগের ভাষা আদর্শ ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবার পর, তাহাদের মধ্যে অল্পাধিক একতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সৌহৃদ্য ও ভাষার বিভিন্নতা বিষয়ে বাঙ্গালীরা যে নাগাদের অপেক্ষা বহু উচ্চ স্থানে অবস্থিত তাহা নহে। কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের লোকের মধ্যে বঙ্গ বিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণত যেরূপ সৌহৃদ্য ছিল, তাহার উল্লেখ না করাই ভাল। ভাষাতেও তদ্রূপ—এক জেলার ভাষার সহিত অন্য জেলার ভাষার মিল নাই। আমি শ্রীহট্ট ও ঢাকায় অবস্থান করিয়া দেখিয়াছি যে সেই সেই স্থানের প্রাকৃত লোকের পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন আমি বুঝিতে পারি নাই। চট্টগ্রামে কখনও যাই নাই, কিন্তু চট্টগ্রামের অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে থাকিয়া দেখিয়াছি যে তাঁহাদের কথাও বুঝিতে পারি না। যখন অবস্থা এরূপ এবং যখন সমস্ত দেশে একতা স্থাপনের একটা ইচ্ছা সাধারণের মনে প্রবল হইয়াছে, তখন যে সকল শব্দের উচ্চারণ

দেশভেদে বিভিন্ন সেই সকল শব্দের যে বানান বহুদিন হইতে যে আকারে সাহিত্যে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, বা যে বানানের সহিত ব্যুৎপত্তির সাদৃশ্য আছে, অথবা বঙ্গদেশের বাহিরে সেই শব্দের যে বানান প্রচলিত আছে, সেই বানানই বর্ত্তমান সাহিত্যে গ্রহণ করা উচিত। নতুবা ভাষার বিভিন্নতাও অপ-গমিত হইবে না, বঙ্গদেশে জাতীয়তাও সংগঠিত হইবে না। দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। বাঙ্গালা ভাষায় নিজন্ত পদে কলিকাতায় খাওয়ানো করানো প্রভৃতি উচ্চারণ হয়। কোন কোন স্থানে খাওয়ানা, করানা, কোন কোন স্থানে খাওয়ান, করান এবং কোথাও বা (যথা পূর্ব্ববঙ্গে) খাওয়ান্, করান্ উচ্চারণ হয়। সাহিত্যে বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে—খাওয়ান করান ইত্যাদি। সুতরাং বর্ত্তমান সাহিত্যে ও তাহাই থাকা উচিত। এক প্রদেশের ওঝা, উই, উপকথা, লুন, লোনা, প্রভৃতি শব্দ অন্য দেশে রোঝা, রুই, রূপকথা, নোনা, নুন প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হয়। এ সকল স্থলে ও বহুকাল হইতে প্রচলিত বানান ওঝা, উই, উপকথা, লোনা, লুন প্রভৃতিই বর্ত্তমান সাহিত্যেও গ্রহণ করা উচিত। বঙ্গদেশের বাহিরে অর্থাৎ পশ্চিমে ওঝা শব্দ এবং আসামে উই শব্দ প্রচলিত আছে। লুন ও লোনা শব্দের সহিত সংস্কৃত লবণ শব্দের কিছু ঐক্য আছে। সুতরাং অনুরোধ করি, বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের নেতৃগণ এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কোন কোন শব্দের উচ্চারণ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র একরূপ। এইরূপ শব্দের বানান যদি উচ্চারণানুযায়ী করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ দুই একটা শব্দের বানান পরিবর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট গুলিকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া দিলে কার্য্যের সামঞ্জস্য থাকে না বলিয়া আংশিক পরিবর্ত্তন সমর্থন করা যায় না। "কি" শব্দ বঙ্গের সর্ব্বত্রই "কী"রূপে উচ্চারিত হয়। সেই জন্য 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'র কোন কোন প্রবন্ধ লেখক কী লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা কি কেবল "কি"র ইকারই ঈ রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি? যত একাক্ষর বাঙ্গলা বা সংস্কৃত শব্দ আছে, সে সকল শব্দেরই ই এবং উ স্থলে আমরা ঈ এবং ঊ বলিয়া থাকি যথা কি, ই, ঘি, ছি, ঝি ; সু, কু, উ, ফুঁ ইত্যাদি। দুই অক্ষর বিশিষ্ট যে সকল বাঙ্গলা শব্দের একটী মাত্র স্বর উচ্চারিত হয় এবং সেই স্বর যদি ই বা উ হয় তাহা হইলেও আমরা সেই ই এবং উ স্থলে ঈ এবং ঊ উচ্চারণ করি। দুই অক্ষর বিশিষ্ট যে সকল সংস্কৃত শব্দের শেষের অকার সংস্কৃতে

উচ্চারিত হয় কিন্তু বাঙ্গলায় হয় না, সে সকল শব্দের ই এবং উ ও আমরা ঈ এবং ঊ রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি, যথা কিল্, খিল্, হিম, শিব, বিষ, বিশ, দিন, তিন, শিম, চিল, তিল, মিল, ঢিল, শিল, স্থির, ডিম্, টিন, ভিড় ইত্যাদি এবং গুড়, শুড়, শুঁঠ, উট, ফুট, মুট, ভুল, কুল, ভুর, বুক, পুট, বুট, সুর, দুল, খুন, ফুল, লুন, নুন, গুণ, চুল, পুর, সুখ ইত্যাদি। ঋ কে আমরা রি রূপে উচ্চারণ করি বলিয়া ঋণ কে রীণ বলি। কেবল যে সকল দুই অক্ষর বিশিষ্ট সংস্কৃত শব্দে ই কার বা উ কার ভিন্ন অন্য স্বর নাই, সেই সকল শব্দের ই, উ এবং ঋ হ্রস্ব রূপেই উচ্চারিত হয়, যথা নিচ্, উৎ, ঋক্ ইত্যাদি। অতএব দেখা গেল যে—যে সকল শব্দে কেবল একমাত্র ই বা উ আছে এবং অন্য স্বর নাই, সেই সকল শব্দের অধিকাংশেই আমারা ই এবং উ স্থলে ঈ এবং ঊ উচ্চারণ করিয়া থাকি। সুতরাং কেবল কি কে কী রূপে বদলাইলে চলিবে কেন? যদি কেহ বলেন যে "তবে যত শব্দে ই এবং উ ঈ এবং ঊ রূপে উচ্চারিত হয় সে সমস্ত শব্দেরই বানানে ঈ বা ঊ লেখা উচিত"—তাহা হইলেও আপত্তি আছে। যে সকল শব্দ পৃথক থাকিলে আমরা তাহাদের ই এবং উ-কে দীর্ঘ রূপে উচ্চারণ করি সেই সকল শব্দে বিভক্তির চিহ্ন বা অন্য শব্দের যোগ হইলে তাহাদের ই এবং উ কারের উচ্চারণ হ্রস্বই থাকিয়া যায়, যথা "দ্বিবিধ," "সুপাত্র," "বহুদিন," "দিনে দিনে," "দিনের," "কিসে," "কিসের," ইত্যাদি। সুতরাং উচ্চারণানুযায়ী বানান করিতে হইলে এক স্থলে দ্বী, সূ, দীন, এবং আর এক স্থলে দ্বি, সু, দিন লিখিতে হয়। এরূপ করা উচিত কিনা, তাহা যাঁহারা কি কে কী তে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ভাবিয়া দেখিবেন।

কয়েকটা অশুদ্ধ প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দ।

অনেক বিদ্বান্ লেখকও কয়েকটা শব্দের দুষ্ট প্রযোগ করিয়া থাকেন। প্রথম ও মনঃকষ্টের স্থানে আমরা সপ্রথম এবং মনোকষ্ট দেখিতে পাই। যেখানে চেতন লিখিলেই হয়, সেখানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সচেতন লেখেন। যেটা ঠিক্ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় সেটাকে সঠিক করিয়া দেন। ইতঃপূর্ব্বে কয়েক মাস ধরিয়া সঞ্জীবনীতে লিখিত হইত—ইতোপূর্ব্বে।

বাঙ্গলায় অস্বাভাবিকতা।

কর্ত্তা হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং কর্ম্মে তাহার সমাপ্তি। সুতরাং ভাষায় স্বাভাবিক ক্রম এই যে বাক্যের প্রথমে কর্ত্তা, পরে ক্রিয়া এবং অবশেষে কর্ম্ম থাকিবে। কিন্তু বাঙ্গলায় "রাম বধ করিয়াছিলেন রাবণকে" না বলিয়া বলিতে হইবে—"রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন।" লেখাতেও এইরূপ অস্বাভাবিকতা আছে। ক+আ অথবা া=কা ইহা স্বাভাবিক ক্রম। ক+ই বা ি=কি এবং ক+এ বা ে=কে হয়। কিন্তু ি এবং ে কোন্ যুক্তির বলে পূর্ব্ব বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়?

উল্টা পাল্টা।

কেবল যে বাঙ্গলায়ই এরূপ উল্টা পাল্টা হয় এরূপ নহে। ইংরেজীতে লেখে what, where, whence ইত্যাদি কিন্তু পড়ে hwat, hwere, hwence ইত্যাদি। প্রভেদ এই যে ইংরেজীতে সংশোধনের উপায় আছে কিন্তু বাঙ্গলায় কি এবং কে র স্বর ও ব্যঞ্জন বোধ হয় কোনকালেই যথা স্থানে অবস্থাপিত হইবে না। কোন কোন শব্দের উচ্চারণ আমাদের শুদ্ধরূপে হয় না বলিয়া বানান উল্টা বোধ হয়, কিন্তু এসকল স্থলে বানানের দোষ নাই, আমাদের উচ্চারণেরই দোষ। যথা আমরা হ্রদকে র্হদ এবং জিহ্বাকে জিব্‌হা বলি। (পূর্ব্ব বঙ্গে এবং মিথিলায় আবার জিব্‌ভা বলে)।

কলিকাতা অঞ্চলের অশিক্ষিত লোক বাতাসাকে বাসাতা, বাতাসকে বাসাত বলে; বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই নূতনকৈ নতুন এবং আশুধানকে আউশধান বলে। কলিকাতা নিবাসী এক বিখ্যাত স্বর্গগত গণিতাধ্যাপক দরোয়ানকে দওরান এবং গাড়োয়ানকে গাওড়ান বলিতেন। একদিন তাঁহার এক সহাধ্যাপক তাঁহাকে উক্তরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"হঠাৎ বেইরে পড়ে।" পূর্ব্ববঙ্গে আটিয়া কাগমারিকে আইটা কাগমারি বলে। অশিক্ষিত হিন্দুস্থানীরা রুমালকে উরমাল বলে। ইয়োরোপে Thiaca কে Ithaca বলে। কি নিয়মে এবং কি কারণে এইরূপ উল্টা পাল্টা হয়, তাহা বুঝা যায় না। হয়ত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় নিয়ম ও কারণ উভয়ই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

৺মনোমোহন সেন।

হে সুহৃৎ! প্রিয়বন্ধু! প্রিয় কবিবর!
কি মোহ জানিতে তুমি হে মনোমোহন!
নন্দনের ছন্দে গড়া হৃদয় সুন্দর,
মন্দার মদিরা দিয়া ভুলাইতে মন!

রোগে শোকে শত দুঃখে ব্যথা বেদনায়,
ভুলিয়াছি সর্ব্বদুঃখ তোমার মিলনে,
মুগ্ধ হইয়াছে প্রাণ স্নিগ্ধ মমতায়
কি জানি কি মোহ মূর্চ্ছা স্বপ্ন জাগরণে!

সেই মোহ সেই মূর্চ্ছা সেই বিহ্বলতা,
সেই আজ আত্মহারা হৃদি মুহ্যমান,
বুঝিনা কি শোক দুঃখ বুঝিনা কি ব্যথা,
মিলন বিয়োগ তব একই সমান!

জীবনে মরণে তবে কিছু নাই ভেদ?
মাঝে ভুল ব্যবধান! ঐ টুকু খেদ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

নারী।

সোণার কমল,

মা, তু'এর পাখা খানি তো অনেক দিনই পাইয়াছ। উপাধির পাখা খানি পাইতেও অধিক বিলম্ব নাই। অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতায় তুমি যেরূপ অগ্রসর হইয়াছ তাহাতে বঙ্গ-মহিলার উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলোচনার পথ সুগম হইয়াছে। সেই আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে আমার আরো একটা বিষয় বুঝাইতে হইতেছে—নারী কি?

বিশ্বসৃষ্টিতে নারী এক অপূর্ব্ব বস্তু। যেমন গোতের মতে "শকুন্তলা" বলিলে জগতের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সর্ব্বোত্তম, সমস্তই বলা হয়, তেমনি নারী বলিতে বসুন্ধরার এক বিস্ময়কর নির্ম্মাণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা হয়।

এখন নরনারীর প্রভেদের কথা তুলিতে হইতেছে। মনু বলেনঃ—দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোহভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ। বাইবেলও সেই কথার প্রতিধ্বনি করিতেছে। Charlotte Bronte র Jane Eyre তুমি আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়াছ; গ্রন্থকর্ত্রীর জীবন চরিতের সহিতও তুমি পরিচিত। Bronte এবং তার ভাই ভগ্নি সকল যখন অতি ছোট, তখন তাহাদের পিতা এক দিন পাঁচ বছরের একটী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেনঃ—স্ত্রী এবং পুরুষের মানসিক বৃত্তির প্রভেদ বুঝিবার উপায় কি? এই ভাই ভগ্নি গুলিন্ অতি শৈশবে অত্যধিক মাত্রায় সুপক্ক বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বালকটী উত্তর করিলঃ—"By considering the difference between them as to their bodies." শিশুর উত্তর উপেক্ষার বিষয় নহে। মাতা কখনও পিতা হইবেন না, চন্দ্র কখনও সূর্য্য হইবে না; লতা কখনও শাল তরু হইবেনা; জল কখনও স্থল হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষায় পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ বলিয়া বালকের উত্তরে ক্ষুণ্ণ হইও না। "Nature has said to man, Be a man; to woman, Be a woman; and you will become the divinity of life." Lamartine এর এই রূপ উত্তম উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও নরী কি তাহা সম্যক বুঝাইবার উপায় নাই। এই জন্য বলিতেছিলাম—নারী জগতের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। বিস্ময়কর হইলেও বুঝিতে হইবে, বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এমন বহুজাতি জগতে ছিলেন যাঁহারা নারীর আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। এখনও পৃথিবীতে নারীর প্রকৃতি, পদস্থ এবং অধিকার লইয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। তোমাকে আমি এই দ্বন্দ্বব্যূহে প্রবেশ করিতে বলি না। বহু গ্রন্থ হইতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া ডাকমাশুলে পোষ্টাফিসের আয় বৃদ্ধি করিতেও ইচ্ছা রাখি না।

Homer, Dante, Shakespeare, Tennyson যে সকল কাব্যে মহিলাগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তার প্রায় সবগুলি তুমি পড়িয়াছ। জগতে নারী-চরিত কি রূপে কোন্ পথে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য ঐ সকল কাব্যের সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, শকুন্তলা, Mill's Subjection of women, Lecky's History of European Morals vol; II, chap. V. Mrs. Ellis কৃত The mothers of greatmen, "The women of England; Tod's Rajsthan.

Schiller এবং Andrew Lang কৃত Joan de Arc তোমাকে মন দিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। সব দেশের মাহিলা-চরিত অধ্যয়ন করিতে বলিতেছি, কেন না পূর্ব্বে এক পত্রে লিখিয়াছিলাম—সমন্বয় করিতে হইবে, সংহার কিম্বা আমূল বিপর্য্যস্ত করা সম্ভবপর নহে। এই সকল পড়িয়া নারী সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা হইবে উহাই তোমার পক্ষে নারীর যথার্থ ধারণা,—তোমার মত শুভ্র হৃদয়ে নারীর অতি শুভ্র সুন্দর প্রতিচ্ছায়া।

সামান্য তৃণ খণ্ড দগ্ধ করিতে অসমর্থ দেবতাদিগের দৈন্য বুঝাইবার জন্য যিনি উমা মহেশ্বরী রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি এই নারী। সিংহ পৃষ্ঠে দুর্গা, দুর্গতি হারিণী—তিনি এই নারী। বীণা-রঞ্জিত-পুস্তক-হস্তে—তিনিই এই নারী। "Administering Angel thou"—তিনি এই নারী। কদাকার কুপুত্রের মুখ হইতে যে "মা" নাম উচ্চারিত হয় তাহা কখনও কু বা কদাকার নহে। মা নাম শ্বেত কৃষ্ণ অভেদে সুন্দর ও মধুর। যিনি মা, তিনিই এই নারী। "মার্জ্জনা" ও "ক্ষমা"—আগে মা, পাছে মা, তিনিই এই নারী। বঙ্কিমচন্দ্র, অতর্কিতে গঙ্গাজলে মায়ের পাদোদক লইয়া ছিলেন; মা ভীতা হইয়া বলিয়াছিলেন—"কি গঙ্গাজলে আমার পা ঠেকালি।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "মা তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড়!" বঙ্কিম-সেবিতা, সুর-নর-বন্দিতা মা এই নারী। পুরুষ এবং প্রকৃতি—পৌরষ এবং সহিষ্ণুতা। হাতুড়ি—যা দিয়া পিটে, তার বলই অধিক, না,—নেহাই যাহার উপরে রাখিয়া পিটে, তাহার শক্তি ও মহিমা অধিক. সে পরীক্ষা সংসারের তপ্ত লৌহাগারে নিত্য হইতেছে, তোমারা তাহা প্রণিধান করিও। "যা দেবী সর্ব্ব ভুতেষু" হইতে আরম্ভ করিয়া "শান্তি রূপেণ সংস্থিতা" চরণে চণ্ডী সমাপ্ত করিতেছি। সোণার কমল! নারী কত মহীয়সী আমি তার কি বুঝি, কিইবা বুঝাইব? মায়ের রূপ ব্যাখ্যা করিতে নাই। তোমার অতুলনীয় রূপ দর্পণ ধরিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারিবে না—নারীর স্বরূপ কি। দর্পণে রূপ ধরে, গুণ ধরে না।

তোমরা কর্ত্রী, পুরুষ পরিচারক মাত্র। কেশবচন্দ্রের কথায় বলিতে গেলে "Man is always in the objective case governed by the active verb woman। পরলোক-প্রস্থানোন্মুখ কাকা সকাতরে এই প্রার্থনা করেন—নারী হইতে যেন সংসারে কোন আশান্তির সৃষ্টি না হয়।

তোমার চির স্নেহানুগত কাকা

নীলাতঙ্ক।

বাঙ্গলার নীলের চাষ এক কালে চাষী প্রজার বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল। তৎসাময়িক চিত্র অঙ্কিত করিয়া নীলদর্পণ নাটক লিখিয়া স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর নীলকর দিগের চক্ষু শূল হইয়া ছিলেন। বর্ত্তমান সময় চা কর দিগের উৎপাতের কথা শুনা যায়, কিন্তু নীলকর দিগের উৎপাত তার চেয়ে শতগুণে বেশী ছিল। ময়মনসিংহ জেলার দুই একটী নীলকর সাহেবের কাহিনী বিবৃত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মেঃ ওয়াইজ (জি, পি, ওয়াইজ) বা ওয়াইস সাহেব ভারত প্রবাসী বিলাতি সাহেব ছিলেন। তিনি ঢাকায় বাস করিতেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় তাঁহার নীলের কুঠি ছিল। এই সকল কুঠিতে নীল প্রস্তত হইত, নীলকুঠির ম্যানেজার একজন সাহেব থাকিতেন। তাঁহার অধীনের দেওয়ান, নায়েব প্রভৃতি উপাধিধারী জীব হইতে ক্ষুদ্র পাইকেরা পর্য্যন্ত লোকের উপর দৌরাত্ম্য করিত। ইহাদের জ্বালায় কাহারই ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি নদীতীরে নীলকুঠি ছিল।

নীলের বীজ বাঙ্গলায় হয়না। উহা ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত হয়। নদীর চরভূমিতে নীল বপন করা হয়। প্রথমে সামান্য চাষ করিয়া পরে বীজ বপন করিতে হয়। চাষের সময় একবারে বহু লাঙ্গল একত্র হইয়া জমি প্রস্তত করে। এই সকল লাঙ্গল নিকটবর্ত্তী প্রজাদের নিকট হইতে জবরদস্তী করিয়া লওয়া হইত। তার পর নীল গাছ কর্ত্তনের সময় আর একবার জুলুম। যখন জমিতে একটু একটু করিয়া জল হয়, জলে গাছের মূল যখন ভিজাইয়া দেয়, তখনই তড়াতাড়ি করিয়া গাছ কাটিয়া ফেলিতে হয়। জল ২।৪ দিন গাছের মূলে জমা থাকিলে গাছ নষ্ট হয় ও মাল কমিয়া যায়। এই সময় তাড়াতাড় গাছ কাটিবার জন্য জুলুম করিয়া লোক নেওয়া হইত। নিঃসম্পর্কীত পথিকেরও তখন নিস্তার ছিল না। পথে বসিয়া তাহাদিগকেও নীলের গাছ কাটিয়া দিয়া যাইতে হইত। যাহারা লিখা পড়া জানিত, তাঁহাদিগকে নীলের আটী বাঁধা ও চাকরের হাজিরা ইত্যাদি লিখার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত। এই সময় সহস্রাধিক লোক একত্র কুঠিতে বসিয়া আহার করিত। সামান্য মাত্র আহার পাইয়া রাত্র দিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিতে হইত। বেতন মোটেই দেওয়া হইতনা। এই সকলকে বেগার কহিত।

বেগারেরা প্রাতে আসিয়া হাজির হইলে একমুষ্টি চিড়া ও এক টুকরা গুড় দিয়া কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইত—তাহারা চিপিটক উদরস্থাৎ করিতে করিতে বেগার খাটিতে থাকিত। ইহারপর বেলা ২টার সময় অন্নাহার ও তৎপর সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে আবার অন্নাহার। একটা বৃহৎ গুদাম গৃহে রাত্রি শয়নের ব্যবস্থা হইত।

নীল গাছগুলি আঁটি বাঁধিয়া আনিলে, তাহা চতুর্দ্দিকে পাকা দেওয়ালের ভিতর আবদ্ধ জলে ভিজান হয়। তারপর এগুলিকে বড় বড় লোহার তক্তা ও তীর দিয়া চাপ দেওয়া হয়। তারপর নল দিয়া জলটা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই জলটা ঘন হয়, তারপর ঐ জল বড় বড় কড়াতে জ্বাল দেওয়া হইলেই নীল হইল। এই নীল তক্তায় ঢালিয়া কাটিয়া কাঠি প্রস্তুত করিতে হয়, পরে এই সকল কাঠি সিন্দুকে বোঝাই করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী করা হইত। এই সকল কার্য্য অতি তাড়া তাড়ি সম্পন্ন করিতে হয়। এমন সময়ও পড়ে যে সারাদিন ও রাত্রি ক্রমাগত কাজ করিতে হয়। তখন কুঠির ম্যানেজার হইতে পাইক পর্য্যন্ত সকলেই কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে।

নীল কুঠির কোন দেওয়ানের একখানা পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহা বেগারী হাল লওয়ার ও পরের জমি জবরদস্তী করিয়া চাষ করিবার আদেশ পত্র। দেওয়ান এই সকল জমি চাষের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। জমির মালিককে তাহারা খাজানাটা মাত্র দেওয়া হইত।

দেওয়ান মহেশচন্দ্র দে ওরফে মহেশ দেওয়ান যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহার অবিকল পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হুকুম নামা:—

পরাণ সরদার জানিবা—

৬৩ গ্রামের ২৩ মজুমদারের ৩১।৬৫ পুর গ্রামের জমিতে নীল চাষ হইবে। তুমি দশ কুড়ি লইয়া হাজির থাকিবা।"

এই হুকুমনামায় মহেশ দেওয়ানের দস্তখত আছে। কিন্তু স্বাক্ষর দেখিয়া নামের পরিচয় করিবার সাধ্য নাই! যাহারা এই সকল হাল ও লোক বেগার আনিয়া দিত তাহাদিগকে সরদার বলিত। ৬৩ গ্রাম অর্থাৎ বেভাগরি গ্রাম, ২৩ মজুমদার,—গোপীনাথ মজুমদার ৩১।৬৫ অর্থাৎ চর মধুপুর গ্রাম। দশ কুড়ি অর্থাৎ দুইশত হাল—কম কথা নহে! ইহা পূর্ব্ব

দিনই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত। কেহ বেগার দিতে অসম্মত—সরদার এইরূপ দেওয়ানের কাছে এতলা করিলে তাহার উপর "বিষম হুকুম" জারী হয়; তৎপর লাঠিয়ালেরা তাহার বাড়ী চড়াও করিয়া তাহার সর্ব্বস্বান্ত করে ও তাহাকে বাঁধিয়া কুঠিতে হাজির করে; এবং অপরাধ বিবেচনায় সে কুঠিতে কয়েদ থাকে। সুতরাং এই সকল লাঞ্ছনার ভয়ে কেহ আর বাধা দিত না। এই সকল গুজব যেরূপই হউক না কেন, কুঠিয়ালের অত্যাচার সর্ব্বত্র অব্যাহত রূপে চলিত। সালটীয়ার ভোলানাথ চাকলাদার ও বেতাগরির গোপীনাথ মজুমদার স্বীয় প্রজা দিগকে রক্ষা ও অন্যান্য উপদ্রব হইতে লোককে বাঁচাইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া প্রতিনিয়ত কুঠিয়াল সাহেবের সঙ্গে লড়াই করিয়াছেন। এই সকল করিয়াও দেশে শান্তি আনয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের হইয়া কেহ দু'টী কথা বলে এমন লোকও তখন তাহারা পাইলেন না। ভোলানাথের ও গোপীনাথের লোকেরা কুঠিয়ালের লোক পাইলেই মার ধর করিয়া তাড়াইয়া দিত। সময় সময় খণ্ড যুদ্ধও হইত।

এই সময় দেশে মুজরাই জমী দিয়া জমিদার, তালুকদারেরা লাঠিয়াল রাখিতেন। জমী, বাড়ীর খাজানা দিতে হইত না, প্রয়োজন মত রায়তেরা জমিদারের হইয়া লাঠিয়ালী করিত। এবং এইরূপ খণ্ড যুদ্ধে বহু লোক হত ও আহত হইত।

ওয়াইজের নাম এই সময় এইরূপ আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল যে, রুরুদিবু বালক বালিকা ওয়াইজের নামে ভয়ে মাতৃ অঞ্চল ধরিয়া চুপ করিত। শিশুকে ওয়াইজের নীলের গান শুনাইয়া ঘুম পাড়াইবার ব্যবস্থা হইত। আগামীবারে নীলের গান ও সমাজের তৎকালীন অবস্থা বিবৃত করিব।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ।

অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত ধ্বনি

(ভৌতিক কাণ্ড ।)

ঢাকার ৪।৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে অম্রপুর গ্রামে 'রামনিবাস' নামে একটী বড় পাকা বাড়ী আছে। গত আশ্বিন মাসে সংবাদ পাইলাম—ঐ বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ বিশেষতঃ বিজয়া দশমীর দিন নানা ভৌতিক কাণ্ড হইয়া থাকে। ভৌতিক কাণ্ড দেখিবার কৌতূহল কাহার না আছে! আমি অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছি। প্রেত-তত্ত্বের আলোচনা আমার এক প্রধান কার্য্য। রামনিবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সাক্ষী রাখিয়া দেখা ভাল। সঙ্গী লইলাম জিতেন্ ও পরেশকে।

প্রত্যুষে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া আমরা তিনজনে এক খানা ডিঙ্গি নৌকায় চলিলাম। খাল বাহিয়া যাইতে হয়। খালে খুব স্রোত; এক জন মাঝি। এক জনেই ডিঙ্গি খুব চলিল। আমরা ৮ টার সময় রামনিবাসের ঘাটে পঁহুছিলাম। খালের ঘাটটী সিঁড়ি বাঁধা হাসির মতন শাণে বাঁধা—ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। আমরা ডিঙ্গি হইতে নামিয়া ঘাটের চতলে উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—পূবের পারে আকাশ মুক্ত, দাইনে বাঁয়ে বহু দূর বিস্তৃত সবুজ সাগরের মতন ধানের খেতে মৃদু বাতাসে ঢেউ খেলিতেছে। পশ্চিম দিকে একটু অগ্রসর হইয়াই দুধারে সারি সারি অশ্বত্থে আচ্ছাদিত এক নিশিড় ছায়া যুক্ত প্রশস্ত পথ। পথে পাথর বসানো। প্রতি পাথরে "রাম' নাম খোদা। পরেশ পাথর গণিয়া পা ফেলিয়া চলিল। আমি নির্ম্মাতার উদ্দেশ্যের বিপরীতে সাবধান হইয়া চলিলাম—নামে যেন পা না পড়ে। জিতেন কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহার হাতের লাঠিটা পথরে খটর্ খটর্ করিয়া চলিল। কতকক্ষণ চলিয়া পরেশ বলিল—এক হাজার পাথর—এক হাজার ফুট; পাশের ৩০ দিয়া গুণ করিলে ৩০ হাজর পাথর। তখন আমরা এক ফাঁকায় আসিয়া পঁহুছিয়াছি। বোধ হইতে লাগিল যেন আমরা একটা টানেল্ পার হইয়া আসিলাম। সম্মুখে তাল গাছের সারি মাথায় পাগড়ী প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। উপযুক্ত ব্যবধান রাখিয়া তার পরের সারি নাগেশ্বর; তারপর চাঁপা; তারপর কাঞ্চন; তারপর করবী; শেষ পুংক্তি স্থল পদ্মের। প্রচুর শ্বেত স্থল পদ্ম ফুটিয়া ধীরে ধীরে লাল হইয়া

আসিতেছে। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন শত সহস্র বাগ্দেবীর শ্বেত—শুভ্র মুখচ্ছবি আতপ তাপে আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে। বাণী বন্দনায় আমরা কিছুক্ষণ তন্ময় হইয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই স্থল পদ্মের সারি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একটী প্রশস্ত পথ। এই পথে অগ্রসর হুইলেই রামনিবাস ভবন। প্রকাণ্ড দ্বিতল সৌধ। কিন্তু সুধার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। শেওলায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই অট্টালিকার উপর দিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের একটী প্রকাণ্ড শাখা বিশাল দৈত্যের মতন হাত বাড়াইয়া আছে। দোতালার কপাট জানালা সব বন্ধ। সম্মুখের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া কোন জন মানবের সাড়া পাইলাম না। ভৌতিক শক্তির ক্রিয়ার যেন এখানেই সূত্রপাত হইল। শরীর কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল। আঙ্গিনার দক্ষিণ দিকে একটু অগ্রসর হইয়া একটী সংকীর্ণ দুয়ারের মধ্য দিয়া দেখিলাম, ভিতরের দিকে প্রাচীর-আটা আঙ্গিনায় কয়েকটী লোক কথা বার্ত্তা বলিতেছে। উঁকি ঝুঁকি দিতে দেখিয়া এক জন বৃদ্ধ আসিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধের পায়ে খরম, গায়ে গৈরিক বস্ত্র, কান্তি গৌর, শ্মশ্রু দীর্ঘ এবং শুভ্র। তিনি বলিলেন 'এই দিকে আসুন।' আসুন বলিয়া আমাদিগের জুতার দিকে বার বার তাকাইতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া জুতা খুলিয়া ফেলিলাম। এক জন ভৃত্য আসিয়া জুতা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। বৃদ্ধ অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে ঐ আঙ্গিনায় লইয়া গেলেন।

রামনিবাসের সম্মুখের আঙ্গিনা যেমন পাথরে বাঁধা, ইহাও তেমনি। মধ্য স্থানে একটী সমাধি। উহার চারিদিকে ছোট বড় ফুলের গাছ। অদূরে বসিয়া কয়েক জন লোক রক্ত চন্দন ঘসিতেছে। সম্মুখে অনেকগুলি তামার টাট।

বৃদ্ধ বলিলেন—"দু'বৎসর হইল রামশরণ বাবুর স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার আদেশ মতে আজ কুমারী-পূজা! আপনারা স্নান আহার করুন। যে জন্য আসিয়াছেন ক্রমে তাহা দেখিতে পাইবেন।"

এক জন ভৃত্য তৈল তোয়ালিয়া এবং তিন খানি কোঁচান নুতন ধুতি আনিয়া দিল; তৈল মাখা হইলে ঐ আঙ্গিনার পাশের পুকুরে লইয়া গেল। পুকুরটী ছোট হইলেও অতি সুন্দর। স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলাম ঐ সমাধির চারিদিকে নানা রঙ্গের শাড়ী-পরা চার হইতে চৌদ্দ বছরের কুমারী সকল এক এক আসনে বসিয়া আছে। প্রত্যেকের সম্মুখে

এক একটী দীপ ও ধূনচী। ধূপের সুগন্ধ শুভ্র শিখা, বেড়িয়া বেড়িয়া আকাশে যেন কাহার উদ্দেশ্যে উড়িয়া যাইতেছে। দীপ গুলি সূর্য্যের আলোকে এবং এই সুন্দরী কুমারীদের পাশে বলিয়া অতি মলিন দেখা যাইতেছে।

বৃদ্ধ আসিয়া প্রত্যেক কুমারীর পায়ের তলে ভক্তি সহকারে সগু রক্ত-চন্দন-মাখা এক এক খানি টাট পাতিয়া দিলেন, কপালে রক্ত চন্দন মাখাইলেন। প্রত্যেকের পায়ে স্থলপদ্মের অঞ্জলি এবং প্রত্যেককে এক একটী ফুলের তোড়া দিলেন। সঙ্কোচে অনেক কুমারীর মুখ স্থলপদ্মের মতন লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ সাত বার সমাধি প্রদক্ষিণ করিলেন। কুমারীদিগকে একবার। এক জন ভৃত্য একখানা খাতা ও একটী কৌটা লইয়া আসিল। বৃদ্ধ কৌটা হইতে সোণার অঙ্গুরী বাহির করিয়া খাতা দেখিয়া ১০। ১২টী কুমারীর হাতে পরাইয়া দিলেন। কৌটায় অনেক সাইজের অঙ্গুরী ছিল; বাছিয়া দিলেন—সকলেরই আঙ্গুলে উত্তম মানাইল। আমি একটী অঙ্গুরী চাহিয়া লইয়া দেখিলাম—ছাপে লেখা "সেবা"। বৃদ্ধের দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন—"সব কথা পরে হইবে।" এই বলিয়া তিনি সমাধির সম্মুখে সাতবার এবং কুমারীদের সম্মুখে এক বার প্রণত হইলেন। বার বার পড়িতে লাগিলেন—"যা দেবী সর্ব্ব ভুতেষু স্নেহ রূপেণ সংস্থিতা।"

বৃদ্ধকে অন্য কোন মন্ত্র পড়িতে শুনিলাম না! ইহাই সম্ভবত এক মাত্র মন্ত্র। এক জন ভৃত্য একটী সোণার কৌটা লইয়া আসিল। টাটের চন্দর তখন শুকাইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ প্রত্যেক টাট হইতে চন্দন-রেণুগুলি ঐ কৌটায় তুলিয়া লইলেন। কৌটার উপর এক টুকরা কাগজে লিখিলেন—দ্বিতীয় বর্ষ ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩১৯।"

ইহার পর সব কুমারী আসন ছাড়িয়া উঠিল; রামনিবাসের উপরের তলায় ভোজনার্থ চলিয়া গেল। আমরা জলযোগের জন্য যাহা পাইলাম তাহা প্রচুর ও উপাদেয়। অনুমান করিলাম কুমারী-ভোজন কুমারী-পূজার অনুরূপেই হইয়াছে। কুমারীগণ আহার করিয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। আমাদের মধ্যাহ্নের আহারও অতি উত্তম হইল। আমাদের জন্য একটী কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা যাইয়া সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ একবার আসিয়া বলিয়া

গেলেন—"মাঝিকে খাবার পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" জিতেন ও পরেশ ঘুমাইয়া পড়িল। আমার নিদ্রা আসিল না।

যখন ৩।৪ দণ্ড বেলা আছে। তখন আর দুজন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ আমাদের পাঁচ জনকে লইয়া প্রথমতঃ উপর তলায় গেলেন, দুয়ার জানালা খুলিয়া দিলেন। ঘরটী অতি প্রশস্ত। ঘরের সমস্ত আয়োজন পত্র অতি পুরাতন। পুরাতন খাটের পুরাতন ঠ্যাং দড়ি ও বাঁশ দিয়া বাঁধা। দেয়ালে একটী বাজা-ঘড়ী—উহার মেহগনির বার্নিস চটিয়া গিয়াছে। এক দিকের তাকে সারি সারি ছোট বড় চটি জুতা—কত কালের কলিকাতার ও কটকের। হাফ বুট ও ফুল বুট জুতা বাঙ্গালার ও বিলাতের সারি সারি সাজান রহিয়াছে। অন্যদিকে কতগুলি ঢাল, তরোয়াল, তীর তূণ ও সড়কী। এক পাশে একটী আলমারিতে কতকগুলি শিশি ১, ২, ৩, করিয়া নম্বর দেওয়া। শিশির মধ্যে কিছু কিছু ধূলা। একটী সোনার কৌটায় এক গাছি চুল এবং একটী সোণার তার। একটী বাক্সে কতকগুলি শুকনো ফুল। দেয়ালে রামশরণ বাবুর একখানা তৈল চিত্র—সুগঠিত সুপুরুষ, বার্দ্ধক্যেও পৌরষ-চিহ্নের অপচয় হয় নাই।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ আমাদিগকে ছাতে লইয়া গেলেন। প্রশস্ত ছাতে একখানি সুপ্রশস্ত আরসি পাতা। আমরা পাঁচ জনে দাঁড়াইয়া উহাতে মুখ দেখিতে লাগিলাম। আরসির স্থানে স্থানে যেন রামশরণ বাবুর মুখ দেখা দিতে লাগিল। পরেশের এবং অপর দুটী বাবুর মুখে খুব ভয়ের চিহ্ন। অদূরে গাছের পর গাছের সারি; মাথার উপর ঘন পল্লবিত অশ্বত্থের শাখা। আকাশ ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। আমরা নামিয়া নীচে আসিব, এমনি সময় মচ্ মচ্ করিয়া জুতা পায়ে যেন একজন কে, বীরদর্পে ছাতে উঠিয়া আসিল। দৈত্যের মত অশ্বত্থের শাখাটা সজোড়ে সঘন নড়িয়া উঠিল। একটা অগ্নিমুখ তীর ছাত হইতে নক্ষত্র বেগে পূবের আকাশে ছুটিয়া গেল। পরেশ তখন কাঁপিতেছিল। আমি তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। এই সময় নাঁকি সুরে শুনা গেল—

শঙ্করী (অস্পষ্ট) উড়িবে।
(অস্পষ্ট) নখে তুলে লবে॥
(অস্পষ্ট) মা আমার, যখন যাবে গো পরাণি।
কৃপা করে (অস্পষ্ট) রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

অশ্বত্থের ডালটা আবার নড়িয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরেই ঐরূপ স্বরে শুনা গেল "শেষের সে দিনে (বুঝা গেলনা) উঠিবে পুলকে জাগিয়া।" তারপর কাতর কান্না। অবশেষে

ধ্বনি—মা—মা—মা—

উত্তর—বাবা—বাবা—বাবা ; কাকা—কাকা—কাকা

বাবা, কাকা শব্দের স্বর ভিন্ন হইয়াও এক—বড় মধুর। মা-মা-মা অতি সকরুণ।

আবার ডাল নড়িয়া উঠিল। আবার ছাতে জুতার শব্দ হইতে লাগিল। আবার তীর ছুটিল। ছাতে দাঁড়াইতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। আমরা শুকনো গলায় বৃদ্ধকে বলিলাম "নীচে লইয়া চলুন।" বৃদ্ধ দোতালায় সেই কামরায় লইয়া গেলেন। কামরায় বাতি জ্বলিতে ছিল। আমরা উপস্থিত হইবা মাত্র বাতি হঠাৎ নিবিয়া গেল। বৃদ্ধ আমাদিগকে পাশের একটী ঘরে লইয়া গেলেন। সে ঘরে বাতি ছিল। বাতিতে ভয় গেল না ; সকলে আরষ্ট। কি আশ্চর্য্য! বড় কামরার মেজেতে দেখিলাম রামশরণ বাবু দাঁড়াইয়া—তাঁর এক হাতে সোণার তার, আর এক হাতে কালো চুল। আঁধারে কাল চুল ও সোণার তার দেখিতেছি কি করিয়া? কিন্তু দেখিতেছি।

রামশরণ বাবু চুলে ও তারে হাত ফের করিতেছেন। আর যেন অতি নিবিষ্ট হইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, সোণার তার সুন্দর, না কালো চুল সুন্দর। তৎপর কিছু দেখা গেল না। অল্পক্ষণ পরে একটা আলমারীর কপাট খুলিয়া গেল—একটা শিশি খুলিবার শব্দ হইল। খস্ খস্ শব্দ হইতে লাগিল কিছু মাখার মতন। কয়েকটা শব্দ শুনা গেল—'ধূলি' 'চন্দনে', 'পদচিহ্ন'।

রামশরণ বাবুর বাবড়ী চুল। আবার তাঁকে দেখা গেল। কাচের চুড়ি-পরা রোগে শীর্ণ একখানি হাত, রামশরণ বাবুর মুখের উপরের আলু থালু বাবড়ীর গোচ্ছা সরাইয়া দিতেছে। সহসা ধ্বনি হইল—'মা—মা—মা উত্তর—বাবা—বাবা—কাকা কাকা কাকা এই যে আমি।'

পরেশ ও অপর দুটী বাবু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জিতেন না পড়িলেও প্রায় সংজ্ঞাহীন। হঠাৎ ঐ বড় ঘরের বাতিটা জ্বলিয়া উঠিল। এদিকে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহার হাতে কমণ্ডুল হইতে তিন জনের চোখে মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উহাদের চৈতন্য হইল। ওদিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ধপ্ করিয়া একটা ঝুড়ি আসিয়া মেজেতে পড়িল।

এগিয়ে যাইয়া দেখিলাম—কার্ত্তিক মাস কিন্তু ঝুড়ি ভরা পাকা আম। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কলিকাতায় হোসেন খাঁ এবং চট্সাইর বেদানা সন্দেশ অনেক বৈঠকে অ দিনে অ বেলায় আনিয়া দিবার কথা শুনিয়া ছিলাম। আমার উহা মনে পড়িয়া গেল। তারা তবুও মানুষ, এযে ছায়া। ছায়াইবা কি করিয়া বলিব? আমি ঐ আম গুলির কয়েকটা লইয়া পরেশ, জিতেন ও অপর দুটী বাবুকে দিলাম। বৃদ্ধ নীরব। তিনি সকলকে তাড়াতাড়ি নীচে আমাদের শুইবার ঘরে লইয়া আসিলেন, বলিয়া গেলেন 'কোন ভয় নাই।' রাত্রিতে পরেশ প্রভৃতির আহার হইল না, তাহারা ঘুমাইয়া রহিল।

রাত্রি যখন দশটা তখন বৃদ্ধ আমাকে ডাকিলেন—আহার প্রস্তুত। খাইতে বসিয়া এই ভৌতিক কাণ্ড সম্বন্ধে বৃদ্ধকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। তিনি সবগুলি প্রশ্ন শুনিয়া রামনিবাসে এই সব ভৌতিক কাণ্ড সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সব কথা বলিবার সময় হইল না।

আহার করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শুইলাম। বৃদ্ধ বলিয়া গেলেন—'ঘরের বাতিটা যেন জ্বালান থাকে। নিবাইবেন না।' আমার এক রত্তিও ঘুম হইল না। মাঝে মাঝে শুনিতে লাগিলাম—"মা—মা—মা, কাকা—কাকা—কাকা, বাবা—বাবা—বাবা, এই যে আমি"। অনেক বার এইরূপ শুনিয়া ঘড়ীটা খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম পনর মিনিট পর পর এইরূপ ধ্বনি হইতেছে। তখন দশমীর চন্দ্র অস্ত গিয়াছে। আঁধারে এদিকে ওদিকে 'মা—মা' কাতর কান্নায় আকাশ যেন ছাইয়া ফেলিল; বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল এখন করুণ, এমন মধুর 'মা—মা' ধ্বনি আমি আর শুনি নাই। সে ধ্বনি ঘরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল। আমাকে আকুল করিয়া ফেলিল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। পাছে আমার কান্নায় উহারা জাগিয়া উঠে, এই আশঙ্কায় বালিশের উপর পড়িয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিলাম। তার পর আর স্মরণ নাই। পর দিন প্রাতে বৃদ্ধের বিশেষ অনুরোধে মধ্যাহ্নে আহার করিয়া আমারা তিন জনে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম।

বৃদ্ধের মুখে রামনিবাসের যে ইতিহাস শুনিয়া আসিয়াছি আগামী বারে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সাহমামুদের মস্‌জিদ।

ময়মনসিংহ জেলায়, ব্রহ্মপুত্র তটে এগারসিন্দুর অতি প্রসিদ্ধ স্থান। ইতঃপূর্ব্বে এগারসিন্দুরের কয়েকটী দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। এবার সাহমামুদ ও তাঁহার মসজিদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

সাহমামুদের মসজিদটী প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড মসজিদ। মস্‌জিদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ পাকা আঙ্গিনা। প্রবেশ পথে ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ দুচালা ঘর। আঙ্গিনার চারিদিকে অনুচ্চ দেওয়াল। সম্মুখে পুস্করিণী। প্রবাদ এই—মস্‌জিদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৩৫ বিঘা নিষ্কর ভূমি আছে। সাহমামুদের অধস্তন ৫ম পুরুষ বৃদ্ধ তমিজদ্দিন সাহেব ১১৪৫ সনের ২৩শে মাঘ তারিখে, ঐ মস্‌জিদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জঙ্গলবাড়ী হইতে দেওয়া নাখেরাজ জমির যে দলিল দেখাইলেন, তাহাতে মাত্র /৭॥ এককাণি সাড়ে সাত গণ্ডা জমির উল্লেখ আছে। তমিজদ্দিন সাহেব, শাহ মামুদের সময় প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ নাকি প্রায় সকলেই শতায়ু ছিলেন। *

সেখ শাহমামুদের কাহিনী কৌতুহলোদ্দীপক। সেখ শাহমামুদ অতি দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার দৈনিক আহার নির্ব্বাহ হওয়াও কষ্টকর ছিল। সেই সময় এক শতছিন্ন মলিন বসন, মাথায় জটা, মুখে প্রলাপ-পাগল, নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে মৎস্য ব্যবসায়ীদিগের পরিত্যক্ত ও ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত মাছের নাড়ী ভুঁড়ি কুড়াইয়া আপন ঝুলিতে করিয়া লইয়া কোথায় চলিয়া যাইত, কেহ জানিত না। একদা শাহমামুদ অলক্ষিতে এই পাগলের অনুসরণ করিয়া এক নিবিড় অরণ্যের ভিতর উপনীত হন। পাগল সেখানে

---

* সাহমামুদের বংশাবলী এইরূপ :—
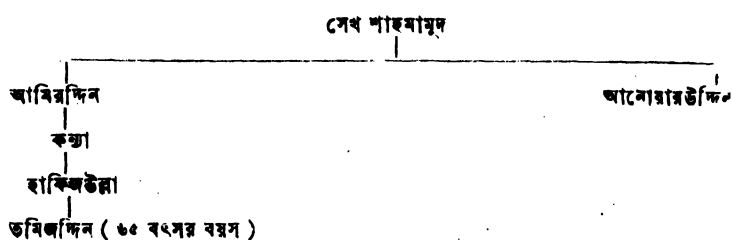
এক গাছ তলায় বসিয়া আপন হাঁড়িতে সংগৃহীত মাছের নাড়ীভুঁড়ি পাক

সাহমামুদের মসজিদ—ভগ্নাবশেষ।

করিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই ঐ হাঁড়ি হইতে নির্গত গন্ধে অরণ্য আমোদিত হইয়া উঠিল। শাহমামুদ গুপ্তভাবে থাকিয়া এই অনাস্বাদিত পূর্ব্ব সৌরভ প্রাপ্ত হইলেন। শাহমামুদ আর লুকাইয়া রহিলেন না। ভক্তি-ভরে সেই ছদ্মবেশী মহাপুরুষের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। সেই মহাপুরুষই এতদঞ্চলে নারকিন দরবেশ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নারকিন শাহ মামুদকে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাহাকে তিনটী পদাঘাত করিবা-মাত্র শাহ মামুদ পলায়ন করিলেন। দরবেশ ডাকিয়া কহিলেন—"তিনপুরুষ পর্য্যন্ত তোর্ অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিবে।"

শাহমামুদের অদৃষ্ট ফিরিল, তিনি বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বৃহৎ নৌবহর বহুদূর দেশে বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করিত। তামিজ্‌দ্দিন সাহেব বলিয়াছেন—"সুন্দর বনে শাহমামুদের এক প্রকাণ্ড লবণের গোলা ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ গোলার মালীকের অনুসন্ধান করিয়া বিফল হইয়াছেন। ফ্যাসাদে পড়িবার ভয়ে, কেহ শাহমামুদের ওয়ারিশ বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিল না।" প্রবাদ আছে, শাহ মামুদের পত্নী একবার নৌকার মাঝিদিগকে খাওয়াইতে চাহেন। এক বিস্তীর্ণ মাঠে তাঁহাদের খাওয়ার জায়গা করিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শাহমামুদের মৃত্যুর পরও নাকি বহুকাল তাঁহার বাণিজ্য লক্ষ্মী অচলা ছিল। তাঁহার পুত্র আমিরদ্দিনের শেষ অবস্থায় শাহ মামুদের প্রধান বাণিজ্যতরী ব্রহ্মপুত্রের শাখা শঙ্খনদীর ঘাটে ডুবিয়া যায়। তাহার সুদীর্ঘ মাস্তুল নাকি বহুদিন পর্য্যন্ত দর্শকের নয়ন পথে পতিত হইয়া শাহ মামুদের বাণিজ্যখ্যাতি ঘোষণা করিত। যাহারা ঐ মাস্তুল দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাপি জীবিত আছেন। প্রধান তরণী নিমজ্জনের পর হইতেই বাণিজ্য লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠেন। দস্যু হস্তে পুনঃপুনঃ লুণ্ঠিত হইয়া শাহ মামুদের বিপুল ঐশ্বর্য্য নিঃশেষিত হয়। মস্‌জিদটী এখনও তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে বটে কিন্তু কালের কঠোর নিপীড়নে কোন মুহূর্ত্তে তাহা লয় পাইয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই; তাই আমরা সযত্নে তাহার প্রতিকৃতি রাখিবার চেষ্টা করিলাম। বহু অনুসন্ধানেও মস্‌জিদ্ গাত্রে কোন লিপি পাওয়া গেল না।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রামায়ণী যুগের রাজনীতি।

প্রাচীন ভারতের রাজ্য শাসন-নীতি কিরূপ আদর্শে পরিচালিত হইত, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে তাহার বিস্তৃত আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। রাম চিত্রকূট আশ্রমে ভরতকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন; প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কতদূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহার আলোচনায়—তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

কিরূপ লোককে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে, কি কার্য্য অগ্রে সম্পাদন করিতে হইবে, কোন কথা গোপন রাখিতে হইবে, তৎ তৎসম্বন্ধে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"বৎস তুমি বীর, শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন, ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ ত? শাস্ত্র বিশারদ, নীতি পরায়ণ অমাত্যগণের যত্নে মন্ত্রণা সংগোপনে রক্ষিত হয়—ইহাই রাজাদিগের বিজয়ের কারণ। তুমি একাকী কিম্বা বহুলোকের সহিত ত মন্ত্রণা কর না? মন্ত্রণার বিষয় ত গোপন থাকে? যাহা অল্পায়াস-সাধ্য অথচ বহুফলপ্রদ, এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ত সর্ব্বাগ্রে করিয়া থাক? সামন্ত রাজগণ ত তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল অবগত হইয়া থাকেন? যাহা এখনও করা হয় নাই, ঐরূপ কার্য্য ত তাহাদের নিকট অপ্রকাশ রহিয়াছে? মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা ক্রমে তুমি যে কার্য্য গোপন রাখ তাহাত কূটতর্ক দ্বারা কেহ জানিতে পারে না?

সহস্র মূর্খকেও উপেক্ষা করিয়া একটী পণ্ডিতের সম্মান রক্ষা কর ত?—সঙ্কট উপস্থিত হইলে বিজ্ঞ দ্বারাই শুভ সাধন হইয়া থাকে। সহস্র মূর্খ দ্বারা পরিবৃত থাকিলে কোন ইষ্ট লাভ হয় না। একজন বিচক্ষণ অমাত্যই রাজার বহু পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে।"

রাম কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে ভরতকে বলিয়াছেন—

"বৎস, ভৃত্যগণের (কর্ম্মচারী) স্ব স্ব মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে রাখিয়াছ ত? যে সকল অমাত্য পুরুষানুক্রমে অমাত্য কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং সচ্চরিত্র, উৎকোচগ্রাহী নহেন, তাঁহাদিগের হস্তে প্রধান প্রধান কার্য্যভার রক্ষা করিয়াছ ত? প্রজা পুঞ্জ কঠিন শাসনে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না?

"বৎস, সামাদি (সাম—দান—ভেদ—দণ্ড) প্রয়োগ-কুশল-রাজনীতিজ্ঞ,

অবিশ্বাসী ভৃত্য ও ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তিদিগকে যে বিনাশ না করে, সে রাজা স্বয়ং (সময়ে) ঐ সকল ব্যক্তি কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে—তুমি ত তাহা অবগত আছ? যিনি মহাবীর, ধীর, শ্রীমান্ ও সৎকুলোদ্ভব, সুদক্ষ ও অনুরক্ত—তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা বলবান্, স্ব স্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠ ও লোক-পূজ্য তাঁহাদিগকে ত সম্মান করিয়া থাক?"

সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে জ্ঞাতি-বল ও সেনা বল রাজার অদ্বিতীয় বল। গুপ্তচর রাজনীতির প্রধান অবলম্বন। রাম ভরতকে সেই সেনা-বল, জ্ঞাতি বল ও গুপ্তচর সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"তুমি সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন ত যথা সময়ে প্রদান করিয়া থাক? এই সম্বন্ধে ত কখন ও বিলম্ব হয় না? বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা প্রভুর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে—ইহাতে নানা অনর্থ উপস্থিত হয়।

"প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত? তাঁহারা তোমার জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত কি? যাঁহারা জনপদ বাসী, বিদ্বান্ ও অনুকূল, প্রত্যুৎপন্নমতী ও উচিদ্বক্তা এইরূপ লোককে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছ ত?

"ভরত, বিপক্ষের অষ্টাদশ ব্যক্তি—যথা (১) মন্ত্রী, (২) পুরোহিত (৩) যুবরাজ (৪) সেনাপতি (৫) দৌবারিক (৬) অন্তঃপুররক্ষী (৭) কারারক্ষক (৮) ধনাধ্যক্ষ (৯) রাজাজ্ঞা প্রকাশক (১০) প্রাড়্বিবাক জিজ্ঞাসক (জজ পণ্ডিত) (১১) ধর্ম্মাধিকরণ (১২) ব্যবহার নির্ণায়ক (ব্যবস্থাপক সভার সভ্য) (১৩) বেতন অধ্যক্ষ (১৪) অবসর বেতনগ্রাহী (Pensioner) (১৫) নগরাধ্যক্ষ (১৬) আটবিক (সীমান্তরক্ষক) (১৭) দণ্ড দান অধিকারী ও (১৮) দুর্গপাল এবং বিপক্ষের (প্রথম তিনজন ব্যতীত) পঞ্চদশ জনের আচরণ অবগত হওয়ার জন্য, প্রত্যেক স্থানে তিনজন করিয়া গুপ্তচর রাখিয়াছ ত? যে শত্রু একবার দূরীকৃত হইয়াও পুনরায় আসিয়াছে এইরূপ লোক দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিও না।"

কৃষিকার্য্য ও খাল খনন (Irrigation) দ্বারা ভূমি আর্দ্র করিবার সম্বন্ধেও রাজাদিগের তখন অমনোযোগ ছিল না। যাঁহারা Irrigationকে আধুনিক প্রথা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা রামের উক্তি লক্ষ্য করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন; রাম বলিতেছেন—"ভরত, পূর্ব্বপুরুষের শাসিত রাজ্যের সুদূর সীমা পর্য্যন্ত দেশ কর্ষিত হইতেছে ত? দেশ পশুগণে পূর্ণ আছে ত?

কৃষকগণ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া নাই ত? রাজ্য ত উপদ্রব শূন্য? কৃষক ও পশু পালকেরা ত তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত নহে? তাঁহারা ত স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য পালন করিতেছে? তুমিও তাহাদিগের ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে যথারীতি প্রতিপালন করিতেছ ত? তোমার অধিকারের লোককে ধর্ম্মানুসারে রক্ষাকরাই তোমার কর্ত্তব্য।"

প্রাচীন ভারতে রাজনীতি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অধিকার ছিল না। ভারতের স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্রই দুর্ব্বল ও রক্ষণীয়। এ সম্বন্ধে রাম ভরতকে বলিতেছেন—"স্ত্রীলোকেরা তোমার যত্নে সাবধানে আছে ত? স্ত্রীলোকের প্রতি তুমি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেছ ত? ভরত, স্ত্রীলোককে সম্মান করিও, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া স্ত্রীলোকের নিকট গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না।"

পূর্ব্বকালে রাজ-দর্শন রূপ পূণ্য ভারতবাসীর নিকট অযাচিত ছিল। প্রজার নিকট রাজা মুক্তভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়া নিজেই সাধারণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। রাম তাই ভরতকে বলিতেছেন—"তুমি রাজ বেশ পরিধান করিয়া সভা মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাক ত? প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে গাত্রোত্থান করিয়া রাজপথে পরিভ্রমণ কর ত? ভৃত্যেরা নির্ভয়ে তোমার নিকটে যাতায়াত করে, না ভয়ে একবারেই করে না?

"বৎস, নির্ভয়ে দর্শন ও ভয়ে অদর্শন এতদুভয়ের মধ্য রীতিই শ্রেষ্ঠ। এই রীতি অর্থাগমের উৎকৃষ্ট পন্থা।

"দুর্গ সকল ধন-ধান্য, জলযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং শিল্পী ও যোদ্ধাগণে পূর্ণ আছেতো?"

এইবার আয় ব্যয়ের কথা। রাম বলিতেছেন—

"বৎস, তোমার ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী নহে কি? অপাত্রেতো অর্থ বিতরণ হয় না? দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায়, যোদ্ধাগণের প্রতি ও মিত্রগণের প্রতি ত তুমি মুক্ত হস্ত?"

বিচার ও বিচারক সম্বন্ধে রাম বলিতেছেন—"ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বিচারক দ্বারা দোষ সপ্রমাণ না করিয়া ত তুমি কোন নির্দ্দোষকে অর্থলোভে শাস্তি প্রদান কর না? তস্করকে অপহৃত দ্রব্যসহ ধৃত করিয়া ত ধনলোভে মুক্তি প্রদান কর না? ধনী বা দরিদ্রের বিচার কালে তোমার অমাত্যেরা ত নিরপেক্ষ বিচার করিয়া থাকে? বিচারপ্রার্থী যদি বিচার না পায়, অথবা নির্দ্দোষ অবিচারে বা বিনা বিচারে কষ্টভোগ করে, তবে তাহাদিগের নেত্র

হইতে যে অশ্রু বিন্দু নিপতিত হয়, তাহা সেই অধার্ম্মিক, ভোগ-বিলাসী রাজার পুত্র ও রাজ্যের পশু সকলকে বিনষ্ট করে।

"বৎস, তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে ত বাক্য ব্যবহার ও অর্থে বশীভূত রাখিয়াছ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর? তুমি ধর্ম্মদ্বারা অর্থকে ও অর্থদ্বারা ধর্ম্মকে এবং কামদ্বারা এতদোভয়কে ত নিপীড়ন কর না? যথাকালে ত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সমভাবে সেবা করিয়া থাক? বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন ত?"

রাম রাজদোষের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"তুমি—নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রিতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয় সেবা, রাজ্যের প্রয়োজনীয় বিষয়ে একাকী চিন্তা, অনর্থবাদীদিগের সহিত পরামর্শ, কর্ত্তব্যরূপে নির্ণিত কার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণাভঙ্গ, প্রতি কার্য্যের অনারম্ভ, এবং সমস্ত শত্রুর সহিত এককালে যুদ্ধযাত্রা এই যে চতুর্দ্দশটী রাজদোষ তাহা অবগত আছ ত এবং তাহা পরিহার করিয়াছ ত? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত ত তোমার সংশ্রব নাই? এই সকল পণ্ডিতাভিমানী বালবুদ্ধি ব্যক্তিরা ধর্ম্মশাস্ত্র বিদ্যমান্ থাকা সত্ত্বেও কেবল বৃথা তর্কদ্বারা অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে।"

অতঃপর রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে রাম বলিতেছেন—"বৎস, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ; সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্বর্গ; জল দুর্গ, গিরি-দুর্গ, বেণু দুর্গ, শস্য শূন্য প্রদেশস্থ ঐরিণ দুর্গ এবং গ্রীষ্মকালে অগম্য ধান্বন দুর্গ এই পঞ্চ দুর্গ বা পঞ্চ বর্গের ফলাফল জানিতে পারিয়াছ ত?

"স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও সুহৃদ এই সপ্ত বর্গের (বা সপ্তাঙ্গ রাজ্যের) এবং কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জর-বন্ধন, খনি, আকর, করদান ও সৈন্য নিবেশণ এই অষ্টবর্গের * ফল বুঝিতে পারিয়াছ কি?

"তুমি দশবর্গের—(মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবা-নিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রী-সেবা, মদ্যপান, নৃত্য-গীত-বাদ্য, বৃথা ভ্রমণ এই দশবিধ কামজদোষ দশবর্গ) ফল অবগত আছ ত? ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই ত্রিবিদ্যা তোমার অভ্যস্ত আছে তো?

* মতান্তরে—পৈশুন্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, সাধু নিন্দা, বাগ্‌দণ্ড ও নিষ্ঠুরতা ক্রোধজাত এই অষ্টবর্গ।

"বৎস, তুমি তো নিদ্রার বশীভূত নও ? যথা সময়ে জাগ্রত হইয়া রাত্রি শেষে অর্থাগমের উপায় সকল ত চিন্তা কর ?

"ইন্দ্রিয় জয় এবং সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ষড়্‌গুণ সকলের প্রতি তোমার দৃষ্টি আছে কি ? দৈব (১) ও মানুষ (২) ব্যসন, রাজকৃত্য, (৩) বিংশতিবর্গ, (৪) প্রকৃতি বর্গ, (৫) অরি, মিত্র প্রভৃতি দ্বাদশ মণ্ডল, পঞ্চ বিধ রণ যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনী-সন্ধি ও বিগ্রহ এই সমুদয়ের প্রতি তোমার দৃষ্টি আছে ত ? তুমি বেদোক্ত কর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ ? এবং ক্রিয়া কলাপের ফল ত উপলব্ধি হইতেছে ? শাস্ত্র জ্ঞান তো নিস্ফল হয় নাই ?

"আমি যে প্রকার বলিলাম, তুমি এইরূপ বুদ্ধির অনুগামী হইয়া চলিতেছ ত ? এই নীতি আয়ুস্কর এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরিবর্দ্ধক।"

রাম কথিত এই নীতি প্রাচীন ভারতীয় রাজ-নীতির মূলমন্ত্র। প্রাচীন ও আধুনিক ইয়ুরোপের কোন কোন জাতি ভিন্ন এইরূপ উচ্চ রাজনীতির চর্চ্চা এপর্য্যন্ত কোন সভ্য জাতি করিতে পারে নাই। এই নীতি পরবর্ত্তী কালে ব্যাসকৃত "মহাভারত" এবং চাণক্যকৃত "অর্থশাস্ত্রে" আরও পূর্ণতালাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে পৃথিবীর যে কোনও জাতির পক্ষে এই নীতি মন্ত্র সমাদরে গৃহীত হইতে পারে।

(১) দৈব ব্যসন—অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। (২) মানুষ ব্যসন—রাজ কর্ম্মচারী, তস্কর, শত্রু, রাজা, ও রাজানুগৃহীত এই পঞ্চ ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন ভয় মানুষ ভয়।

(৩) শত্রু পক্ষের অলব্ধ বেতন কর্ম্মচারী, মানী হইয়াও অপমানীত, ক্রুদ্ধ ও ভীতকে শত্রু হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য।

(৪) বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি বহিস্কৃত, ভীরু, ভীরু জনক, লুব্ধ, লুব্ধ জনক, বিরক্ত প্রকৃতি, বিষয়ে অত্যাসক্ত, বহুমন্ত্রী, দেব-ব্রাহ্মণ নিন্দুক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষ ব্যসনী, বলব্যসনী, আদেশস্থ,ব হুশত্রু, মৃত প্রায় ও অসত্য ধর্ম্মরত এই বিংশতি বর্গের সহিত কদাচ সন্ধি করিবেনা।

(৫) প্রকৃতি বর্গ—অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড এই পঞ্চ প্রকৃতি।

সাহিত্য সেবক।

অ

অক্রূর চন্দ্র সেন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার বায়রা গ্রামের বৈদ্য বংশে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে অক্রূর বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ রাজচন্দ্র সেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ফার্ষ্ট আর্ট পর্য্যন্ত পড়িয়া অক্রূর বাবু শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে তিনি এণ্ট্রেন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা বিভাগের কেরাণীর কার্য্যে (Education clerk) নিযুক্ত হন এবং ক্রমে স্কুল সবইন্‌স্পেক্টর ও অতঃপর ডিষ্ট্রিক্ট ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যে উন্নীত হইয়া ১৯০৬ সনে পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন।

শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়া অক্রূর বাবু 'কবিতা কলাপ', 'শিক্ষা-সোপান', 'নীতি কবিতামালা' প্রভৃতি কয়েক খানা স্কুল পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। ১৮৮৮ সনে 'জলাঞ্জলি' নামক তাঁহার এক খানা সামাজিক উপন্যাস প্রচারিত হয়। ঐ সনের Bengal Administration Reportএ অত্যন্ত প্রসংশার সহিত 'জলাঞ্জলির' উল্লেখ দেখিয়া অক্রূর বাবু সাহিত্যা-লোচনায় উৎসাহিত হন। ১৮৯২ সনে (১২৯৮) তিনি "ছেলে খেলা" নামে বালক বালিকাদের জন্য এক খানা নীতি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩০১ সনে তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ 'জীবন' প্রকাশিত হয়।

এই সময়—১৮৯২ সনে বেঙ্গল লাইব্রেরীর তদানিন্তন লাইব্রেরীয়ান পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় (বর্ত্তমানে মহামহোপাধ্যায়) এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্যে ঢাকা আগমন করেন এবং অক্রূর বাবুর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"এটী বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পূর্ব্ব বঙ্গে কোন কালেই ভাল বাঙ্গালা গ্রন্থ কেহ লেখেন নাই। অনুসন্ধান করিয়া কেবল মাত্র পদ্মাপুরাণ নামক এক খানি পুস্তক পাওয়া যায়।" শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মন্তব্যে অক্রূর বাবু পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যালোচনায় ব্রতী হন এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থান হইতে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই

পূর্ব্ব-বঙ্গের এই গৌরব উদ্ধারে ব্রতী হন নাই। ইঁহারই উপদেশ এবং প্রদর্শিত পথে কার্য্য করিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীণেশচরণ সেন "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" রচনা করিয়াছেন।

অক্রূর বাবু এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে সংগৃহীত পুঁথি গুলি প্রদান করিলে ৺ রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহার সংগৃহীত অন্যান্য পুঁথি পাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। ৺ কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই কথা জানিয়া তদানিন্তন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ৺ দীননাথ সেন মহাশয় দ্বারা অনুরোধ করাইয়া জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভা দ্বারা প্রকাশিত করিবেন বলিয়া—তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার সংগৃহীত কয়েক খানা প্রাচীন পুঁথি লইয়া যান।

এই পুঁথি গুলি সম্বন্ধে অক্রূর বাবু আমাকে ১৯০৮ সনের ৭ই ডিসেম্বর যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—"কথা থাকে যে প্রত্যেক পুস্তকের ভূমিকা, রায় বাহাদুর স্বয়ং লিখিয়া বাহির করিবেন। 'নৈষধ' ছাপা শেষ হয়, 'মায়াতিমির চন্দ্রিকা' শেষ হয়, সঞ্জয় মহাভারত ও প্রায় শেষ হয়, তবু রায় বাহাদুর অনবসর প্রযুক্ত ভূমিকা লিখিতে পারেন না; অনেক পীড়া পীড়ির পর "নৈষধ" উচ্চ শ্রেণীর ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" ছাপা হয়, ভূমিকা অভাবে প্রকাশিত হয় না; মহাভারতের কতগুলি ফর্ম্মা প্রেস হইতে 'খোয়া' যায়। এই সময় রায় বাহাদুর ভাওয়ালের সংশ্রব পরিত্যাগ করেন, প্রচার কার্য্যও শেষ হইয়া যায়। তিন খানি পুস্তক ছাপা হইয়াও প্রকাশিত হয় না। লাভের মধ্যে গো বধ হয়, দুই তিন খানি হস্ত লিখিত প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আর পাওয়া যায় না। তাহার মধ্যে অমূল্য রত্ন "সঞ্জয় মহাভারত", ইহাতে আমার হৃদয়ে অসহ্য আঘাত লাগে, আমি নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করি।"

অক্রূর বাবু বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় সাহিত্য চর্চ্চায় মনোযোগ দিয়াছেন। বিগত ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনের পূর্ব্বে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আবার কেন সত্যেন্দ্র বাবু (ঢাকা রিভিউর সম্পাদক) ও আপনি আমাকে টানিয়া নিতেছেন তাহা জানি না।"

যাই হউক, এখন তিনি পুনরায় প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

১৮৬৬ সনে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে বৈদ্য বংশে অক্ষয় বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র মজুমদার। অক্ষয় বাবু ১৮৮৪ সনে সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া পনর টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. কোর্স বি. এ. অনার (প্রথম বিভাগে) ও ১৮৮৮ সনে ইংরেজীতে (দ্বিতীয় বিভাগে) এম. এ. পাস করেন। ১৮৮৯ সনে বি. এল. পাস করিয়া একবৎসর বিহার ন্যাসনাল কলেজে প্রিন্সিপালের কার্য্য করেন। তৎপর হইতে ময়মনসিংহ ওকালতি করিতেছেন।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার সম্পাদকত্বে "সাধনা গ্রন্থাবলী" নামে তিন খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইনি "চারুমিহিরের" প্রচার হইতে দশ বৎসর কাল উহার পরিচর্য্যা করেন। ১৯০৫ সনে তাঁহার সম্পাদকত্বে ময়মনসিংহ হইতে "স্বদেশ সম্পদ"—সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

অক্ষয় বাবু বহুদিন ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সমিতি ও সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে সাহিত্য ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। তিনি ময়মনসিংহের অনেকগুলি শিক্ষা কমিটীর সহিত সংসৃষ্ট আছেন।

অক্ষয় বাবু তাঁহার মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সারস্বত বর্ণ প্রভৃতি পাঁচটী আবিষ্কার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে তাঁহার 'পেটেণ্ট' আছে। Stearate of Metals ও কৃত্রিম লাক্ষা সম্বন্ধে রচনা লিখিয়া মৌলিক আলোচনার জন্য তিনি এসিয়াটীক সোসাইটী হইতে "ইলিয়ট পুরস্কার" প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

অক্ষয় বাবুর পূর্ব্বপুরুষ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রুক্মিণী গ্রামে বাস করিতেন। নীলকরের দৌরাত্মে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সেই পৈতৃকভিটা পরিত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার কুমারখালি নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকেন; সেই হইতেই তাঁহারা পশ্চিম বঙ্গবাসী। তাঁহার পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্র, মাতার নাম সৌদামিনী দেবী।

অক্ষয় কুমার ১২৬১ সালের ১লা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পর তাঁহাকে মৃত বলিয়া পরিত্যাগ করা হয়। কিন্তু একটী বিলাতী ধাত্রীর

কৃপায় তিনি পুনঃ জীবন লাভ করেন। তাঁহার পিতা মথুরানাথ রাজসাহীতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীছিলেন; তাই, অক্ষয় কুমারও তথায় নীত হইলেন। ১৮০১ সনে বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮০৪ সন হইতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮০৮ সনে অক্ষয় বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগের সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ক্রমে বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫ সন হইতে রাজসাহীতে ওকালতী করিতেছেন।

"বিজয় বসন্ত" প্রণেতা কাঙ্গাল হরিনাথ অক্ষয় বাবুর সাহিত্য গুরু। প্রথম প্রথম অক্ষয় বাবু হিন্দুরঞ্জিকা ও গ্রামবার্ত্তায় লিখিতেন। এই সময় তাঁহার "সমরসিংহ" গ্রন্থ বাহির হয়। ইহার পরে অক্ষয় বাবু নানা মাসিক পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। সাধনা, সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতিতে তাঁহার সিরাজ-উদ্দৌলা, সীতারাম, মীরকাশিম, রাণী ভবানী প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি প্রথম বাহির হয়। অতঃপর সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯৯ সনে কবিবর রবীন্দ্র নাথের সাহায্যে তিনি ঐতিহাসিকচিত্র নামে একখানা ত্রৈমাসিক সচিত্র পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকা তিন সংখ্যা মাত্র বাহির ইহয়াছিল। অক্ষয় বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক।

বর্ত্তমান সময়েও নানা মাসিক পত্রে তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। তিনি রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির এক জন প্রধান সভ্য। তাঁহার নেতৃত্বে "গৌর রাজমালা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধি হইতেছে।

অভিমানী।

ভগ্ন বক্ষস্থল তার, যাতনার ভারে,
আঁখি দু'টী অশ্রুর পল্বল ;—
তবু সে যে কারো কাছে জানাইতে নারে,
অভিমান এমনি প্রবল!
কেউ যদি যেচে তারে, সুধায় কুশল,
নীরবে অশ্রুর রাশি ঢালে সে কেবল!

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

জন্ম দিনের উপহার।

সৌরভ

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩২০ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

টেনিসনের তুলিকায় রমণীর কার্য্য ক্ষেত্র।

বিলাতে সাফ্রিজেটিদের তাণ্ডব অভিযান লক্ষ্য করিয়া ভারতের সামাজিক শান্তি রক্ষকগণ অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রতীচ্যে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে প্রাচ্যে তাহার প্রতিঘাত হইতেছে। এই অনুকরণ-প্রিয়তার পথে নানা কারণে এদেশে বহু আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়াছে। রমণীর কার্য্যক্ষেত্র কি, ইহা স্পষ্টরূপে প্রকটিত না করিলে স্বস্তিকামী ভারতবাসীর গৃহ সংসার অশান্তিতে পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভবনা।

ইংলণ্ডে স্ত্রীজাতির রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে সভ্যগণ এখনও একমত হইতে পারেন নাই। সভায় উপস্থিত বিলের পক্ষে এক দিকে ২১৯ জন এবং অপর দিকে ২৬৬ জন। আর ৪৮ জন সভ্যকে মহিলাদিগের হস্তগত করিবার দিন বহু দূরবর্ত্তী নহে। মত-সামর্থ্যে এরূপ গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত সমীচীন কিনা ভাবিবার বিষয়। প্রধান মন্ত্রী মিঃ এস্কুয়িথ, ইংলণ্ডের রমণী-সমাজ এরূপ বিধান চাহেন কিনা তৎ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন।

আমরা রাজনীতির জটিলব্যূহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। রমণীর কার্য্য ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভারতের এবং ইংলণ্ডের প্রাণের কথা কি, আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। বৈশাখের সৌরভে আমাদের একজন লেখক "নব পঞ্জিকায়" নবনারীর প্রতি বিদ্রূপচ্ছলে নারীর কার্য্যক্ষেত্রের পরোক্ষভাবে এক মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে কোন পথ নির্দ্দেশ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র 'নবীনা ও প্রাচীনা' এবং "তিন রকমে" বহু কথা বুঝাইয়া গিয়াছেন। আদর্শ মাতা হইবার জন্য নারীর সৃষ্টি। স্কুল, কলেজ, সভা সমিতি এবং গৃহ পরিবারের শিক্ষা এই দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া চলিলে নারী-সমাজে বহু বিপত্তির আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষের চিরদিনই এই লক্ষ্য।

রাম সীতা উপবিষ্ট। অষ্টাবক্র মুনি উপস্থিত। মুনি গর্ভবতী সীতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "কেবলম্ বীরপ্রসবা ভূয়াঃ।" কালিদাস উমাকে তাঁহার শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে পতি-লাভার্থ তপস্যায় এবং তৎপর পরিণয়ে কুমারসম্ভবের দিকেই লইয়া গিয়াছেন। কবি বিধাতার মুখে উমাপরিণয় কালে এই আশীর্ব্বাদ ধ্বনিত করিয়াছেন ঃ—"কল্যাণি! বীরপ্রসবা ভবেতি।" কেবল কবির কথা নহে, ভারতীয় সংহিতাকরগণও এই উদ্দেশ্যই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের মূল বিধান ইহার পরিপন্থী নহে। কবি টেনিসন্ তাঁহার "প্রিন্‌সেস" কবিতায় রমণীর কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে একটী কৃষকের মুখে বলিতেছেন ঃ—

"Come down, O maid, from yonder mountain height :
What pleasure lives in height (the shephered sang)
In height and cold, the splendour of the hills ?
And come, for Love is of the valley, come thou down
And find him ; thousand wreathes of dangling waters smoke
That like a broken purpose waste in air.
So waste not thou ; but come ; for all the vales
Await thee ; azure pillars of the hearth
Arise to thee ; the childern call and I

টেনিসনের কৃষক নারীকে পর্ব্বতের উচ্চচূড়া হইতে নিম্ন উপত্যকার গৃহস্থালী এবং সন্তান সন্ততির মধ্যে নামিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। মূলতঃ ভবভূতি, কালিদাস এবং কবি টেনিসন একমত। পুরুষ পর্ব্বত; নারী নদী। পর্ব্বত উচ্চগ, নারী নিম্নগা। 'উচ্চগ' এবং 'নিম্নগা' এতদুভয়ে মহিমায় কোন প্রভেদ নাই। জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়েরই তুল্য মূল্য বরং ভক্তির মহিমাই অধিক। নদী অকূল, অগাধ রত্নাকরে লয় প্রাপ্ত হয়—সাগর কত গভীর! উল্টাইয়া ধরিলে সাগরের গভীরতাই উচ্চতা। নারীর স্নেহ মায়া মমতার উচ্চতা কে পরিমাপ করিতে পারে? কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে পুরুষ এবং রমণীর দুর্দ্ধর্ষ দ্বন্দ্বের কি কারণ আছে? ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের নারী জাতি সম্বন্ধে উভয়ের প্রাণগত উদ্দেশ্য সম্মুখে লইয়া অগ্রসর হইলে কোন দেশেই সংসার পরিবারে কোন রূপ অশান্তির কারণ থাকে না এবং নারী জাতির কার্য্যক্ষেত্রও স্পষ্ট রূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত ধ্বনি।

(ভৌতিক কাণ্ডের মৌলিক কারণ।)

বালিশে মাথা রাখিবার পর আমার একটু তন্দ্রার মতন হইল, ঘুম হইল না। ভোরে পাখীর প্রথম কলরবেই সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অতি মিষ্ট বাতাস বহিতেছিল। আমি গ্রাম খানি দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। গত রাত্রিতে বিজয়া গিয়াছে। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিয়া লোক গুলি তখন ঘুমাইয়াছিল। পথে অধিক লোক দেখিলাম না। অম্রপুর গ্রাম উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি অনেক ঘর লোকের বসতি। মিছিরপাড়া নামে একটী পাড়া আছে। ঐ পাড়ায় পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত কয়েক ঘর মিশ্র তিন চারি পুরুষ হইল বাস করিয়া থাকেন।

গ্রাম খানি বেড়াইয়া রামনিবাসের দিকে আসিতেই দেখিলাম, সেই বৃদ্ধ ফুল তুলিয়া ফিরিতেছেন। তিনি আমার দিকে চাহিয়াই দাঁড়াইলেন, বলিলেন "আসুন মহাশয় আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।" তাহার নাম উমেরচাঁদ মিশ্র, বয়স অনুমান সত্তর পঁচাত্তর হইবে। বৃদ্ধ হইলেও দৃঢ়কায় এবং বলিষ্ঠ। মিশ্র ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া রাম-নিবাস ভবনের উপর তালায় পূবের বারন্দায় লইয়া গেলেন; একটী কুঠরীর তালা খুলিয়া আমাকে তাঁর সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। ঘর খানি ছোট হইলেও অতি সুন্দর সাজান। একটী গ্লাসকেস্ আলমারীতে নানা রঙ্গের শাড়ি ভাজ করা ঝুলান। অনেকগুলি ফুল ও ফল কুলঙ্গিতে শুকাইয়া আছে। একদিকের দেয়ালে লাল চন্দন মাখা কাগজে যুগল পদ চিহ্ন আয়নার মতন আটা। এই সব দেখিতেছিলাম, এমি সময়ে মিশ্র ঠাকুর একটা লোহার সিন্ধুক খুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন— 'আপনার চাদর খানি সাদা, কোটটী সাদা, ধুতি জুতা লাঠী সব সাদা, ছাতাটীও সাদা দেখিয়াছি। সাদা চুল এবং সাদা দাড়ি গোঁফে এই সব সাদা অতি উত্তম মানাইয়াছে, আপনার মনটীও সাদা হইবে বলিয়া আপনার প্রতি আমার কেমন একটা বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে, তাই আপনাকে এই দলিল খানি পড়িতে দিলাম। "পড়ুন, যা বলি শুনুন"।

দলিল খানি রামশরণ মিশ্রের উইল। উমেরচাঁদ মিশ্রের বরাবরে। রামশরণ মিশ্রের স্বকৃত স্থাবর সম্পত্তির আয় বার্ষিক কুড়ি হাজার টাকা। এই কুড়ি হাজার টাকা তিনি এক সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিয়া মিশ্র ঠাকুরকে তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। উহাতে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের কথা আছে, তার মধ্যে রামশরণের শশ্মান ভস্ম স্থাপন করিয়া যে সমাধি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে সেই সমাধির সম্মুখে প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিন কুমারী-ভোজন প্রধান। আমি উইলখানি পড়িয়া বলিলাম 'এখন কি জিজ্ঞাসা করিবার বলুন'। তিনি উত্তর না দিয়া সম্মুখের দেয়ালে একটী বড় কুলুঙ্গির মুখের পর্দ্দা সরাইয়া দিলেন। শারদীয় প্রভাতে স্নিগ্ধ-শেফালি-সুরভি উজ্জ্বল উষার ন্যায় একখানি দৃশ্য পট উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। কুলুঙ্গিতে একটী বালিকার

তৈলচিত্র ; ওহো কি চক্ষু ! এতো চিত্ত—চাহনে শান্ত শীতল স্নিগ্ধ জ্যোতি ; কি ভ্রূ ! কুঞ্চনে কোপের ছলে রূপের রামধনু : কিবা অধর !—স্পন্দনে দিক্‌প্লাবী প্রফুল্লতা ;—কিবা গ্রীবা !—হেলনে উহার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা। কিবা চিকুর : সরল পবিত্র মুখশ্রী—"মুক্তা ফলেষু চ্ছায়ায়াস্তরলত্ব মিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥" বালিকা উপবিষ্ট। তাহার কুঞ্চিত ঘন কৃষ্ণ কুন্তল বাম অংশ আচ্ছাদন করিয়া শ্লথ ভাবে বাম দেহার্দ্ধে এলাইয়া পড়িয়াছে। শিশির-পুষ্পাধিক সুকুমার বাম বাহু ফুল ধনুর আকারে ইষৎ বক্রভাবে ক্রোড়ে ন্যস্ত। তিনটী অঙ্গুলি পরিধেয়ে আচ্ছাদিত, দুইটী চম্পক কলিকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রুদ্ধ কক্ষটী বদ্ধ আঁধার হইয়াও এই চিত্রের জন্য যেন কোন দীপের প্রতীক্ষা করে না। আমি একদৃষ্টে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নির্ব্বাক নিস্পন্দ এই মুখখানি নিরীক্ষণ করিতেছি ; বৃদ্ধ সাজি হইতে ফুলগুলি কখন এই চিত্রের চারিদিকে সাজাইয়া দিয়াছেন আমি তাহা দেখি নাই। পূজিত-পূত চিত্র। চিত্র হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি এখনও উইলের প্রবেট নেন নাই"। তিনি বলিলেন "সব বলছি শুনুন"। বাঙ্গালা দেশে ক'পুরুষ বাস করাতে বৃদ্ধের ভাষা বাঙ্গালাই হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার ভাষায় সঙ্গে আমার ভাষা মিশাইয়া সমস্ত সবিস্তার লিখিয়া দিলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন "১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় যখন সরফরাজ খাঁ শাসন কর্ত্তা তখন আমার পিতামহ ৺ রামবক্স মিশ্র অযোধ্যার ওনাও জেলা হইতে আসিয়া এখানে বাস স্থাপন করেন। ঐ যে 'মিশ্রি পাড়া' দেখিয়া আসিলেন, ঐ পাড়ায় আমাদের আরো অনেকে আছেন। আমার পিতামহের শরীরে খুব বল ছিল। তিনি তীর নিক্ষেপে সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তৎসময়ে ঢাকা প্রবাসী বিখ্যাত পঞ্জাবী তীরন্দাজ রহিমুল্লা খাঁকে পিতামহের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইত। আমার পিতার নাম রামরাম মিশ্র। আমার এক ভাই ছিলেন রামভজন বাবু। রামশরণ রায় তাঁহার পুত্র—আমার ভ্রাতুস্পুত্র। বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালির সঙ্গে মিশিয়া আমাদের উপাধি মিশ্র হইতে বাবুতে, বাবু হইতে রায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। কথা বার্ত্তা আচার ব্যবহারেও দেখিতেছেন আমরা প্রায় বাঙ্গালি হইয়া গিয়াছি। আমি অকৃতদার। রামশরণ ইংরেজী বাঙ্গালায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তীর নিক্ষেপে দক্ষতা বংশানুগত। ঐ তীর নিক্ষেপের অভিনয় গত রাত্রে দেখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুকণ্ঠ অধিক দেখা যাইত না। ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। দশ বৎসর হইল তাহার স্ত্রী, ৭ বৎসরের একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রামশরণ এই কন্যাটীকে মাতার ন্যায় পাঁচ বৎসর পালন করিয়াছিলেন। নাম ছিল কুসুম। মা কুসুমের শরীর শেষের দিকে এক কঠিন রোগে এত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট হাতে চুড়ি সহিত না। আমি চুড়ি খুলিয়া রাখিতে বলিলে সে সোনার চুড়ি খুলিয়া ফেলিল। কাচের চুড়ি দু'গাছি খুলিল না। আমি বলিলাম 'মা এই চুড়ি তোমায় বড় লাগে, উহাও খুলিয়া ফেল।' মা আমায় বলিলেন 'না জ্যেঠা, তা কি হয়, সোণাদিদি দিয়াছে, খুলিয়া ফেলিলে সে চাকরাণী বলিয়া তাকে তুচ্ছ করিলাম দেখিয়া সে দুঃখ করিবে। ক'দিনইবা আছি, হাতে পরি।' এই কাচের চুড়িপরা শীর্ণ হাত আপনি দেখিয়াছেন। বার বছরে

স্বর্গের ফুল হঠাৎ স্বর্গে চলিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'এই ছবি কি ঐ কন্যার'। তিনি বলিলেন "সব বলছি, ক্রমে শুনিয়া যান। কন্যাটীর মৃত্যুতে রামশরণ একেবারে মৃত প্রায় হইয়া পড়িল। তার দিন যায় ত রাত যায় না, রাত যায় ত দিন যায় না। মনকে শান্ত করিবার জন্য অন্নপূরের যে সকল মেয়ে কুসুমের সঙ্গে খেলা করিতে আসিত তাদেরে নিয়ে সে কিছু দিন পরে একটা পাঠশালার মত খুলিল। কয়েক বছরে তাদের উপর তার বেশ মায়া জন্মিয়া গেল। গ্রামে ভবদেব বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, এখনও বাস করেন বলিলে হয়। বাচস্পতি গ্রাম সম্পর্কে রামের বড় ভাই; তার একমাত্র মেয়ে রামশরণের নিকট আসিয়া পড়িত। একদিন এই মেয়েটী রামশরণের নিকট কুসুমের একখানি ফটো চাহিল। তার নিকট মেয়ের একখানি মাত্র ফটো ছিল; সেখানি সে ইহাকে দিয়া ফেলিল। মেয়েটী ছবিখানি হাতে লইয়া আয়নায় আপন মুখ দেখার মত দেখিতে লাগিল। ছবিখানি দেখিয়া রামশরণ কাঁদিতেছিল। এই সময় আচম্বিতে শব্দ হইল :—'বাবা, আমি স্বর্গে বেশ আছি, তুমি কেঁদ না, তোমার মেয়ে আমি এই মেয়েটীর মধ্যে রহিলাম। আমি এই মেয়ে, এই মেয়েই আমি। আমাকে মনে করিয়া ইহাকে তুমি স্নেহ করিও, তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা থাকিবে।' সত্যই সেই হইতে রামশরণের প্রাণ শান্ত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'এই ছবি কি কুসুমের'। বৃদ্ধ বলিলেন "ব্যস্ত হইবেন না শুনিয়া যান। মেয়েটী রামশরণের নিকট আসিত, খুব মন দিয়া পড়িত। রামশরণও এই ফুলের মতন মেয়েটীকে ফুলের মতন করিয়া তুলিতে খুব যত্ন করিতে লাগিল। সে সময়ে সময়ে বিলাইয়া দিবার জন্য এই মেয়েটীকে ফল ফুল মিঠাই মণ্ডা এবং ইলিশ মাছের আঁইসের মত চক্‌চকে সিকি দু'আনি দিত। মেয়েটী একে ওকে যাকে তাকে সব বিলাইয়া দিয়া বড় খুসি হইত। মেয়েটী দান করিত হাতে, শোভা বাড়িত তার মুখের। দেখেছেন ত রামের ছবি, কত জোয়ান। কতক দিন পরে সে অসুস্থ হইয়া পড়িল। মনও তখন তার বড় বিরস। জানেন, শুকনো বাঁশের বাঁশি ভিজাইয়া নিলে উহা হইতে অতি মিষ্ট সুর বাহির হয়। এই মেয়েটীর জন্য স্নেহে ভিজিয়া রামের ঐ শুকনো মন হইতে কত ছন্দ, কত কবিতা, কত গান বাহির হইতে লাগিল। সেই হইতে এই মেয়েটীকে উদ্দেশ্য করিয়া সে রামপ্রসাদের ন্যায় মা নামে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। কাল যে কুমারীপূজার সময় বাগান দেখেছেন, রাম ইহার পর ঐ ফুলের বাগান তৈয়ার করে। বাগানে কত ফুল, কত জাতি, কত রং, কত গন্ধ। এই ফুল সব ঐ মেয়ের জন্য। রাম, পারে ত পথময় ফুল ছড়াইয়া রাখে আর ঐ মেয়েটী তার পদ্মের মতন পা দুখানি ঐ ফুলের উপর ফেলিয়া চলিয়া আইসে। আপন হাতে সে, কত ফুলের কত রকমের মালা গাঁথিয়া কত রকম করিয়া মেয়েটীকে সাজাইত। রাম কখনও গাইত "চন্দনে লেপিয়া পাও, পদচিহ্ন রেখে যাও"। ইহারই দু'একটী শব্দ কাল রাত্রে শুনিয়াছিলেন। গাহিত কেবল তা নয়, মেয়েটীর রাঙ্গা পায় রক্ত চন্দন লেপিয়া সে আপন গায় ও মাথায় মাখিত। (দেওয়ালের পদচিহ্নের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ পদচিহ্ন ঐ মেয়ের। আপনি কি ভাবছেন ঐ মেয়ে—মানুষ! মানুষ নয় গো। মানুষ নয়! ঐ মেয়ে যিনি আদি কাল হইতে আছেন, যিনি মেয়েরূপে, মায়ারূপে, স্নেহরূপে—সে ঐ মেয়ে।

"রামশরণের তখন বৃদ্ধ মাতা বর্ত্তমান। হঠাৎ তাহার মাতৃদেবীর মৃত্যু হইল। সে মেয়ে হারা, মা হারা। মার শ্রাদ্ধের দিন মেয়েটী বলিল "দেখ এই আমি মা হইয়া তোমার ঘরে রহিলাম।" এই মেয়ের সাথীদের কাহারও নাম ছিল পদধূলি, কাহারও যমুনা, কাহারও সরস্বতী। কাল রাত্রে শিশিগুলিতে যে ধূলা দেখিয়াছেন ঐ সব নামওয়ারি এই সব মেয়েদের পায়ের ধূলা। যে চুল গাছি দেখিয়াছেন ঐ চুল কাহার, খাতায় তাহা লেখা নাই। উহার সঙ্গে একগাছি সোণার তার আছে তাহাও আপনি দেখিয়াছেন।

"ভবদেব বাচস্পতি উদাসীনের মত লোক। তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান। তিনি বৎসরের মধ্যে অনেক সময় প্রয়াগে থাকেন। মেয়েটীর বয়স হইয়াছে কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতায় বিবাহ হয় নাই। মেয়েটী এক বর্ষাকালে তাহার পিতা মাতার সঙ্গে প্রয়াগে চলিয়া গেল। সে চক্ষের আড়াল হইল বলিয়া রামশরণ অতি কাতর হইয়া পড়িল। উভয়ে পত্র চলিত।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'ইহাদের পত্র আপনার নিকট আছে ?' তিনি বলিলেন "অতি যত্নে রাখিয়া দিয়াছি, পত্রগুলি দিতেছি এই দেখুন।" আমি অনেকগুলি পত্র পড়িলাম। একখানিতে লেখা দেখিলাম রামশরণ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—'মা, মাখন সাদা মারবেল হইয়া গেলেও পাথর তো বটে! তোমার মন অতি কঠোর হইয়া গিয়াছে।' বালিকাটী এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া উহার উত্তরে লিখিয়াছে "কাকা, আমি নিঠুর হই নাই, শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা হইবে।" একটী অদ্ভুত বিষয় এই—'এই নিঠুর হই নাই হইতে দেখা হইবে' ছত্রের তলে ঠিক কুসুমের হাতের ভাঙ্গা ভাঙ্গা লেখা—"বাবা ইহাকে নিঠুর মনে করিও না, আমিও যেমন তোমার মেয়ে, এও তেমি তোমার মেয়ে" লক্ষ্য করিলাম। মিশ্র ঠাকুরও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া এই ভৌতিক লেখা বুঝাইয়া দিলেন

বৃদ্ধ তৎপর বলিতে লাগিলেন "মেয়েটী প্রয়াগ হইতে আর ফিরিল না। রামশরণ তখন অতি বিষন্ন মনে কখনও আকাশের দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিত—এই মনে করিয়া বুঝি বা সে কোন কাজে চাঁদের দেশে চলিয়া গিয়াছে, এখনই হয়ত নামিয়া আসিবে। কখনও সে মাটীর দিকে একদৃষ্টে দেখিত, মেয়েটী বুঝিবা মাটী ফুঁড়িয়া করিয়া উঠিয়া আসিবে। কখনও ভাবিত, সে আকাশে তারা হইয়া ফুটিয়া আছে। ঐ সকল তারা কাছে দেখিবার জন্য ছাতে যে এক প্রকাণ্ড আরসি পাতিয়াছিল তাহা আপনি কাল সন্ধ্যায় দেখিয়াছেন। ভাবনায় ভাবনায় রাম অতি অসুস্থ হইয়া পড়িল। সে একখানা অতি পরিপাটী সাড়ি কিনিয়া রাখিয়াছিল ; ভাবিত হায়! তাহা আর তাহাকে পরান হইল না। (দেওয়ালে ছ'গাছ চুড়ির দিকে নির্দেশ করিয়া) ঐ ছগাছা সোণার চুড়ি গড়াইয়া রাখিয়াছিল, ভাবিত—হায়! তাহা আর তার হাতে উঠিল না। মেয়েটী পদ্মের মত মস্ত গোলাপ ফুল বড় ভালবাসিত। রাম, বাগানে আপন হাতে যত্ন করিয়া একটী গোলাপের গাছে বড় ফুল ফুটিবার মতন সার দিয়াছিল। শরীর দুর্ব্বল হইলেও লাঠিতে ভর দিয়া সে বাগানে যাইয়া দেখিত, গোলাপের কুঁড়ি হইয়াছে, ফুল ফুটিবে। ভাবিত হায়! তাহাকে আর সে ফুল দেওয়া হইবে না। ফুলটি ফুটিল। রাম অতি কষ্টে বাগানে যাইয়া সে ফুল তুলিয়া আনিল। সাড়ির উপর রাখিল। সাড়িতে আলতার রং দিতেছে; তার কাছে

সোণার চুড়ী রাখিল। সোণা ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মেয়েটী তাকে ক'টী ফুল দিয়াছিল। রাম রূপার কৌটায় তাহা রাখিয়াদিয়াছিল। সে ফুল ও কৌটা কাল রাত্রে আপনি দেখিয়াছেন। এই সমস্ত সম্মুখে করিয়া সে যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল মেয়ে ঐ সাড়ি ও চুড়ি পরিয়া ঐ মস্ত গোলাপ হাতে লইয়া তার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম উচ্চ গলায় কি আনন্দে কি আশায় তার সত্য মেয়ে সত্য মার নিকট এক স্তব পাঠ করিতে লাগিল, তার দুনয়নে জল পড়িতেছিল। সে পড়িতে লাগিল :–

যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে। সুধামাখা 'সেবা', নাম, আর কার কাছে॥
যদি বল ছাড় ছাড় মা আমি না ছাড়িব। বাজন নুপুর হয়ে মা, তোর চরণে বাজিব॥
চরণে লিখিতে নাম, আঁচড় যদি যায়! ভুমিতে লিখিয়া থুই নাম, পদ দে গো তায়॥
শঙ্করী হইয়া মাগো গগনে উড়িবে। মীন হয়ে রব জলে মা. নখে তুলে লবে॥
নখাঘাতে মা আমার যখন যাবেগো পরাণী। কৃপাকরে দিও মাগো, রাঙ্গা চরণ দুখানি॥
যেখানে সেখানে মরি মা, মরিগো বিপাকে। অন্তকালে জিহ্বা যেন মা মা বলে ডাকে॥

"এই স্তবেরই কয়েকটী ভাঙ্গা কথা কাল রাত্রে শুনিয়াছিলেন। রাম কাঁদিল আর গাইল, গাইল আর কাঁদিল। আমি তখন বাহিরে দাঁড়াইয়া; স্থির থাকিতে পারিলাম না, কাঁদিতে লাগিলাম। সে আবার গাইল :—

ভেঙ্গে গেছে সে আনন্দের হাট। শূন্য পড়ে আছে আনন্দের মাঠ॥
শেষের সে দিনে অসাড় এদেহ রহিবে মাটিতে পড়িয়া।
স্নেহ স্বরূপিণী ছুঁয়ো মা, উহারে; অমৃত পরশে পলকে সে শব উঠিবে পুলকে জাগিয়া॥

"স্তব সত্য, গান সত্য কিন্তু কই তার মেয়ে, কই তার মা; ভুল সব ভুল! রাম মেয়েটীকে না দেখিয়া আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কুসুমের চিত্র করাইতে চাহিল। হায়! ফটো তার কাছে নাই। প্রয়াগে লিখিল, উত্তর পাইল না। কিছুদিন পরে (এই চিত্রেরদিকে নির্দ্দেশ করিয়া) আপন হাতে অতি যত্নে তোলা ফটো অনুযায়ী সে এই তৈলচিত্র তৈয়ার করাইল। এইখানে প্রতিষ্ঠা করিল। নিত্য এমনি ফুলে সাজান হয়। স্তবে বুঝিয়াছেন এই মেয়ের নাম সেবা। বাচস্পতির মেয়ে—এই মেয়ের নামে সেবাশ্রম। আংটীতে সেবার নাম খোদা দেখিয়াছেন।

"দিনের পর দিন গেল। মাসের পর মাস গেল। মেয়েটী আর আসিল না। রামশরণ তখন শয্যা নিয়াছে। আমাকে ডাকিয়া লইয়া সে এক উইল করিল। এই সেই উইল। মিতাক্ষরা মতে স্বকৃত সম্পত্তির উইল। পৈত্রিক সম্পত্তির মালীক আমি। যত দিন আছি তত দিন আছি; মনন করিয়াছি সেবাশ্রমে সব দিয়া এক দিকে চলিয়া যাইব। শুনিয়াছি ঢাকায় এক দল পরোপকারী লোক আছেন, তাঁহাদের কেহ উছি হইতে পারেন না কি?" আমি বলিলাম "তা পরে বলিতেছি। রামশরণ বাবুর শেষে কি হইল?" বৃদ্ধ বলিলেন "এক দিন বড় গরম, দুপর বেলায় সেই মরণ-বিছানায় শুইয়া কাতরে করজোড়ে ক্ষীণ স্বরে রাম বলিতে লাগিল "মা আমার, জননী আমার, অতীতের স্মৃতি আমার, বর্ত্তমানের বিশ্বাস আমার, কবে আসিবি মা, কবে দিবি মা, তোর রাঙ্গা চরণ তরী—পারের

তরী" এই বলিয়া কাহাকে যেন ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। হাত অবশ হইয়া পড়িয়া গেল। ওঠ যেন কাহাকে ডাকিতে চাহিল' ওঠের ডাক আর ফুটিল না। চোখ যেন কাহাকে দেখিতে চাহিল, চখের পলক আর পড়িল না। সব শেষ।

"আমরা তাহাকে শশ্মানে লইয়া গেলাম। শেষ শয্যা করিয়া তাহাকে চিতায় তুলিয়া দিলাম। কাঠ সাজাইলাম। হায়: হায়! সে আমায় মুখানল করিবে, না আমি তার মুখাগ্নি করিতে যাইতেছি। এম্নি সময় কোথা হইতে আকাশ হইতে কি পাতাল হইতে আচম্বিতে শশ্মানে সেবা উপস্থিত। আলু থালু তার চুল। আলু থালু তার শাড়ি। তার বাতাসে যেন কি একটা ঢেউ খেলিল। ঐ ঢেউ লাগিয়া চিতায় শোয়া রাম উঠিয়া বসিল। ঐবুঝি তার শেষ গান সত্য' সে চোক চাহিল—সেই হাসি হাসি মুখ। মুখ হইতে আচম্বিতে এক শব্দ বাহির হইল—মা! এ কি কাণ্ড! ভয়ে আমরা সব আড়ষ্ট হইয়া সরিয়া পড়িলাম। আবার তাহার মুখ হইতে তিন বার ডাক মা, মা, মা। সাধা সুরে মা নাম—যে নামে পাথর গলে, বোবায় বলে, সেই মা নাম। রাম সেবার দিকে হাত বাড়াইল। সেবা, কাকা ব'লে যেই তাকে ছুঁইল, রাম অমনি চিতায় পড়িয়া গেল। এই বার সব শেষ। শ্মশানবন্ধুরা কাঠে আগুন দিল, চিতা জ্বলিয়া উঠিল। ক'ঘণ্টার মধ্যে ছাই এর দেহ ছাই হইয়া গেল। মেয়েটী কোন্ দিক দিয়া কোন্ দিকে অন্তর্হিত হইয়া গেল কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, যাহারা এখনও সেই শ্মশানে মরা পুড়িতে যায় তাহারা এখনও কখন কখন শুনিতে পায়, সেই চিতার ধারে সেই চিনাসুরে কে ডাকিতেছ:—

মা—মা—মা; কে উত্তর দিতেছে:—কাকা কাকা কাকা—বাবা বাবা বাবা!

দাহ কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তাহার ঘরে দেখিতে পাইলাম—এক খানি পত্রে লিখা আছে "জেঠা, সেবা যদি ফিরিয়া আইসে তাহা হইলে দশ হাজার টাকায় তাহাকে এক খানি বাড়ী করিয়া দিও, ফুলের বাগান ফলের বাগান শুদ্ধ। ঐ উইলের সঙ্গে এই আমার চরম পত্র।" কত খুঁজিলাম সেবার আর সন্ধান পাইলাম না। এখন এই অয়রান পুরীতে এই অনন্ত ধ্বনি লইয়া আমি একা আছি। অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত ধ্বনি ঐ শ্মশানে, অতৃপ্ত স্নেহের অনন্ত ধ্বনি এই রামনিবাসে। কাণে ধ্বনি, প্রাণে ধ্বনি,। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে এ ধ্বনি অনন্ত কালের জন্য যেন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এ ধ্বনি কখন ও কোন্ ফুলটী ফুটিবার, কোন্ গন্ধটুকু পাইবার, কোন্ পাখীটী গাইবার, কখন কোন্ তারাটী ফুটিবার, কাহার চিত্তের কোন্ আবেগ, কোন্ নদীর কোন্ কল্লোল, কোন্ বাতাসের কোন্ হিল্লোলের, কেনইবা কতটা সময় ব্যবধানের প্রতীক্ষা করে, কেমন করিয়া বলিব। কেমন করিয়া বলিব, কত টুকু শীতাতপে এ স্নেহ-কোনে চাবি পড়ে।"

বৃদ্ধ ও আমি নীরব। যে কক্ষে রামশরণ বাবুর চিত্র সেই কক্ষ হইতে উচ্চ ধ্বনি আসিতে লাগিল মা—মা—মা; আর এই কক্ষে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সেবার সেই বাঁধুলি-বিনিন্দিত চিত্রিত অধর স্পান্দিত হইতেছে, আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—সকরুণ উত্তর আসিতেছে:—কাকা কাকা কাকা, এই যে আমি।

গোরক্ষনাথের পূজা।

পৌরাণিক যুগে বৈদিক দেবতাদিগের মানবী করণ হইয়াছিল ; অরূপ দেবতারা রূপ পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সময়ে—বিশেষতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার যুগে—মানব বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও সিদ্ধ পুরুষগণ দেবতার পদ লাভ করিয়াছিলেন ; দেবতার মতই সিদ্ধ পুরুষগণের পূজার প্রচার হইয়াছিল।

গোরক্ষনাথ, মীননাথ, একনাথ প্রভৃতি নাথাখ্য যোগিগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধ বা জৈন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। গুপ্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহারা বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন। নাথ যোগিগণের মধ্যে গোরক্ষনাথই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইনি গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতীর গুরু ছিলেন। বাঙ্গালার অনেক মন্ত্রে গুরু গোরক্ষনাথের 'দোহাই' আছে। এই 'দোহাই' হইতেই তাঁহার প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। যাঁহার আজ্ঞায় হলাহলের জ্বালা দূর হয়, তিনি যে দেবতা হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? সদাশিবের আজ্ঞার মত, গুরু গোরক্ষনাথের আজ্ঞা ও হাড়ীঝী চণ্ডীর আজ্ঞা, বাঙ্গালার স্থাবর জঙ্গম, ভূতপ্রেত, দৈত্যদানবেরা মানিয়া চলিত।

একালে ভূত প্রেতের উৎপাত কমিয়া যাওয়ায়, গোরক্ষনাথের দোহাই বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। একালের ওঝারা 'ডাক্তার' নাম লইয়া রসে ও কসে আরোগ্যের ব্যবস্থা করেন, মন্ত্র ডাকেন না, দোহাই দেন না। সুতরাং বাঙ্গালায় মন্ত্র লোপের সঙ্গে সঙ্গে গুরু গোরক্ষনাথের সিদ্ধ-প্রভাব ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে।

কিন্তু নব্য ওঝারা না ডাকিলেও পল্লীর গৃহস্থ ও রাখালগণ এখনও গোরক্ষনাথকে বিস্মৃত হয় নাই। গৃহস্থ ও রাখালের নিকট গোরক্ষনাথ গো-রক্ষাকারী দেবতা। গোরক্ষনাথের কৃপায় গরু বাঁচে, গাই বিয়ায়, অগ্রহায়ণে গো-বৎসের নর্ত্তনে কৃষকের প্রাঙ্গণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। সুতরাং যাহার গাই আছে সেই গোরক্ষনাথের 'ধার' ধারে। বৈশাখ মাসে স্বীয় গাভীর দুগ্ধে ক্ষীরের লাড়ু করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ—যাহাদের গাই বিয়াইয়াছে—গোরক্ষনাথের 'ধার' শোধ করে। গোরক্ষনাথের 'ধার' শোধই, গোরক্ষনাথের পূজা। এ পূজায় নৈবেদ্য নাই, ফুল, চন্দন, বিল্ব পত্র, তুলসী বা দূর্ব্বার প্রয়োজন হয় না। এক মাত্র, ক্ষীরের

লাড়ুই এ পূজার সকল উপকরণ। রাখালগণ ইহার পুরোহিত, 'হেচ্চ' ইহার বীজমন্ত্র। যদিও 'পর্‌থম' বৈশাখেই পূজার কথা—ইহার মন্ত্র সমূহের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বৈশাখ মাসের যে কোন দিন সন্ধ্যা-কালেই পূজা হইয়া থাকে। গৃহস্থ ক্ষীরের লাড়ু দিনেই প্রস্তুত করিয়া রাখেন। লাড়ুগুলির আকার টিকটিকীর ডিমের মত। সন্ধ্যাকালে পাড়ার সকল রাখাল গৃহস্থের প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। একজন রাখাল বা কোন প্রাচীন কৃষক, গোরক্ষনাথের 'রণা' গাইতে থাকে। রণার এক একটি চরণ বলা হইলে, সকল রাখাল সমস্বরে 'হেচ্চ' বলে। 'রণা'র পরে নাচাড়ী গাওয়া হয়। এই 'রণা' ও 'নাচাড়ী'ই গোরক্ষনাথের আবাহন, পূজা ও বিসর্জ্জনের মন্ত্র। রণা গাইবার সময়ে রাখালগণ সম্মুখে একখানা পিঁড়ীর উপরে গরুর একগাছি দড়ী ও একখানা 'লড়ী' রাখিয়া দেয়। এই দড়ীও লড়ীকে গোরক্ষ দেবতার প্রতিমা বা চিহ্ন বলা যাইতে পারে। 'রণা' ও 'নাচাড়ী' গান সমাপ্ত হইলে কতকগুলি ক্ষীরের লাড়ু গোরক্ষনাথের উদ্দেশ্যে আড়াইবার * মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর অবশিষ্ট লাড়ুগুলি রাখালদিগের হাতে হাতে দেওয়া হয়। যে লাড়ুগুলি মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়; উহাও রাখালেরাই লইয়া যায়। অধিকাংশ রাখালই হাত দিয়া এই লাড়ু তুলিয়া লয়, কেহ কেহ চিৎ হইয়া পা ও হাতের উপর ভর করিয়া মুখ দিয়া এই ভূ-পতিত লাড়ু তুলিয়া থাকে। এইরূপে লাড়ু তুলিয়া লওয়ার নাম "বাঁকের লাড়ু খাওয়া।"

লাড়ু খাওয়ার পরে, একজন ব্যতীত সমুদয় রাখাল গোয়াল ঘরে প্রবেশ করিয়া 'অরো' দেয়। মুখ, অল্প ফাঁক করিয়া 'অ-ও' শব্দ করিতে করিতে হাতের তালু দিয়া মুখের উপর আস্তে আস্তে আঘাত করিলে যে শব্দ হয়, উহার নাম অরো। গোয়ালে রাখালেরা 'অরো' দিলে বাহিরে দণ্ডায়মান রাখাল জিজ্ঞাসা করে—

তোরা কে ?
আমরা গোর্‌ক্ষের রাখাল।
গেছিলি কোথায় ?

---

* প্রথম দুইবারে যে পরিমাণ লাড়ু ফেলিয়া দেওয়া হয়, তৃতীয় বার তাহার অর্দ্ধেক দিতে হয়। ইহারই নাম আড়াইবার লাড়ু দেওয়া।

গাই বাছুর আশীর্ব্বাদ কর্‌বার।
দেখ্‌লি কি কি ?
বারশ্‌ বলদ তেরশ গাই।
বাছুর কত লেখা জোখা নাই।
ডেক্‌রা গরুতে পারাইয়া মারল
ঝাপ খুইলা দে বাড়ীৎ যাই।

এই উত্তর দিয়া গোয়ালঘরের রাখালেরা দরজা খুলিয়া বাহির হয়। উহারা বাহির হইতে আরম্ভ করিলে বাহিরে দণ্ডায়মান রাখাল উহাদের গায় জল ছিটাইয়া দেয়। এইরূপে গোরক্ষের ধার শোধ হয়।

'গোর্‌খুনাথ' ঠাকুরকে কৃষক মাত্রেই ভয় ও ভক্তি করে। গোর্‌খুনাথ কে, তাহা উহারা জানে না, কিন্তু ইনি রুষ্ট হইলে গরু বাছুরের অকল্যাণ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে। 'রণা'র মতে গোরক্ষনাথ ঠাকুরের মূর্ত্তি "হাতে লড়ী, মাথায় টিক"। এক্ষেত্রে গোরক্ষনাথের যোগী মূর্ত্তির কথা নাই; রাখালের গোরক্ষনাথ মুণ্ডিত মস্তক বা জটাধারী নহেন, তাঁহার মাথায় 'টিক', হাতে গো-রক্ষকের জন্য লগুড় বা লড়ী। এই রাখাল দেবতা নদীর কূলে 'পিক পারেন' (?)। রণার মধ্যে গোরক্ষনাথের বর্ণনা ব্যতীত পাট, বাঁশ ও ধানের কথাও আছে। গো-পালন করিতে এ তিনটিরই প্রয়োজন। পাট হইতে দড়ী, বাঁশ হইতে লড়ী, এবং ধান হইতে 'খড়' পাওয়া যায়।

রণা। *

১

রণা রণা	হেচ্চ।	ফুল্‌কা রণা	হেচ্চ।	ফুলের কড়ি	হেচ্চ।
নয় নয় বুড়ি	,,	তাই দিয়া কিন্‌লাম	,,	কপিলেশ্বরী	,,
দুধ হয় কি	,,	হাড়ী হাড়ী	,,	অন্যে পানাইলে	,,
ছিটা ফোটা	,,	গিরস্তে পানাইলে	,,	হাড়ী হাড়ী	,,

* রণা শব্দের অর্থ নির্ণয় করা গেল না। ইহা গোরক্ষনাথের পূজার ইতিহাস ও মন্ত্র উভয়ই বলা যাইতে পারে। রণার সংখ্যা এগারটি। প্রত্যেক রণার শেষেই— "বল রাখালয়া সাব সুবইর"—এই কথা বলিতে হয়। "সাব সুবইর"—অর্থ বুঝা গেল না।

এক বানের দুধ হেচ্ছ গোরখে খায় হেচ্ছ এক বানের দুধ হেচ্ছ
বাছুরে খায় ,, এক বানের দুধ ,, গিরস্তে খায় ,,
আর একবানের দুধ পাইতা দই ,, মইল্লা ঘি ,,
তাই দিয়া লাগাইছি মোমবাতি হেচ্ছ বল রাখালরা শাব শুবইর।

২

সাত পাঁচ রাখালে তুইলা মাটী হেচ্ছ। হাট বসাইল সিন্দুইরা হাটি হেচ্ছ।
অরে অরে সিন্দুইরা ভাই ,, আমার গোরখের সিন্দূর চাই ,,
তোমার গোরখ কেম্‌নে চিনি ,, হাতে নড়ী মাথায় টিক ,,
গাঙ্গের কুলে পারেন পিক ,, পিক পাইরা পাইরা তুইলা মাটী ,,
হাট বসাইল কুমাইরা হাটী ইত্যাদি — বল রাখালরা শাব শুবইর।

৩

শাব শুবইরে শুব সাজে, ,, কাণা কড়িটা ঝুনইর বাজ ,,
বাজে ঝুনইর বাজুক তাল ,, এই গির হান জগত মাল ,,
জগত মালে রাণী ঘণী " সোণা বান্ধা পাঁচ থলী ,,
সোণা হে ডাক শুয়া " মোর গোরখে খায় গুয়া ,,
গুয়া খাইতে লাগল চুন " অমনি গেল বিকরমপুর ,,
বিকরমপুর পাইকপাড়া ,, তিন ছয় আটার ঘোড়া ,,
ঘোড়ায় খোড়ায় যুঝিব ,, গোরখের ধার শুঝিব ,,
বল রাখালরা শাব শুবইর।

৪

মাসী বলে মুইন্‌সা মোর কথা শোন— পরথম বৈশাখে পাট বোন্‌ ,,
যখন পাটে অঙ্কুর " গোরখুনাথ ব্যাকুল ,,
যখন পাটে করল গেড়া " গোরখনাথ দিল বেড়া ,,
যখন পাটে করল মাথি ,, গোরখনাথ ধরল ছাতি ,,
যখন পাটে বাও খেলায় ,, গোরখনাথ কাচি গড়ায় ,,
আগা ফালাইয়া গোড়া ফালাইয়া ,, তার মাঝখান জলে ফালাইয়া ,,
জলে ফালাইলে হইব কুইয়া ,, ছায়ে লোয়ে লইও ধুইয়া ,,
ধুইয়া লইয়া দিও রৌদ্র ,, পাট হইবে মোড়া চৌদ্দ ,,
পাটে বলে মুই বড় বীর ,, হাতী বান্ধুম হাতী থির ,,
গরু বান্ধুম গরু থির বল রাখালরা শাব শুবইর।

৫

বাঁশ বাঁশ আরাইঙ্গা বাঁশ	হেচ্চ	বাঁশের জন্ম কার্ত্তিক মাস	হেচ্চ
গোরখ গেলেন হাতে দাও	,,	বাঁশ কাটিল পূরের গার	,,
আগা ফালাইলা নিল মালী	,,	তাই দিয়া বানাইল ফুলের ডালি	,,
গোড়া ফালাইল নিল মালী	,,	তাই দিয়া বানাইল শলা আটী	,,
হোট নড়ী উপরে দাও	,,	নড়ী চাছে এই ভাও	,,
সোণার নড়ী বিষ্কল গুণে	,,	রাখাল ছোড়াইল গোরখের পুণ্যে	,,

বল রাখালরা শাব শুবইর।

৬

গোরখের রাখাল বজর বাটা	,,	ভাইঙ্গা আইল কুশা কাটা	,,
গোরখের রাখাল বজর বাটা	,,	ভাইঙ্গা আইল ঢেউরা কাটা	,,

বল রাখালরা শাব শুবইর।

৭। রাখালের মাথায় সোণার জটা ,, খসাইয়া ফালাও কুশা কাটা ,,

বল রাখালরা শাব শুবইর।

৮। এই গিরিহান উদয় নাট ,, গরুএ কর্‌ল পূব ঘাট ,,

বল রাখালরা শাব শুবইর।

৯। ধান কাটি কাটি	হেচ্চ	পারাইয়া নাড়া	হেচ্চ
ই গায়ের আপদ যাইক	,,	উত্তর পাড়া	,,

বল রাখালরা শাব শুবইর।

১০। উত্তর চকে	হেচ্চ	বগা চরে	হেচ্চ
চরুক বগা	,,	পিউক পানি	,,
আজ গোরখের	,,	নাড়ু বিলানি	,,

বল রাখালরা শবে শুবইর।

১১। আস্‌ল গোরখুনাথ	হেচ্চ	বস্‌ল পাটে	হেচ্চ
হাতে হাতে	,,	প্রসাদ বাটে	,,

বল রাখালরা শাব শুবইর!

নাচাড়ী।

হেচ্চ—আইল গোধন গরু লইয়া আইল বর,
হাতখানি নড়ে চড়ে যুগ যুগান্তর।

হেচ্চ গোয়াল কামাইতে নারী করে ছিন ভিন
তার বাড়ী ধেনু থাকে সত্যের আড়াই দিন।

„ শনি মঙ্গলবারে গোবর বিলায়,
পালের পরধান গাই গাবর (১) ফালায় (২)

„ হস্তিনী শঙ্খিনী চিত্রানী পদ্মিনী নারী চারিজন,
চারি নারীর চারি বাখান শুন দিয়া মন।

„ হস্তিনী নারীর যেমন পায়ের গোছা মোটা
মাথায় খাগইরা চুল, চোখ্ দুইটা নাটা।

„ হস্তিনী নারী যেমন হাতীর মত খায়,
ভরা রাইঙ্গের ভাত ফুঁ দিয়া উড়ায়।

„ ভরা রাইঙ্গের ভাত ফুঁ দিয়া উড়ায়,
ভরা কলসীর জল ত্রাসেতে শুখায়।

„ হস্তিনী নারীর যেমন হস্ত মাথার চুল,
দেওর খাইল ভাশুর খাইল, খাইল শ্বশুর।

„ শ্বশুর খাইল ভাশুর খাইল, খাইল নিজ পতি,
লাফ দিয়া উঠ্‌ল গিয়া বাপ ভাইয়ের বাড়ী।

„ বাপ খাইল, মা খাইল, খাইল জ্যেষ্ঠ ভাই,
তবু সে হস্তিনী নারী হাসিয়া বেড়ায়।

„ থুমথুমিয়া হাটে নারী চোখ পাকরাইয়া চায়,
খাট পালঙ্ক ছাইরা লক্ষ্মী পলাইয়া যায়।

„ মাচিৎ থাইকা কথা কয়, দুয়ারে থাইকা শুনে,
সিংহাসন ছাইরা লক্ষ্মী হায় হায় করে বনে।

„ ইহ সব নারীর কথা শুন দিয়া মন,
শঙ্খিনী নারীর কথা কহি বিবরণ।

„ শঙ্খিনী নারীর যেমন হাতে শঙ্খ বাজে,
কালরাত্রে খাইল পতি নাকের শুহাসে (৩)

„ খাইয়া পরিয়া নারীর না পুরিল আশ,
ছয় মাসের কালে নারী করে সর্ব্বনাশ।

---

(১) গাবর—গর্ভ। (২) ফালায়—ফেলে। গাবর ফালায়—গর্ভপাত করে।

(৩) শুহাসে—শ্বাসে।

হেচ্চ ধবল বস্ত্র পরে নারী মুখে গুয়া পান,
লক্ষ্মী বলে ঐ নারী আমারী সমান।
,, পাও দিয়া তোলে শয্যা পুরুষেরে বলে তুই
লক্ষ্মী বলে ঐ বাড়ী না থাকিমু মুই।
,, ভাত রাঁধিয়া নারী পুরুষের আগে খায়,
সেই জন্য তার স্বামী ভাতের দুঃখ পায়।
হেচ্চ—ইহ সব নারীর কথা শুন দিয়া মন,
পদ্মিনী নারীর কথা কহি বিবরণ।
,, পদ্মিনী নারীর যেমন পদে থাকে মন,
তার স্বামী আইনা দিল কাঠা ভরা ধন।
,, ধন পাইয়া নারীর আরো বাঞ্ছা মনে,
লক্ষ্মীদেবী আসন কর্‌লেন রত্নসিংহাসনে।
,, লক্ষ্মীদেবী আসন কর্‌লেন রত্নসিংহাসনে
সোণার নীলকমল ছিল পদ্মিনীর কোলে।
,, চিনিলাম চিনিলাম আমি স্বামী বড় ধন,
যত ধন আইনা মোরে করে সমাপ্পন।
,, স্বামী হেন ধন নাই আর দুনিয়ার উপরে,
কড়ার সিন্দুর সে না পড়্‌বার পারে।
,, সতী নারীর পতি যেমন পর্ব্বতের চূড়া,
অসতী নারীর পতি ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।
হেচ্চ—ইহ সব নারীর কথা শুন দিয়া মন,
চিত্রানী নারীর কথা কহি বিবরণ।
,, চিত্রানী নারীর যেমন চিন্তায় যায় কাল,
কোথা যাও প্রাণনাথ আসিও সকাল।
,, রাত পোহাইলে ছড়া দেয় সন্ধ্যাকালে বাতি
লক্ষ্মী বলে সেই ঘরে আমার বসতি।
হেচ্চ—বাছুরী কপিলা মর্ত্ত্যেতে আসিলা
নরলোকে তরাইবার তরে।
,, গোবর মৃত্তিকা শুদ্ধ দধি দুগ্ধ ঘৃত,
মুনিদের অষ্ট যজ্ঞে লাগে।

হেচ্চ—গাই থাকে ঠাইরে বাছুরী অন্য ঠাই,
রাত্রিকালে মায়ে ছায়ে দেখা শুনা নাই।
হেচ্চ—আগাপায়ের সনেরে বাছুরী বান্ধিও
পাছা পায়ের সনে ছান্দদড়ী লাগাইও।
,, একধারা দুধ আগে বসুমাতে দিও.
তিনধারা দুধ শেষে দোনায় দোহাইও।
,, একধারা দুধ যদি নড়িনামা হয়,
চোরা ধবলা বলি পাঁজর ভাঙ্গিবারে চায়।
,, কিল খাইয়া গাভীরে কাপড়ে পড়ল মন,
আপনি হইল চোর আপনার দুধের কারণ।
,, দুধ বেচিয়া বেওয়া আনল পয়সা কড়ি,
পরথম বৈশাখে আমরা গোর্খের পূজা করি।
,, যতছিল রাখালগণ দিয়া নিমন্ত্রণ,
পরথম বৈশাখে পূজা করলাম আরম্ভণ।
,, বার সত্ত নারীগণ তের নাহি পূরে,
সেইসব নারীরা আইসা গোর্খের পূজা করে।
,, যতছিল রাখালগণ বসিল সারি সারি
পরথম বৈশাখে মোরা গোর্খের পূজা করি।
,, স্বর্গে ছিল গোরক্ষ নাথ মর্ত্ত্যে দিল হাত,
তাহার পরসাদ যেমন বাটে হাতে হাত।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

একটী গোলাপের শাখার জন্য।

ব্রহ্মদেশের কাজল কালো পাহাড় ঘেরা একটী সহরের প্রান্তদেশে, ছোট্ট একটী ঝরণা। তরল রূপার মত স্বচ্ছ তার জল। সে ঝরণার পাশে ছোট্ট একটী কুটীর। তার উপর একটী লতা—লতাইয়া উঠিয়া পাতায় পাতায় ছাউনি ঢাকিয়া দিয়া যেন একখানি সবুজ রঙ্গের জাল বুনাইয়া

রাখিয়াছিল। রোজ ভোরে—তার উপরে লাল লাল ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিত, আবার সন্ধ্যা বেলা তারা ঝরিয়া গিয়া ঝরণার জলে ভাসিয়া যাইত!

সে ছবির মত সুন্দর কুটীর খানির মালিক পেওলা। সহরে পিঁপড়ের সারির মত মানুষ থাকিতেও পেওলার জন্য তার বুড়া বাপ ছাড়া আর কেউ ছিল না। এবং এত সুখের পণ্যভরা ব্রহ্মদেশেও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বই আর তার কোনও সঙ্গতি ছিল না! বুড়ার বুকের বাতি অনেক দিন নিভিয়া গিয়াছে; কারণ পেওলা মায়ের দুধ ছাড়িবার আগেই তার মাকে হারাইয়া ছিল! বুড়ার চোখের জ্যোতিও নিভিয়া গিয়াছে, কারণ সেই হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে অন্ধ হইয়াছিল। বুড়ার চোখের মাণিক, অঞ্চলের নিধি, অন্ধের যষ্টী—পেওলা। আর তার কেহ নাই—কিছু নাই!

পেওলার বাপের কতকগুলি দুধের গোরু ছিল; পেওলা রোজ সকালে সহরে বড় লোকদের বাড়ীতে দুধ বেচিত, তারপর চটপট ঘরের কাজ সারিয়া লইয়া, গোরুগুলি পাহাড়তলীর কচি ঘাসের উপর চরিতে দিয়া নিজে জলপাই গাছের ছায়ায় বসিয়া সেলাই করিত, বই পড়িত, কখনো বা ঘুমাইয়া পড়িত! বুড়া তখন একলা ঘরে বসিয়া, শীর্ণ করে তার পুরাণো বাঁশীটী কম্পিত ঠোঁট দুখানির উপর তুলিয়া তার সুদূর যৌবনের প্রেমার্থিনীর প্রিয় সঙ্গীতটী বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া সারাদুপরটা চোখের জলে ভাসিত! তার সাধের প্রেমার্থিনী পরলোক হইতে তার দেহ-হীন হৃদয় লইয়া, হৃদয়-লীন ব্যাকুলতা লইয়া, মরণ-হীন স্নেহ লইয়া, তার জন্মান্তরের, বড় সাধের গানটী শুনিবার জন্য নিঃঝুম দুপুরে সেই অন্ধের কাছে আসিয়া বসিত কিনা কে জানে!

দুঃখ এবং দৈন্যের মাঝেও, সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী কখনো পেওলার চোখ দুটী ভুলেন নাই—বনের হরিণী যেন তারি কাছে দৃষ্টি মাধুর্য্য শিখিয়া গিয়াছে! এক কথায় বলা যায়—তার রূপের উপরে দুঃখ, তাঁর দুঃখের উপরে রূপ! "কমল উপরে জলের বসতি—তাহাতে বসিল তারা!" হৃদয় খাঁন যেন তার একটী ভাবে ভরা চৌদ্দ লাইনের সনেট্। ছ লাইনে তার প্রেমের স্বচ্ছতা, বাঁকী শুধু অশ্রুজল।

দুধ বেচিয়া আসিয়া, রোজ সকালে যে আঁকা বাঁকা রাস্তাখানি ধরিয়া পেওলা গোরু চরাইতে যায়, তার ধারে পড়ে—একখানা বাগান বাড়ী। মাঝখানে কালো আবলুসের তৈরী পগোডার ধরণের একখানি বিচিত্র

কাঠের ঘর। বাগান খানিতে সাদা লাল, হলদে, কালো—নানান্ রঙ্গের গোলাপের কুঞ্জ—খালি গোলাপ। বাগানের চারিধারে কোমল ঘ্রাণের ঘন জালের বেড়া—আর কোনও রূপ বেড়া নাই। প্রেমের অন্ধ দেবতা যেন সে বাগানখানি তাঁর ফুলের বাণ চাষ করিবার জন্য চিরবসন্তের নিকট ইজারা দিয়া রাখিয়াছেন! তারি পাশ দিয়া পেওলা রোজ সকাল সাঁঝে আসে যায়; আর সে ফুলের বনে ঝাঁজরা দিয়া জল ঢালিতে-ঢালিতে যে সঞ্চারিণী মাধবীলতার যাওয়া আসা চোরা চোখে দেখে—সে ফুল বাগানের তরুণ মালীক মংহ্লান! এমনি করিয়া মংহ্লানের হৃদয়খানি রোজ সকালে বিকালে আরবী আতরের গোলাপী নেশায় ভরিয়া উঠিত—এমনি করিয়া গোলাপের কাঁটা বনে রোজ সকাল সাঁঝে ফুলের জোয়ার আসিত!

২

সে দিন সকাল বেলা পেওলা তার দুধের গোরুগুলি লইয়া চরাইবার জন্য গোঠের দিকে আনমনে চলিতেছিল। চাঁদের ক্ষীণ রেখাটী তখনো আকাশের এক কোণে পড়িয়াছিল; প্রদোষের শুভ্র আলো, মুক্তা চুয়ানো লাবণ্য ধারার মত নীল পাহাড়ের গাছ আলার উপর সবে ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়াছে! পেওলার মাথার চুল চূড়ার ধরণে বাঁধা। পরণে রং জ্বলা রেসমী চারখানা সাড়ি—গায়ের উপর জাপানী সাটিনের ঝুলা আস্তিনওয়ালা আঙ্গিয়া। চোখে তার ঘুম ঘোর, মুখের উপর স্বপ্নের আলো ছায়া মাখানো! সে যেন সত্যি সত্যি বাস্তবের সীমানা পার হইয়া কোন এক মধুর স্বপ্নের দেশেই বরাবর চলিয়া যাইতেছিল।

আজ পেয়ালার গোরুগুলি রাস্তায় চলিতে চলিতে সেই বাগান বাড়ীর ফটক খোলা পাইয়া গোলাপ কুঞ্জে প্রবেশ করিল। পেওলা তখন কি জানি কি ভাবের নেশায় বেঁহুস, তাই সেও গোরুগুলির পিছনে পিছনে ফুল বাগানের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যে কি করিতেছিল, কোথায় যাইতেছিল, সে দিকে বড় একটা খেয়াল ছিল না! তখন গোলাপ গাছে ঝাঁজরা দিয়া জল ঢালিতে ঢালিতে মংহ্লান মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। কারণ মুগ্ধার জন্য ফুলের ফাঁদ আজ পাতিয়া রাখিয়াছিল সে নিজেই।

বাগানের মাঝামাঝি আসিয়াও যখন পেওলার ভুল ভাঙ্গিল না, তখন মংহ্লান গোলাপ গাছের একখানা কুঁড়িধরা ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে পেওলার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল—পেওলার ভাবের ঘোর কাটিয়া

গেল! এ কি আশ্চর্য্য! সে যে মাঠে যাওয়ার পথ ছাড়িয়া একেবারে বাগানের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে! পরের বাগান, বহুমূল্য গোলাপ গাছে ভরা, তারি মাঝে—কি সর্ব্বনাশ! আর গোরুগুলি ফুল শুঁকিয়া শুঁকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! পেওলা ছুটিয়া গিয়া গোরুগুলিকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিল, কিন্তু তখন মংহ্লান তার সমুখের পথ একেবারে অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে! সে হাসির দেয়াল ডিঙ্গাইয়া চলিবার ক্ষমতা পেওলার ছিল না! মংহ্লান যদিও ফুলের পয়মালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেই আসিয়াছিল, গোরুতে যে তখনো বাগানের ডালপালা ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া পয়মাল করিতেই ছিল এবং সেইটাই যে নিবারণ করা দরকার, সে দিকে তার কিছু মাত্র আগ্রহ দেখা গেল না!

মংহ্লান বলিল:- "তুমি কে গা? আমার ফুলের বাগান অমন করে লোকসান করে দিচ্চ?"

পেওলা লাল হইয়া মাটীর পানে চাহিয়া বলিল:- "বড় অন্যায় হয়েছে, এখনি গোরুগুলি বের করে নিচ্ছি।"

মংহ্লান একটু রাগের ভাণ করিয়া বলিল—"বল কি তুমি! এই দেখ তোমার গোরুতে আমার অত সখের বস্‌রা গোলাপের কুঁড়িধরা কচি ডাল খানা কেমন করে ভেঙ্গে দিয়েচে!" এই বলিয়া মংহ্লান গোলাপের ভাঙ্গা ডাল খানা পেওলার মুখের খুব কাছে আনিয়া ধরিল। তার দুচারটা পাতা পেওলার মুখ গাল ছুইয়া গেল, ফুল পাতার লাল সবুজ ছায়া খানি তার মুখের উপর খেলিয়া গেল, গোলাপের কোমল গন্ধ ভরা নেশাটী তার হৃদয়ে গিয়া ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল!

পেওলা তার হাত দুখানি জোর করিয়া নির্ঝরের কুলু কুলু ভাষার মত মৃদু স্বরে বলিল:—"বড় অন্যায় হয়েছে মহাশয়। যখন আর উপায় নেই, দয়া করে পথ ছেড়ে দিন, গোরু গুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাই।"

মংহ্লান বলিলেন:—"বেশ তো মেয়ে তুমি! আমার অত দামের ডাল খানা ভেঙ্গে দিলে, তার পর বল্‌ছ—উপায় নেই—চমৎকার কিন্তু!"

পেওলা লাজে লাল হইয়া গিয়া গাঢ় কণ্ঠে বলিল:—"এ যাত্রা মাপ্ করুণ আমায়!"

"মংহ্লান মাথায় বাঁধা রেশমী রুমাল খানা খসাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—"না লক্ষ্মীটী শুধু মিষ্টি কথায় সরবত হয় না! আমার ক্ষতি পূরণ করে—তবে আজ যেতে পাবে—নৈলে না!"

পেওলা তার পেলব কর্ণমূল আরক্তিম করিয়া তাড়াতাড়ি কাণের হুটী সোণার ফুল খুলিয়া লইয়া বলিল :—"তবে এই নিন আমার কাণের ফুল জোড়াটা! এর বেশী দিবার মতো আর কিছু নেই আমার!"

মংহ্লান ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"মিছে কথা!"

পেওলা তার সারসের মত গলা খানিতে তেজের সহিত একটা নাড়া দিয়া বলিল :- "মিছে কথা? গরীবের মেয়েরা মিছে কথা কয় না!"

মংহ্লান একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—তা যেন হলো! কিন্তু ও একরত্তি হুটো কাণের ফুলে তো আমার গোলাপের সারের দাম হবে না! তুমি ও কি দিচ্ছ আমায়?"

পেওলা ফলভরে নত কলম করা ছোট চারা গাছটীর মত নীচু দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। মংহ্লান নিঃঝুমের পালা ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন :- "আচ্ছা বেশ, দাম দিতে না পার—সাজা নিতে রাজি আছো বোধ করি?"

পেওলা হাঁপ ছাড়িয়া বলিল :—"একশো বার; যে সাজা আপনার খুসী!"

"তবে চল ঐ ডাল ভাঙ্গা গোলাপ গাছের কাছে—আজ কার মোকদ্দমায় সেই আমার বড় সাক্ষী!"

৩

হুজনে সেই ডাল ভাঙ্গা গোলাপ গাছের কাছে আঁসিয়া দাঁড়াইল।

পেওলা গাছটা খুব ঘেঁসিয়া খাড়া হওয়াতে তার আঙ্গিয়ার ঝুলা আস্তিনের নাড়া লাগিয়া গোলাপ গাছ হইতে কতকগুলি রাঙ্গা পাপড়ি ঝুর ঝুর করিয়া মংহ্লানের পায়ের কাছে পড়িয়া গেল।

মংহ্লান বলিল :—"যে সাজা আমার খুসী—দেখো, কথার নড় চড় হবে না তো?"

পেওলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"না"

মংহ্লান বলিল :—বেশ কথা! তবে শুনো আমার হুকুম! এই ভাঙ্গা গোলাপের ডাল খানা দিয়ে তোমায় আমি বেশ করে চাবকিয়ে দোবো।

পেওলা শিহরিয়া উঠিল! অপমানে লজ্জায় রাগে তার চোখে জল আসিতে চাহিল। হায় পুরুষ এত নিষ্ঠুর! তার এত লাঞ্ছনা, এত অপমান, শুধু গোলাপের একখানা ভাঙ্গা ডালের জন্য! এতক্ষণ সে বেশ কথা বলিতে ছিল; এবার যেন আর তার মুখ ফুটিতে চাহিল না।

পেওলাকে চুপ করিয়া খাড়া থাকিতে দেখিয়া মংহ্লান হি হি করিয়া

হাসিয়া উঠিল। সে হাসির চমকে নিকটস্থিত আর একটা গোলাপের ডালে বসা একটা দয়েল পাখী ভয়ে ডাল কাঁপাইয়া উড়িয়া গেল। সে হাসির শব্দে পেওলার মনের সকল দ্বিধা দুর হইয়া গেল। সে কঠিন হইয়া, মংহ্লানের পানে গোলাপেরি শাখার মত তার কোমল হাত দুগাছ বাড়াইয়া দিয়া বলিল ঃ—"এই নিন হাত বাড়িয়ে দিচ্চি, প্রাপ্য দু ঘা দিয়ে আমায় শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর বিদায় করে দিন।"

মংহ্লান পেওলার কোমল হাত দুগাছি মুগ্ধের মত আপনার হাত দুখানির উপর তুলিয়া লইয়া বার বার সে চুড়ি পরা মোহ ঘেরা স্বচ্ছ সুন্দর হাত দুখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সতৃষ্ণ চোখে দেখিয়া লইয়া বলিল ঃ— গোলাপের যে ডালখানা ভাঙ্গা গেছে. এ হাত তো তার চাইতে নরম নয়! তোমার হাতে দু ঘা মার্‌লে, তুমি আমার বস্‌রা গোলাপের ভাঙ্গা ডালের ব্যথা টের পাবে না!"

পেওলা হাত দুখানি টানিয়া লইয়া বলিল ঃ—তবে আপনার যেখানে খুসী মারুন।

মংহ্লান স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল ঃ—ভেবে কথা বলো, কথা দিয়া পরে ভেবো না কিন্তু!"

পেওয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল ঃ—"আসামীর সাজা সব সময় তার নিজের খুসী মত হয় না—আপনি যা হয় করুন।"

মংহ্লান হাসিয়া বলিল ঃ—"তবে দাঁড়াও, তোমার ঐ রাঙ্গা গাল দুটী দেখচি গোলাপেরি মতন নরম—সেখানে তোমায় আজ দু'ঘা সইতে হচ্চে!"

পেওলা ছল ছল চক্ষে বলিল ঃ—আপনার ক্ষতির জন্য আমি আজ সবি সইতে রাজি আছি।

মংহ্লান পেওলার দিকে আরো একটু অগ্রসর হইয়া বলিল ঃ—"তবে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াও—গোলাপ গাছ সাক্ষী!"

পেওলা পাণ্ডুর মুখে গোলাপ গাছের নিকট সোজা হইয়া চোখ বুজিয়া দাঁড়াইল। তখন উপরের আকাশে তৃষিত প্রার্থনার তরঙ্গ তুলিয়া একটা ছোট চাতক পাখী স্ফটিক জলের গান গাহিতে গাহিতে উড়িয়া যাইতে ছিল।

মংহ্লান পেওলার অরুণ রাঙ্গা গণ্ডস্থলে দুটী স্নেহের চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া হাসিয়া বলিল ঃ—"তোমাকে দিবার মত সাজা এর চাইতে কঠিন কিছুতেই হতে পারে না!"

পেওলা বনের আহত হরিণীর মত এক লাফে সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল ঃ—"আমরা গরীব স্ত্রীলোক, সাজা দিতে হয় দিন্, আমায় একলা পেয়ে অমন ব্যবহার করা আপনার ঠিক হয়নি!

মংহ্লান পেওলার মুখের পানে ভিখারীর মত করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল ঃ—"এর জন্যে আমায় দোষী মনে করো না তুমি! ভগবান বুদ্ধদেব সাক্ষী, আজ থেকে এ রত্নের মালিক আমি! তুমি আমার!"

পেওলা মংহ্লানের সবখানি কথা বিশ্বাস করিল না। মেয়েরা কখনো পুরুষদের সবখানি কথা বিশ্বাস করে না। তার স্বপ্নের রঙ্গমঞ্চে তখন আশা ও ভয়—পরীর মত নৃত্য করিতেছিল। সে একটু হটিবার ভাব দেখাইয়া বলিল ঃ—"আর-কেন! অপমানের উপর আর ছলনার দরকার নেই—এবার দয়া করে পথ ছেড়ে দিন্!" বলিতে বলিতে সে কয়েক পা সমুখের দিকে অগ্রসর হইল। মংহ্লান আবার আসিয়া তার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তারপর সে তার অঞ্জলি গোলাপ ফুলে ভরিয়া লইয়া, তৃষিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল ঃ—"দোহাই তোমার!—গোলাপ ফুলের দিব্যি আজ আর আমায় ফাঁকি দিয়ো না।"

পেওলার চোখ দুটী একটু ছল ছল করিয়া উঠিল। সে মংহ্লানের দিকে চাহিয়া বলিল ঃ—"আমি যে গরীব, জনম দুঃখী, তুমি যে ধনী।"

মংহ্লান আবেগ কম্পিত কোমল স্নেহের স্বরে বলিয়া উঠিল ঃ—যেখানে তোমাতে আমাতে দেখা—সেখানে কাঙ্গাল ধনী নেই—সে রাজ্যে সবাই সমান!"

পেওয়া তার চোখ দিয়া মংহ্লানের অন্তরখানি খোলা পুথির মত পড়িয়া ফেলিল। দেখিল, সেখানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা—আত্ম সমর্পন! তখন বিজয়ী সেনাপতির মত পেওলার মুখখানি গৌরবে উজ্জল হইয়া উঠিল। কাঙ্গালিনী যেন একমুহূর্ত্তের ইন্দ্রজালে রাজরাণীর মত গ্রীবা হেলাইয়া হাসিভরা চোখে মংহ্লানের মুখের পানে চাহিল! সে চাহনিতে লেখা ছিল—রণজয়ের ঘোষণাপত্র!

তখন গোলাপ বনে ফুলোৎসব.—বসন্তের মাতাল হাওয়া লাগিয়া গোলাপের ডালে ডালে ভারি রকমের একটা মাতামাতি পড়িয়া গেছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

অদৃষ্ট।

সেই ঋতু—আজো বিরাজিত,
সেই হাসি—হাসিছে প্রকৃতি,
সেই আমি—এখনো জীবিত,
—নাই সুধু সেই অনুভূতি।
এই আসে, হাসে, চলে যায়,
বিশ্ব ভরা যেন অবিশ্বাস ;
সেই হাসি—হাসি, কিন্তু হায়—
আসে পাছে, গুপ্ত দীর্ঘশ্বাস।
চেয়ে থাকি—দৃষ্টিহীন চোখে,
বুঝিনাকো—কি যেন কি নাই।
জ্বলে বুক—অশ্রুহীন শোকে,
মনে হয়—কি যেন কি চাই !

মনে হয়—আলোকে আঁধার,
মনে হয়—অশ্রুভরা হাসি,
মনে হয়—দুঃখের সংসার,
—নাই প্রেম, ভালবাসাবাসী।
জ্বলে সুধু আশার শ্মশানে—
ধূ ধূ ক'রে নিরাশার চিতা,
— মৃত্যু ! ওঃ হো, বুঝিনি জীবনে,
এক দিনে বুঝালে বিধাতা ?
কি ছিল কি হলো অন্তর্য্যামী ?
কি করিলে ? হায়রে কপাল !
সেই আমি আর এই আমি—
যেন ঠিক আকাশ পাতাল।

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

রামায়ণে রাজ-দোষ।

রাম আদর্শ রাজা, তাই তিনি ভরতের নিকট নীতিচ্ছলে ভরতের অবলম্বনীয় রাজনীতি গুলিরই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ভরতের চরিত্র জানিতেন, তাই তাহার নিকট রাজা কুনীতি পরায়ণ হইলে রাজ্যের যে কি অপকার হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। কিন্তু রামায়ণে তাহা অনালোচিত রহে নাই। মহাকবি রাক্ষস বংশ ধ্বংশের সঙ্গে সেই অনাচরনীয় নীতির আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।

রাজা অসচ্চরিত্র হইলে প্রজার অকাল মৃত্যু ঘটীয়া থাকে। রামায়ণে এই বাক্যের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অসৎ রাজার প্রকৃতি ও কার্য্য কলাপ অনুসরণ করিয়া শিষ্ট প্রজারাও অসৎ উপায়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সাধন করিয়া থাকে। (আরণ্য ৫০) তাহার ফলে অকালমৃত্যু স্বাভাবিক।

রাজার প্রধান কার্য্য প্রজা পালন। প্রজা প্রতিকূলাচারী রাজার পরিণাম সম্বন্ধে জটায়ু রাবণকে বলিতেছেন—

রাজ্যং পালয়িতুং শক্যং ন তীক্ষ্ণেন নিশাচর।
নচাতিপ্রতিকূলেন নাবিনীতেন রাক্ষস ॥ ১১
যে তীক্ষ্ণমন্ত্রাঃ সচিবা ভুজ্যন্তে সহতেনবৈ।
বিষমেষু রথাঃ শীঘ্রং মন্দসারথয়ো যথা ॥ ১২ (আরণ্য ৪১সর্গ।)

"প্রজাগণের নিতান্ত প্রতিকূলকারী, অবিনয়ী, তীক্ষ্ণস্বভাব রাজারা কখনই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না। পরন্তু মন্ত্রণা দাতা মন্ত্রীর সহিত অনুপযুক্ত সারথী চালিত রথের ন্যায় অচিরে বিনষ্ট হন।"

রাবণ মারিচকে সীতাহরণে সাহায্য করিতে বলিলে, মারিচ স্বেচ্ছচারী রাজার পরিণাম সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

ত্বদ্বিধঃ কাম বৃত্তোহি দুঃশীলঃ পাপমন্ত্রিতঃ।
আত্মানং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হন্তি দুর্ম্মতি ॥ ৭ (আরণ্য ৩৭।)

"তোমার ন্যায় স্বেচ্ছাচারী দুঃশীল রাজা আত্মিয় স্বজন ও রাজ্যের সহিত নিজকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।"

ফলে—হইয়াছিলও তাহাই। আমরা এই প্রসঙ্গে রাজ-দোষ গুলির আলোচনা করিব। পাঠক তাহা হইতে রাম কথিত রাজনীতির সার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। তিনি উঠিয়াই রাবণকে তাঁহার রাজ দোষ গুলির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—যে ভূপতি কর্ত্তব্য বিষয়ে মন্ত্রণা স্থির করিয়া ন্যায়ানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে কদাচ পশ্চাৎ সন্তাপিত হইতে হয় না।

"ন্যায়েন রাজ কার্য্যাণি যঃ করোতি দশানন।
নস সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থ মতির্নৃপং ॥" ৩০ (লঙ্কা ১২।)

কুম্ভকর্ণ আরও বলিলেন—যে রাজা করণীয় কার্য্য সমুহের অগ্র পশ্চাৎ বুঝে না, তাহার নীতিজ্ঞান অতি সামান্য—তিনি রাজনীতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। যে নৃপতির বল অধিক, তিনিই যে জয়শ্রীলাভ করিবেন—তাহা নহে। বুদ্ধিমান নৃপতি দুর্ব্বল হইয়াও বলবান শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকে। এবং সেই ছিদ্র দ্বারা বলবান শত্রুর শক্তি নষ্ট করে। সুতরাং বলবান ব্যক্তিকেও সুবিজ্ঞ নীতি পরায়ণ মন্ত্রিগণের পরামর্শে কার্য্য করিতে হইবে।

অন্যত্র কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিতেছেন—"যিনি মন্ত্রিগণের সহিত কর্ম্মের আরম্ভোপায়, পুরুষ দ্রব্যসম্পৎ, দেশকাল বিভাগ, বিপত্তি প্রতিকার ও কার্য্য-সিদ্ধি—এই পাঁচ প্রকার মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করেন, তিনিই যথার্থ নীতিপথের অনুসরণ করিয়া থাকেন। রাজন্ যিনি অমাত্যগণের সহিত সামাদির কার্য্যাকার্য্য বিচারে প্রবৃত্ত হন, তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে অমাত্যগণের মনোভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্দারা কে ই বা যথার্থ মিত্র এবং কে ই বা কেবল তোষামোদকারী তাহাও বুঝিতে পারেন। যিনি সাম, দান, ভেদ, বিক্রম ও পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার মন্ত্রণা, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বিষয় মন্ত্রণা পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি কখনই বিপদগ্রস্ত হন না।"

রাজা কেবল নিজ কুনীতির দোষেই নষ্ট হয় না। রাজার মনে কুনীতি প্রকাশ পাইলেও অনেক স্থলে সৎ মন্ত্রীর প্রভাবে সেই প্রশ্রয় প্রাপ্ত কুনীতিও কার্য্যকরী হইতে সমর্থ হয় না। কুম্ভকর্ণ রাবণকে মন্ত্রীদিগের বিষয় আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—"রাজার সর্ব্বার্থ তত্ত্ববিদ ও বুদ্ধিজীবী অমাত্য গণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে নিজ ইষ্ট সিদ্ধ হয়, এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অমাত্য বলিয়া পরিগণিত শাস্ত্রানভিজ্ঞ যে সকল পশুবুদ্ধি পুরুষগণ শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া বাচালতা বসতঃ যে সকল কথা বলিয়া থাকে, বিপুল ঐশ্বর্য্যাভিমানী নরপতিদিগের পক্ষে, তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানহীন মন্ত্রীর বাক্যা-নুসারে কার্য্য করা সমুচিত নহে। যে সকল কার্য্য-দূষক ব্যক্তিগণ ধৃষ্টতা বসত মন্দকেও ভাল বলিয়া বর্ণনা করে, তাহাদিগকে মন্ত্রণা কার্য্য হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। মহারাজ, আপনার বহু কুমন্ত্রী; আপনি প্রভু হইলেও আপনাকে উৎসন্ন করিবার জন্য আপনার দ্বারা অকার্য্য সকল করাইয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া আপনার সুমন্ত্রী সকলও আপনাকে কুমন্ত্রণাজনিত বিপদগ্রস্ত দেখিয়া শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া আত্মরক্ষা করে। সুতরাং আপনার মন্ত্রীদিকের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জানা উচিত।" (লঙ্কা ৬৩)

রাম কথিত রাজনীতিক প্রশ্নাবলীর প্রায় অধিকাংশ স্থলেই মন্ত্রী ও অমাত্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবার কথা আছে। মন্ত্রী পরিচয় করা রাজার একটী প্রধান গুণ এবং রাজ্য রক্ষার একটী প্রধান সহায়। রাম পুনঃ পুনঃ ভরতকে এই কথাটাই বলিয়াছিলেন।

মুখে সৎ উপদেশ এবং সত্য কথা বলিলেই যথার্থ হিতৈষীর কার্য্য করা হয় না। কুম্ভকর্ণ যেরূপ হিতোপদেশ দিয়া রাবণের বিরাগভাজন হইয়া-

ছিলেন; সূর্পণখার সেইরূপ উপদেশেই রাবণ সীতা হরণ রূপ পাপে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সূর্পণখা রাবণকে উত্তেজিত করিবার জন্য তাঁহার রাজ-দোষ সকলের উল্লেখ করিয়া তাহাকে প্রচুর ভৎ'সনা করে।

সূর্পণখা বলে—"যে রাজা তুচ্ছ সুখভোগে আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ, প্রজারা তাহাকে শ্মশান মধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় অনাদর করিয়া থাকে। যে রাজা স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করে না, সে রাজা রাজ্য ও সকল কার্য্যের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য ত ফল প্রসব করেই না, সঙ্গে সঙ্গে সেই অকৃতকার্য্যের জন্য রাজ্যও নষ্ট হয়। যিনি প্রমদাগণের অধীন, যাঁহার দর্শন অতি দুর্ল্লভ এবং যিনি চর প্রেরণ করিয়া রাজ্যের কোন তত্ত্ব রাখেন না, প্রজাগণ দূর হইতে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা ধন বিহীন, ও নীতি বিহীন, তিনি নীচ ব্যক্তির তুল্য। রাজরা চরদ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানের বিষয়ও দর্শন করিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা 'দীর্ঘচক্ষু' বলিয়াও উক্ত হন। অল্পদাতা, তীক্ষ্ণ স্বভাব, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ ভূপতি বিপদাপন্ন হইলে প্রজাগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্নবান হয় না। যে রাজা অভিমানী ও ক্রোধ পরায়ণ এবং যিনি আপনাকেই মনে মনে বিজ্ঞ বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহাকে কেহই প্রবোধ দিতে পারে না (অন্যের প্রবোধ মানেন না), বিপদের সময় তাঁহার আত্মীয়গণও তাহাকে বিনাশ করে। যে রাজা নিজে কার্য্য সম্পন্ন করেন না, এবং ভয় উপস্থিত হইলেই ভীত হন, তিনি অচিরাৎ রাজ্যচ্যুত ও দীন হইয়া তৃণ তুল্য হন। নিদ্রাতেও যাঁর নীতি নেত্র জাগরিত থাকে, যাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ কথায় না হইয়া কার্য্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, সকলেই সেই নৃপতির পূজা করে। মহারাজ, তুমি অন্যের অবমাননাকারী, বিষয়াশক্ত, দেশ কাল বিভাগে অসমর্থ এবং দোষ গুণ নির্ণয়ে চিত্ত নিবেশে অসমর্থ; সুতরাং তুমি অচিরেই রাজ্যচ্যুত হইবে।" (আরণ্য ৩৩ সর্গ)

সুর্পণখার এই সকল উক্তি হইতে কেহ রাবণকে রাজনীতি অনভিজ্ঞ বলিয়া মনে করিবেন না। সুর্পণখা অপেক্ষা, এমন কি আদর্শ রাজা রাম অপেক্ষা রাবণ কম বিজ্ঞ ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। সুর্পণখা কেবল রাবণকে উত্তেজিত করিবার জন্যই এইরূপ তীক্ষ্ণ বাক্য বাণে তাহাকে ব্যথিত করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার কার্য্যও সিদ্ধি হইয়াছিল। এক সময় কৈকেয়ীর মুখ হইতেও এমন ধর্ম্ম-নীতির উপদেশ বাহির হইয়াছিল, যে

সে ধর্ম্মনীতি আদর্শ রাজা দশরথকে স্ত্রৈণ নামে অভিহিত করিয়া রামের ন্যায় পুত্রকে বিনা বিচারে বনে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কৈকেয়ীর মুখে যে ধর্ম্মনীতি ও সুর্পণখার মুখে যে রাজনীতি বাহির হইয়াছিল, তাহা স্বার্থ সাধনের কূটনীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুর্পণখার উক্তি হইতে তৎকালীন সমাজ প্রচারিত রাজ-দোষ সমূহের আভাস পাওয়া যায়, তাই এই অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

রাজনীতি সর্ব্বদাই কূটনীতি। মহাত্মা রামের উপদেশের ভিতরও সেই কূটনীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—ইহা পাঠক চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন। রাবণ এই কূটনীতি প্রভাবে মর্ত্তে অমরাবতী সংস্থাপণ করিয়াছিলেন।

রাবণ রাজনৈতিক ত্রুটীতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমন কোন নিদর্শন রামায়ণে নাই।

"অতি পাপে নষ্ট পাইল লঙ্কার রাবণ।"

রামায়ণে ইহারও প্রমাণ অভাব। কেন না পরস্ত্রীগমন ও পরস্ত্রীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ তৎকালের সেই অনার্য্য রাক্ষস সমাজের ধর্ম্ম বলিয়াই রামায়ণে কথিত হইয়াছে।

স্বধর্ম্মো রক্ষসাং ভীরু সর্ব্বদৈব ন সংশয়ঃ।
গমনং বা পরস্ত্রীণাং হরণং সম্প্রমথ্য বা॥ ৫　(সুন্দর ২০)

রাবণের ব্যক্তিগত গুণ সম্বন্ধে হনুমান বলিতেছে—"রাবণ যুদ্ধার্থী বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অতি ধীর, তিনি সর্ব্বদা সাবধানে স্বচক্ষে নিজ বল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।" (লঙ্কা ৩)।

অন্যত্র বিভীষণ বলিতেছেন—"দশানন বেদ বেদাঙ্গ পারগ, মহাতপা ও অগ্নি হোত্রাদি কার্য্যের বিধান অনুষ্ঠাতা।"

উত্থান পতন জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অমোঘ নিয়মে মহাবীর নেপলিয়ানের পতন এবং ইহারই নিয়মে বিচিত্রবীর্য্য রাক্ষস বংশের ধ্বংশ হইয়াছিল।

মৃত কুক্কুরের সদ্গতি।

"পুনর্জন্ম না হইলে কাহারও উদ্ধার হয় না" এই কথা গালিলির মহাযোগী অতি অল্পাক্ষরে যেরূপ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, অন্য কোন দেশের কোন ঋষি সেরূপ বলিয়াছেন কিনা জানি না। আমরা কিছু ভাবিয়া দেখিলেই এই বাক্যের সত্যতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। জড় জগতের কোন বস্তুরই উদ্ধার সাধন হইত না, অথবা জড়ত্ব ঘুচিত না, যদি তাহা কোন না কোন রূপে জীব-জগতের অঙ্গীভূত না হইত। জীব-জগৎ তিন ভাগে বিভক্ত। মনুষ্য, মনুষ্যেতর জীব এবং উদ্ভিদ্। এই তিন শ্রেণীর জীব যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক বা অনিচ্ছায় জল, লবণ, বায়ু, ধাতু প্রভৃতি জড় বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্ব অঙ্গীভূত করিয়া লয়, তখন সেই সেই জড় বস্তুর জড়ত্ব অপগমিত হয়—তাহা জীব রাজ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এবং জড়ত্ব হইতে অল্পাধিক কালের জন্য মুক্তি বা উদ্ধার লাভ করে। এইরূপ পুনর্জন্ম প্রতি নিয়তই হইতেছে। জল, ধাতু, লবণ প্রভৃতি যে সকল জড় বস্তু উদ্ভিদ্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ বৃক্ষ, লতা, শাক প্রভৃতিতে যাহাদের পরিণতি হইয়াছে সেই সমস্ত বৃক্ষ, লতা শাকাদি মনুষ্য ও অন্য জন্তুদ্বারা ভক্ষিত হইয়া অঙ্গীভূত হইলে উচ্চতর জন্ম গ্রহণ করে, ইহা বলা যাইতে পারে। ইতর জন্তু এবং জড় বস্তুকে ভক্ষণ করিয়া অথবা অন্যরূপে অঙ্গীভূত করিয়া মনুষ্য সেই জন্তুর ও বস্তুর উদ্ধার সাধন করিতে পারেন অথবা ব্যাঘ্র কুক্কুরাদি দ্বারা ভক্ষিত হইয়া বা অন্যরূপে তাহাদের অঙ্গীভূত হইয়া সেই জন্তু ও বস্তু সদ্গতির পরিবর্ত্তে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপে মনুষ্য নিজকে দেব সেবায় নিযুক্ত করিলে দেবেই লীন হইতে পারেন। ইহাই মনুষ্যের মুক্তি।

কিন্তু এই গুরুতর বিষয় অদ্য আমার আলোচ্য নহে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আলোকিত ইয়োরোপ ও আমেরিকায় মৃত কুক্কুরের কিরূপ সদ্গতি হইয়া থাকে, তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

মৃত কুকুরের অস্থি ও বসা জ্বাল দিয়া তাহাতে শোডা নামক ক্ষার মিশাইয়া লইলে মেদ শর্করা (Sugar of fat) বা গ্লিসরিন্ প্রস্তুত হয়। উহাতে কিঞ্চিৎ লবণদ্রাবক (Hydrochloric acid) মিশ্রিত করিলে Smelling salt প্রস্তুত হয়। গ্লিসারিন দিয়া আরও কতরূপ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই নাসারন্ধ্র দিয়া মনুষ্য শরীরে প্রবেশ লাভ

সাহিত্য সেবক।
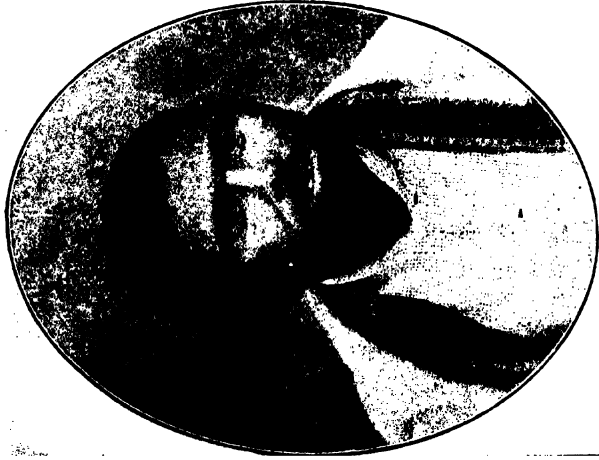
শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।
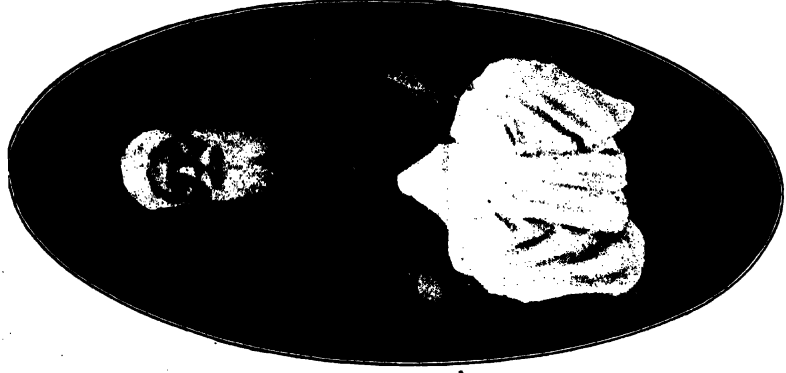
শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী।
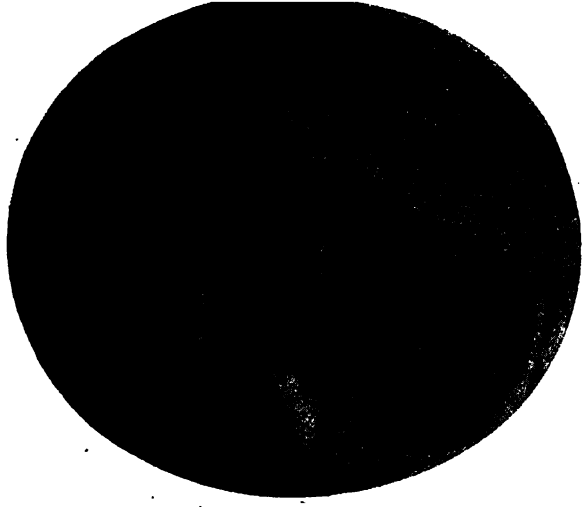
করে। গ্লিসরিন যোগ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হয়, তাহা দিয়া আমরা হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া সন্তোষ লাভ করি। গ্লিসরিনের সহিত কার্‌মাইন্ (Carmine) মিশ্রিত করিয়া অঙ্গরাগের জন্য উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হয়। তাহা লাগাইয়া মহিলারা গণ্ড ও ওষ্ঠের বর্ণ সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধিত করেন। কুকুরের চর্ম্ম, শিরা ও অস্থি হইতে জেলাটিন (Galatine) নামক বস্তু প্রস্তুত হয়। এই জেলাটিন দিয়া জেলি নামক মোরব্বা প্রস্তুত হয়। চিনি শোধন করিতে হইলে কুকুরের অস্থি পোড়াইয়া সেই অস্থির অঙ্গার দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। সুতরাং কুকুরেরই কিয়দংশ চিনিতে মিলিত হইয়া থাকে; সেই চিনি আমরা চা কাফি, মোহনভোগ পিষ্টকাদিতে ব্যবহার করি। কুকুরের চর্ম্মদ্বারা জুতা ও দস্তানা প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা পরিয়া থাকি। ফ্রান্সে এই আদেশ ছিল যে, আশ্রয়হীন সমস্ত কুকুরকে গুলি করিয়া মারিয়া সেন নদীতে ফেলিয়া দিতে হইবে। বহু সহস্র কুকুর শব এইরূপে সেন নদীতে নিক্ষিপ্ত হইত। মুর্দাফরাসেরা তুলিয়া লইয়া তাহাদের চামড়া ছাড়াইয়া “ছাগ-শিশু-চর্ম্ম-নির্ম্মিত” দস্তানা প্রস্তুত করিত এবং অস্থি মাংস জ্বাল দিয়া সাবান ও বাতি প্রস্তুত করিত।

নান্‌সেন্ এবং আমন্দ সেন্ যথাক্রমে যখন সুমেরু ও কুমেরু আবিষ্কার করিতে যান তখন অনেক কুকুর সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের দলের লোকের উদরস্থ হইয়া ছিল। ভারতবর্ষেরও বহুলোক কর্ত্তৃক গৌণভাবে কুকুর অঙ্গীকৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন

সাহিত্য সেবক। (২)

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি—১২৭২বঙ্গাব্দের ২৩শে মাঘ শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মৈনা গ্রামের প্রাচীন জমিদার বংশে অচ্যুত বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺অদ্বৈতচরণ চৌধুরী। অচ্যুত বাবু বাল্যকাল হইতেই বীণাপাণির সেবায় নিরত। তিনি বাঙ্গালার বিলুপ্ত ও জীবিত প্রায় অধিকাংশ পত্রিকায়ই বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্ব সর্ব্ববাদী সম্মত। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে যিনিই যখন লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তিনিই অচ্যুত বাবুর সাহায্য গ্রহণ

করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ প্রচার ব্যতীত তিনি কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থও প্রচার করিয়াছেন। ১২৯৯ সালে তাঁহার প্রথম পুস্তিকা 'ভক্ত নির্য্যাণ' প্রকাশিত হয়। অতঃপর ক্রমে শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসের জীবনী (১৩০০), শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট জীবনী (১৩০২), শ্রীমৎ হরিদাস জীবনী (১৩০৩), শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী (১৩০৯), সাবাস ছবি (১৩১০) শ্রীচৈতন্য চরিত (১৩১১), শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (১৩১৭) ও সাধুচরিত (১৩১৯) প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্য চরিত গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে একটী স্বর্ণ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৩০৬ সালে শ্রীহট্টের মাসিক পত্র "শ্রীহট্ট দর্পণ" বাহির হইলে অচ্যুত বাবু তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি বৈষ্ণব সমাজ হইতে 'গৌরভূষণ' ও অতঃপর 'ভক্তিসাগর' এবং শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত সমাজ হইতে 'তত্ত্বনিধি' উপাধি প্রাপ্ত হন। অচ্যুত বাবু এখনও সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত আছেন। "শ্রীনিতাই লীলা লহরী" নামে তাঁহার একখানা পুস্তক ছাপা হইতেছে। তিনি তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি "শ্রীহট্ট জেলার ইতিবৃত্ত" উত্তরাংশ প্রেসে দিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত—নিবাস ছোট বিন্নাকৈর, পিতার নাম শ্রীযুক্তউমেশচন্দ্র গুপ্ত, জাতি বৈদ্য। এম্, এ, বি, এল পাস করিয়া রঙ্গপুর ওকালতি করিতেছেন। "রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়" প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত—মাসিক পত্রের লেখক। প্রাচীন নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর; বর্ত্তমান নিবাস কলিকাতা। অতুল বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস সি পাস করিয়া এলাহাবাদ কমিস্রেরিয়েটে কার্য্য লইয়া যান। সেই স্থান হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত তিব্বত অভিযানে—তিব্বত গমন করেন। তাঁহার তিব্বত অভিযান সম্বন্ধীয় চিত্তাকর্ষক সচিত্র প্রবন্ধ 'সৌরভে' প্রকাশিত হইবে। বঙ্গ সাহিত্যে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ এই নূতন। অতুল বাবু এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেছেন এবং প্রবাসে থাকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের অধীন দেওভোগ গ্রামে অতুল বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ। অতুলবাবু জামালপুর (ময়মনসিংহ) হইতে ১৮৯৬ সনে প্রবেশিক পরীক্ষা পাশ করেন ও ঢাকা কলেজ হইতে এফ, এ পাস করেন। কলেজ ছাড়িয়া ১৯০৪ সনে শিক্ষকতা

গ্রহণ করেন, অতঃপর শিলং একাউন্টেণ্ট জেনারেল আফিসে কেরাণী নিযুক্ত হন। সম্প্রতি বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের একাউন্টেণ্ট আফিসে কার্য্য করিতেছেন। পাঠ্য অবস্থায়ই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। 'প্রতিভা'য় তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'ছেলেদের চণ্ডী', 'সর্ব্বানন্দ', 'শাক্যসিংহ', 'ধ্রুব', 'ভগীরথ', 'অৰ্দ্ধকালী' প্রভৃতি বালক বালিকাদিগের উপযোগী কতিপয় গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু গুহ—১২৫৫ সালে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বেলতা গ্রামে অনাথ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺মৃত্যুঞ্জয় গুহ। অনাথ বাবু বি, এল পাশ করিয়া ময়মনসিংহে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ময়মনসিংহের 'বাঙ্গালী' মাসিক পত্রের একজন লেখক ছিলেন। ১২৮২ সনে "ভারতমিহির" প্রকাশিত হয়। "ভারতমিহিরে" তাঁহার চিন্তাপ্রসূত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। "চারু-মিহির প্রতিষ্ঠায় ইনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং লেখক ছিলেন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁয়রপুর গ্রামের বৈদ্য বংশে ১৭৯৪ শকের ২রা আশ্বিন অনুকূল বাবু জন্ম গ্রহন করেন। তাঁহার পিতা ৺ নবকুমার গুপ্ত—এক জন সাহিত্য সেবী ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। অনুকূল বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর ও অতুলানন্দ গুপ্তও এক জন সাহিত্য সেবী ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "নারীধর্ম্ম" "যোগিনী," "আদর্শ" প্রভৃতি গ্রন্থের এক সময়ে বেশ আদর ছিল। বাল্যকাল হইতেই অনুকূল বাবু সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। ষোল বৎসর বয়সে সারস্বত সমাজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি পিতার কর্ম্ম—গণিজ স্কুলের হেড্ পণ্ডিতি গ্রহণ করেন। তখন হইতেই তিনি "ঢাকাগেজেটে" নিয়মিত রকমে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। সতর বৎসর বয়সে সারস্বত সমাজ হইতে সাহিত্য শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া "কাব্যরত্ন" উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর গবর্ণমেণ্টের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "কাব্যতীর্থ" উপাধি প্রাপ্ত হন ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান। সংস্কৃত কলেজে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া অনুকূল বাবু কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন (পরে মহামহোপাধ্যায়) মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৩০১ সালে ঢাকায় আসিয়া "শাস্ত্রী"

উপাধি গ্রহণ করিয়া কবিরাজি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি কবিরাজি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া "বান্ধব", "ভারতী", "নবপ্রভা", "প্রদীপ," "সুধা," "আরতি", "উৎসাহ", প্রভৃতি বহু মাসিক কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৩১৭ সাল হইতে তাঁহার সম্পাদকতায় শিশু-পত্রিকা "তোষিণী", বাহির হইতেছে। "আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী" ও তাঁহার সম্পাদকতায় প্রথম বাহির হইয়াছিল। "ছেলেদের নূতন গল্প", "গল্প গাথা" প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছেন। এখনও তিনি অধিকাংশ সময় সাহিত্য চর্চ্চায়ই অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

ভ্রমসংশোধন—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের জন্ম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ। তাঁহার পরিচয় স্থলে ভুলক্রমে ১২৬১ সালের ১ লা মাঘ হইয়াছে।

প্রতিশোধ।

তারা সবে হেসে যবে উঠিল সহসা,
শিশুটী জাগিল কাঁদি জনম বাসরে!
ভাবিল সে, একি লীলা! এ কেমন হাসা!—
নেহারি নবীন পান্থ বন্দী কারাগারে!

নিয়তির স্রোত বহি কাল সিন্ধু পানে,
বন্দীরে শিখাল প্রেম নবীন যৌবন;
তার পর?—বৃদ্ধ বেশে পশি রঙ্গভূমে
অভিনয় করে গেল "নিশার স্বপন"!

বন্দীশালে থেমে গেল, নিদ্রার উৎসব—
মৃত্যু, করে মুক্তি পত্র, দেখা দিল ধীরে
নিশীথের তট প্রান্তে, জাগিল ভৈরব,
বৈতরণী কলরোল, নীল ঊর্ম্মি শিরে!

স্নেহ যবে মৃত্যু পরি ঝরিল ক্রন্দনে
স্থির চক্ষে সৌম্য হাসি দেখা দিল শবে,—
কহে যেন,—মনে নাই?—মোর জন্ম ক্ষণে
আমারে কাঁদিতে দেখে, হেসেছিলি সবে!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

সঙ্গীত।

ভারতে তোমরা আজি জনপ্রিয়
ঈশ্বরী আর ঈশ্বর !
প্রকৃতি রঞ্জন প্রকৃতি দোঁহার
জিনিল কোটি কোটি অন্তর।
হৃদি সিংহাসন সবার উপরে
তার কাছে সব গরিমা তুচ্ছ—
এ আলোক নৃপ, জ্বালিয়া জীবনে
উদিলে আঁধারে ভাস্কর !

আছিল ভারত দ্বিধায় ভ্রান্ত,
বরাভয় দিয়ে করিলে শান্ত,
শাসনে করিলে সুন্দর ;
কত রাজা রাজ্য প্রতাপ-গর্ব্বে
লইবে কাল পাতাল-গর্ভে ;
নবযুগ নিয়া
ভারতে আসিয়া
অমর হ'লে অমর !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চিন্তা ঃ—শ্রীরসিকচন্দ্র বসু প্রণীত। ঢাকা আলবার্ট লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য বাধাই ॥০ আনা, সাধারণ কাগজে বাঁধাই ।৶০ আনা।

সুপণ্ডিত রসিক বাবু সৌরভের পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন। তিনি 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া ও বাঙ্গালি পাঠকের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। এখন তিনি প্রাচীন সাহিত্য হইতে সতীচরিত্র আহরণ করিয়া বাঙ্গালার স্ত্রী পাঠ্য গ্রন্থের অভাব পূরণ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বন্যায় আমাদের সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, বিলাসের বিলোল বিভ্রমে নরনারী আত্মহারা হইয়া ভ্রান্ত আদর্শের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে ; এই সময় যিনি আদর্শ সতী চরিত্র গুলি ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন ও তদ্বারা সমাজের গতি ফিরাইতে সাহায্য করেন, তিনি সমাজের ধন্যবাদের পাত্র। চিন্তার আদর্শ চিত্র রসিক বাবু অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। লেখকের ভাষা চিন্তা চরিত্রের মতনই নির্ম্মল ও মধুর। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহার চিন্তার আদর দেখিলে আমরা সুখী হইব। গ্রন্থে কয়েক খানি সুন্দর চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার বেগম—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত ; প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা। আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৬৪ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে বাঙ্গালার ছয়টী বেগমের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নবাবগণ বেগম দিগের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেন ; সুতরাং বেগমদিগের চরিত্রের উপর দেশের সুখ দুঃখ নির্ভর করিত। গ্রন্থকার সেই বেগম চিত্র প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায় পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থে অনেক নূতন কথাও আছে, ভাষাও সরল। গ্রন্থ সচিত্র, ছাপা-কাগজ উৎকৃষ্ট

স্বর্গীয় রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ।

ASUTOSH PRESS, DACCA.

সৌরভ

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩২০ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

চন্দ্রালোক।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

পরমতে সম্মানন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কেবল অপব্যবস্থা দিতেন না এমন নহে; অপরের সঙ্গে যদি স্বীয় ব্যবস্থার মিল না দেখিতেন, তবে নিজের মত বহাল রাখিবার জন্য জেদও করিতেন না। যাহাতে ব্যবস্থা শাস্ত্র যুক্তি সঙ্গত হয়, তজ্জন্য অপর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ একজন প্রাণতুল্য প্রেমাস্পদের শ্রাদ্ধাদি কৃত্য করিতে হইয়াছিল। আদ্য শ্রাদ্ধের পরাহে মাসিকগুলিও করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু শ্রাদ্ধোদ্দিষ্ট ব্যক্তির মৃতাহ হইতে সংবৎসর মধ্যে যে একটি মলমাস ছিল, সে কথা অনবধানতা বশতঃ কাহারও মনে উদিত হয় নাই। যাহা হউক; পরে যখন ভুল বাহির হইল তখন সংশোধন কিপ্রকারে হয়? আমাদের সমাজের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত * ব্যবস্থা দিলেন; পতিত মলমাসের ক্রিয়াটি করিলেই চলিবে। গঙ্গাতীরে গিয়া ঐ টি কোনও এক অমাবস্যায় করিব মনে করিয়া কলিকাতা গেলাম—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ও বিষয়টি বলিলাম। তিনি বলিলেন—আমার বোধ হয় তোমার সমস্তগুলি মাসিক পাণ্টাইয়া করিতে হইবে। যাহা হউক, যখন একজন বড় পণ্ডিত ব্যবস্থা দিয়াছেন, আমি অদ্যই পূর্ব্বস্থলীতে মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন মহোদয়ের অভিমত কি জানিবার নিমিত্ত চিঠি দিতেছি।" সে যাত্রা আমার ক্রিয়া হইল না; কিন্তু ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের উত্তর আসিবা মাত্রই তিনি পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, আমাকে কেবল একটি (অর্থাৎ মলমাসের) মাসিক করিলেই চলিবে।

* জলসুখা নিবাসী স্বর্গীয় উমাকান্ত তর্করত্ন মহাশয়। ইনি একজন সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

যখন তিনি শ্রীগোপাল বসু-মল্লিক ফেলোশিপ পাইলেন, তখন আন্তরিক হর্ষপ্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট চিঠি লিখিয়া আমরা—অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত আধুনিক যুবক বৃন্দ—তাঁহার কাছ হইতে এতদুপলক্ষে কি কি বিষয় শুনিলে উপকৃত হইব, তাহা সবিস্তার নিবেদন করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি তদীয় স্বভাব সুলভ বিনয় ও উদারতা সহকারে যাহা লিখিয়া ছিলেন, তাহাতে "বালাদপি সুভাষিতং" এই নীতিবাক্যই প্রমাণিত হইয়াছিল।

শেষ দেখা।

তাঁহার সঙ্গে চিঠি পত্র খুবই চলিত—বরং আলস্য করিয়া আমিই পত্রাদি লিখিতে বিলম্ব করিয়াছি। তাঁহার উত্তর প্রদানে অবহেলা মাত্রই ছিলনা—ফেরত ডাকে জবাব আসিত! কলিকাতা গেলে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন না করিয়া আসিলে, মনে হইত যেন সেইবার যাত্রা বিফল হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে শেষ দেখা ১৩১৫ সালের কার্ত্তিক মাসে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের জন্মস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম—তাঁহার মত জানিবার নিমিত্ত চিঠি দিয়া উত্তরে তদীয় "উদ্বাহ চন্দ্রালোক" আমি উপহার পাইয়াছিলাম। ইহার মুখবন্ধে ছিল—রঘুনন্দন পূর্ব্ববঙ্গেরই লোক। ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় তাঁহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করি; তিনি প্রবন্ধটি শুনিয়া অনুমোদন করিলে পর উহা পত্রিকায় * দিয়াছিলাম। হায়, তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ইহার পরে আর দেখি নাই—তাঁহার মধুবর্ষী উপদেশ আর শুনিতে পাই নাই! সেই সময়ে যদিও তাঁহার দেহযষ্টি রক্তশূন্য ও কঙ্কালময় হইয়া পরিয়াছিল—তথাপি পুণ্যানুষ্ঠানের ফলে কর্ম্মক্ষমতা অব্যাহত ছিল।

উপসংহার।

যাঁহার সঙ্গে প্রায় ২০ বৎসর কালের গুরু শিষ্য সম্পর্ক ছিল—যাঁহার সহিত প্রায়শঃ দেখা শুনা ও পত্র ব্যবহার হইত—যাঁহাকে আমি মনে করিতাম যে সমস্ত দিক্ দিয়া দেখিলে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বঙ্গদেশে কেহ

* স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য—জন্মস্থান বিচার—"নব্যভারত" অগ্রহায়ণ—১৩১৫

ছিলেন না, তাঁহার সম্বন্ধে অতি অল্পই লিখিতে পারিলাম বলিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছি। যাহাহউক তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলীদ্বারাই বহুকাল পর্য্যন্ত স্মৃত হইবেন। ব্যক্তি বিশেষের "স্মৃতি" প্রবন্ধের উপর তদীয় যশঃখ্যাতি সমধিক নির্ভর করিবেনা। অন্বর্থনামা মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহোদয়ের অপর স্মৃতি তদীয় ছাত্রবর্গ। রঙ্গপুরের পণ্ডিত-রাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ত্রিপুরার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক দর্শনতীর্থ, আসাম গৌরীপুরের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ, শ্রীহট্টের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামতনু ন্যায়সাংখ্যচুঞ্চু, ময়মনসিংহের উদীয়মান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি দ্বারাও তাঁহার শিক্ষাদানের গৌরব বহুকাল রক্ষিত হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের এক বিশিষ্টাংশ যে স্থলে অতিবাহিত করিয়া তিনি উহার অন্যতম স্তম্ভের স্বরূপ ছিলেন, সেই সংস্কৃত কলেজে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নের কোনও সংবাদ এ যাবৎ পাই নাই। দুঃখের বিষয় নহে কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তনে যিনি সর্ব্বাগ্রে সেই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে কন্‌ভোকেশন প্রসঙ্গে—কোথায়—তাঁহার নাম ত শুনা গেল না? ইহাও পরিতাপেরই বিষয়।

একটি প্রস্তাব।

ময়মনসিংহে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর স্মৃতি—কলেজটি দ্বারা সুষ্ঠু সংরক্ষিত হইয়াছে। পরন্তু এই ইংরেজী শিক্ষার যুগে আমাদের দেশে অনেক আনন্দমোহন জন্মিতে পারেন—কিন্তু এই যে 'চন্দ্র' অস্ত গেলেন, এমনটি হইবেন না—হইবার আর পথ রহিল না। তথাপি এই চন্দ্রকান্তের স্মৃতি উপলক্ষ করিয়া যদি ভূস্বামিবহুল ময়মনসিংহে একটি খাঁটি সংস্কৃত বিদ্যালয় দেখিতে পাই—যাহাতে বিশিষ্ট অধ্যাপকগণের ও বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীর গ্রাসাচ্ছাদন ও অবস্থানের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে বুঝিব এতাদৃশ মহাত্মার ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ সার্থক হইয়াছে। তাহা হইলে তিনি অমর ধাম হইতে স্বদেশবাসি-বর্গের উপর অবশ্যই শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা (বিদ্যাবিনোদ এম. এ.)।

দাই নিপ্পন।

জাপানের রাজশক্তি।

১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ভারত হইতে জাপান পর্য্যন্ত এশিয়ার পূর্ব্ব ভাগের সমস্ত দেশেই বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতাও ছাইয়া পড়িয়াছিল। ১৩শ শতাব্দীতেই জেঙ্গিশখাঁ অন্যান্য দেশ লণ্ডভণ্ড করিয়া জাপান আক্রমণের উপক্রম করেন। কিন্তু প্রবল বাত্যায় তাহার নৌবাহিনীর অধিকাংশই বিধ্বস্ত হওয়ায় বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহাকে জাপানের আশা পরিত্যাগ করতঃ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। তারপর আরও অনেক বহিঃশত্রু জাপান আক্রমণ করিতে প্রয়াস পায় কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। জাপানীরা বলে—সমুদ্র আমাদের দেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; তাছাড়া সভ্যতা তখন আমাদের দেশে বিরাজ করিতেছিল, তাই বৈদেশিক শত্রু আমাদের কোন হানি করিতে সক্ষম হয় নাই। এই বৈদেশিক আক্রমণের বিষয় লিখিতে একখানা আধুনিক ইতিহাসে কোন জাপানী গ্রন্থকর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন যে—"মঙ্গোলিয়ান জাতি এবং মুসলমানেরা মরুভূমি প্রদেশ হইতে যাইয়া ভারতের ধর্ম্ম এবং প্রাচীন সভ্যতার সমূহ ব্যাঘাত ঘটাইয়া ক্রমে ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করতঃ ভারতকেও একরূপ মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে। যদিও অধিকাংশ দেশই ক্রমশঃ সভ্যতার দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে তথাপি ভারত বর্ত্তমান যুগে উল্লেখযোগ্য কিছুই জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিতেছে না। অথচ ভারতের প্রাচীন সভ্যতাই অনেক দেশের উন্নতির ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

১২শ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী জায়গীরদারকে সোগুণ (রাজ্যরক্ষক) উপাধি দিয়া রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচন করতঃ তাঁহারই হস্তেই রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করেন। রাজ্যের সুশৃঙ্খলার জন্য সোগুণ রাজধানী কিওতো সহর হইতে বহু দূরে কামাকুরা নামক স্থানে স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। ১১৮৬ খ্রীঃ—১৩৩৩ খ্রীঃ প্রথম সোগুণ বংশ রাজ্য শাসন করেন। ১৩৩১ খ্রীঃ—১৫৭৩ খ্রীঃ আসিকাগা নামক দ্বিতীয় সোগুণ বংশ কিওতো রাজধানীতে থাকিয়াই রাজ্যশাসন করেন। কার্য্যতঃ সোগুণই যেন রাজ্যের রাজা; সম্রাট কেবল নামে। লোকে সম্রাটকে ধর্ম্মবিষয়ক রাজা বলিয়া মনে করিত। আসিকাগা সোগুণ বংশের কোন দাইমিও

(Feudal Lord) বংশের কে সোগুণ হইবেন এই বিষয় লইয়া ভয়ানক গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর ঘোর বিবাদ বিসম্বাদের পর ইদে-ইয়োশী নামক জনৈক তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি (জাপানী ইতিহাসে ইনি নেপোলিয়ানের ন্যায় ক্ষমতাবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন) স্বকীয় ক্ষমতাবলে আপন প্রভুত্ব সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হয়েন। তিনি সোগুণ হইয়া দুইবার কোরিয়া আক্রমণ করিয়া উহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হস্তগত করেন। তিনিই বলিয়াছিলেন—আমি সমগ্র চীনদেশ জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা রাখি। ১৫৯৮ খ্রীঃ হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনুপযুক্ত পুত্র পিতৃগৌরব বজায় রাখিতে সক্ষম হন নাই।

১৬০০খ্রীঃ ইয়েইয়াছু নামক তাৎকালিক প্রভূত বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সোগুণত্ব লাভ করেন। তিনি তোকুগাওয়া বংশের আদি পুরুষ। ১৬০০—১৮৬৮ খ্রীঃ এই তোকুগাওয়া বংশের সোগুণগণ সমগ্র জাপানের অধীশ্বর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যত কিছু উন্নতি সমস্তের মূলেই এই বংশের সোগুণদের রাজ্যশাসন প্রণালী এবং বিভিন্ন দেশীয় সভ্যতা এবং সুশিক্ষার প্রচলন। যদিও এই সময় রাজ্যের প্রত্যেক গুরুতর বিষয় মীমাংসার নিমিত্ত প্রধান পাঁচজন দাইমিও লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইত তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে সোগুণই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কমিটি সোগুণের আদেশের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হইত না। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা পরিচালনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিঘ্ন না ঘটে এজন্য সোগুণ রাজধানী কিওতো সহর হইতে তিন শত মাইল দূরবর্ত্তী ইয়েদো (বর্ত্তমান তোকিও) নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া একাধীশ্বররূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সাধারণ লোক যেন যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আদেশ অনুযায়ী চলিতে লাগিল। এদিকে দাইমিওগণও তাঁহাকেই রাজা জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন এবং উপঢৌকনাদিও পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে সোগুণ যেন একটি স্বতন্ত্র জাতীয় শক্তির সৃষ্টি করিলেন। কিওতো সহরে মিকাদো মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় রহিলেন।

এই সময়ের কথায় ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান লেখকেরা বলিয়াছেন —জাপানে দুইটি রাজা রাজত্ব করেন। একটির রাজধানী ইয়েদো

(তোকিও), অপরটির—কিওতো। ইয়েদোর রাজা রাজ্য করেন, আর কিওতোর রাজা ধর্ম্মবিষয়ক শাসন কর্ত্তা। আমাদের ভারতে যেরূপ যথেষ্ট ক্ষমতাশালী রাজা মহারাজ থাকা সত্ত্বেও মুণিঋষি প্রভৃতি ধার্ম্মিক মহাত্মাদের সম্মানের লাঘব হইত না, তেমনি রাজ্য শাসনের ভার মিকাদোর হস্ত স্খলিত হইলেও সোগুণের চেয়ে তাঁহার প্রতি প্রজাদের আন্তরিক ভক্তি কম ছিল না। তোকুগাওয়া সোগুণবংশের রাজত্বকাল বর্ণনে জনৈক প্রসিদ্ধ জাপানী ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন—"The Mikado may cease to Govern but he always reigns. He exists not by divine right but by divine Law—a fact of man and nature. He is always there, like our beloved mount of Fuji" *

যদিও এই সময়ে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির তেমন শক্তি ছিল না, তথাপি সোগুণ পাঁচ জন শক্তিশালী দাইমিওর পরিবর্ত্তে নিজের অধীন পাঁচজন দুর্ব্বল দাইমিও দ্বারা কমিটি গঠন করেন। উহারাই ঐ সময়ে সোগুণের মন্ত্রী স্বরূপ ছিলেন। এই সময় তোজামা বংশের দাইমিওগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। সোগুণ সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তোজামা বংশকে নিস্তেজ করিয়া রাখেন। ছামুরাই ক্ষত্রিয়গণ সোগুণের অধীনে কায করিতে থাকে। সোগুণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছামুরাই সৈন্যকে প্রত্যেক দাইমিওর অধীনে কায করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। জায়গীরদারদিগকে দমাইয়া রাখিতে যথাসম্ভব প্রয়াস পাইতে লাগিলেন! এবং জনসাধারণকে বশে রাখিবার জন্য তাহাদিগকে নানারূপ লাভজনক সত্ত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত উপদ্রব থামিয়া গেল। সোগুণ নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দেশের লোক এই সময় কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। অবকাশ পাইয়া তাহারা শিল্প এবং লিখা পড়া শিক্ষার নিমিত্ত যত্নবান হইল। সাধারণ লোক জাগিয়া না উঠে, দেশের কোন জায়গায় স্বকীয় শাসন নীতির বিরুদ্ধে কিছুই আলোচিত না হয়—এজন্য সোগুণ স্থানে স্থানে বহু গুপ্তচর এবং ছামুরাই সৈন্য নিযুক্ত করেন।

* প্রতি বৎসর গরমের সময় শত শত লোক ইহার শিখর দেশে অধিরোহণ করত: পাদদেশস্থ সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের মনোরম দৃশ্য সম্ভোগ করিয়া থাকে। অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে জাপানীরা আজ পর্য্যন্তও দেবতা জ্ঞানে ফুজি-আগ্নেয়গিরিকে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে পূজা করিয়া থাকে।

সোগুণ একদিকে যেমন কড়াভাবে রাজ্য শাসন করিতেন, অপর দিকে আবার দেশ ও দেশের অধিবাসিদের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই বিব্রত ছিলেন। সোগুণ স্থানীয় ধর্ম্মযাজকের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক ছেলেকে লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য করেন। এই সময় হইতে সামান্য কৃষকের ছেলেরাও লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করে। লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে লোকের চক্ষু ফুটিতে লাগিল। শিক্ষিত সমাজ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের প্রকৃত রাজা (মিকাদো) সোগুণের হস্তপুত্তলিকাবৎ হইয়া রহিয়াছেন; আর তাঁহারা সকলে যেন অরাজকতার কুফল ভোগ করিতেছেন।

ক্রমেই শাসনপ্রণালীর সংস্কারের জন্য সর্ব্বসাধারণের মন উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল। লোকের মনের এহেন পরিবর্ত্তন সোগুণের রাজনীতির ফলেই সংঘটিত হইতেছিল। কালে এই পরিবর্ত্তনই জাপানের অভ্যুদয়ের হেতুরূপে দেশীয় ও বিদেশীয় রাজনীতিজ্ঞ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। দেশের ভিতর এই সকল ঘটিতেছিল সত্য, কিন্তু অনেক বাহিরের ঘটনাও ইহাদের রাজনীতি-শাস্ত্র আলোচনার সহায়তা করিতেছিল।

এই সময়ে ইউরোপীয়জাতি এশিয়াটিক জাতির সংস্পর্শে আসিতে থাকে। বৈদেশিকজাতি জাপানের সংস্পর্শে না আসিলেও জাপানিদের মন বাহিরে ও আকৃষ্ট হয়। এশিয়ার অন্যান্য দেশের অধিবাসিদের প্রতি ইউরোপীয়দের ব্যবহার দেখিয়া এই সময়ের কথায় জনৈক প্রসিদ্ধ জাপানী লেখক এক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয় জাতি মান সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া ধনৈশ্বর্য্যকেই যথা সর্ব্বস্ব মনে করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এমন কি স্থল বিশেষে যাহাদিগকে রক্ষক বলিয়া মনে করা গিয়াছে, তাহারা ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর আমরা এশিয়াটিক জাতি যতক্ষণ না অপরের উৎপীড়ন অসহ্য হইয়া উঠে, ততক্ষণ নীরবে সমস্তই সহ্য করিয়া থাকি। যখন দেখি, আমাদের স্বার্থ সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম, তখন নিতান্ত অসহ্য বলিয়া তৎ প্রতীকারের প্রয়াস পাইয়া থাকি।'

১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগিজ স্পেনিস এবং ইংরাজ প্রভৃতি জাতি বাণিজ্য উপলক্ষ করিয়া এসিয়ার বিভিন্ন দেশে পদার্পণ করে।

১৮৪২ খৃঃ উহারা চীনে আফিংএর ব্যবসা আরম্ভ করে এবং হঙ্কং চীনাদের হস্তস্খলিত হয়। এমন কি ১৮৬০ খৃঃ চীনের রাজধানী পিকিণ সহর বৈদেশিক

কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সম্রাটের গ্রীষ্ম-প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়। এই সব দেখিয়া জাপানীরা ইউরোপীয়দিগকে এশিয়ার ঘোর শত্রু মনে করে। উহারা ক্রমে জাপান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া সন্দেহ করিতে থাকে এবং শত্রুর সম্মুখীন হইতে যোগাড় যন্ত্রেরও সূত্রপাত করে।

এদিকে রুষ জাপান রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। উহারা সাইবিরিয়া এবং কামস্কাট্কা হইতে ক্রমে সাগালিয়েন দ্বীপ অধিকার করে (১৮০৬ খৃঃ) এবং ইয়েছো দ্বীপ লুণ্ঠন করিতে থাকে। ইয়েছো দ্বীপ সম্প্রতি হোকাইদো দ্বীপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সময় জাপানী শক্তি এত প্রবল ছিল না, যাহাতে রুষের ন্যায় প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারে। তবুও শত্রুর অত্যাচার নিবারণ জন্য ১৮০৬ খৃঃ সোগুণ একজন মিলিটারী গবর্ণরকে হোকাইদোর রক্ষক নিযুক্ত করেন। ১৮৩০ খৃঃ মিতোর নারিআকি নামক এক অসীম পরাক্রান্ত প্রিন্স তাঁহাদের রাজ্যের সমস্ত ধর্ম্ম মন্দিরের পিত্তলের ঘণ্টা গালাইয়া কামান তৈয়ার করিয়া ছামুরাই জাতিকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন এবং তিনি রুষ-অত্যাচার নিবারণের জন্য সৈন্য-সামন্ত সহ হোকাইদো দ্বীপে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় সোগুণ পর্য্যন্ত ভীত হন এবং উক্ত প্রিন্সকে সেই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ কমোডর পেরি কতিপয় সৈন্যসহ আমেরিকা হইতে বরাবর তোকিও উপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি জাপানের সহিত আমেরিকার বন্ধুত্ব স্থাপন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন, অভিমত প্রকাশ করেন। এই সময় রাজ্যের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেশের যাবতীয় লোক দুইদলে বিভক্ত হয়; একদল বলে—বিদেশী জাতি বাণিজ্যের ভাণ করিয়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে ইহারাও নিশ্চয় তেমনটি করিবে; আমরা ইহাদের সহিত বাণিজ্যও করিতে চাইনা, বন্ধুত্বও করিতে চাইনা। দেশে মন্দিরে মন্দিরে বিপদের ঘণ্টা (alarm bell) বাজিতে লাগিল। ইতিহাসে লিখিত আছে—দেশস্থ লোক যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। দলে দলে বলিতে লাগিল—"To arms! Jhoi! Jhoi! Away with the barbarians!" গ্রামে গ্রামে মরিচা বিশিষ্ট বন্দুকগুলি পর্য্যন্ত শানিত করা হইল। নূতন অস্ত্রশস্ত্রও যথাসম্ভব প্রস্তুত করা হইল। শত্রুর রণতরী ধ্বংসের জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণ রণদেবতা

কার্ত্তিকেয়ের এবং শিন্তোধর্ম্মাবলম্বিগণ সংযত চিত্তে কয়েকদিন অনশনাবস্থায় সমুদ্র এবং ঝটিকার আরাধনা করিল।

এদিকে অপর পক্ষ বুঝিয়াছিলেন যে জাপানের তখনও এতটা শক্তি হয় নাই, যাহাতে শক্রভাবে আমেরিকানদের সম্মুখীন হইতে পারে। তাঁহারা পেরির প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদানে ইচ্ছুক হইলেন। সোগুণগণ রাজ্য-সংরক্ষণ বিষয়ে ৫০০ বৎসর যাবৎ সম্রাটের নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা বোধ করিতেন; আজ সেই তোকুগাওয়া বংশের সোগুণ যখন দেখিলেন, জাপানিদের নিজেদের গৃহবিবাদে দেশ বৈদেশিক জাতির পদদলিত হইবার উপক্রম; তখন তিনি স্বয়ং এবিপদের অবসানের জন্য মিকাদোর নিকট সাম্রাজ্য রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পরামর্শ প্রার্থী হন। শেষে দুইদল একত্র হইয়া আমেরিকানদের সহিত সন্ধি ও বন্ধুত্ব সংস্থাপন করাই স্থির হইল। প্রধান মন্ত্রী আবে জাপানী বৈদেশিক মন্ত্রী হোওার সহিত এক যোগে আমেরিকান-দের সহিত সেই সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণ করেন।

পরস্পর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ১৮৫৪ খ্রীঃ প্রথমবার এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার আমেরিকার সহিত জাপানের সন্ধি হয়। সন্ধি না হইলে হয়ত জাপানের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ হইয়া দাঁড়াইত; এমন কি জাপানের মানচিত্রই হয়তো অন্য রংয়ে চিত্রিত হইত। আবের মৃত্যুর পর হোত্তা প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি পাশ্চাত্য জাতির বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ পাঠে অবগত ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে জাপানিদের শিক্ষার নিমিত্ত বিজ্ঞান স্কুল স্থাপন করেন; উত্তরকালে উহাই 'তোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে' পরিণত হইয়াছে। কমোডোর পেরি জাপানিদের প্রতি বিশেষ ভদ্রোচিত ব্যবহার দেখাইয়াছিলেন। জাপানিরা এখনও তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৯০৬ খ্রীঃ তাঁহার জাপান পদার্পণের ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় জাপানিরা তাঁহার স্মৃতিতে যে বার্ষিক উৎসব করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জাপানের যেস্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, সেখানে তাঁহার নামে জাপানিরা একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

শ্রীযদুনাথ সরকার

প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচীন সমাজ চিত্র।

কবি নারায়ণ দেব, ময়মনসিংহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি। বর্ত্তমান সময়ের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণ, তদীয় 'সুরস পাঁচালী'—পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। সুতরাং পদ্মপুরাণে আমরা পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের এতদ্ অঞ্চলের সমাজ চিত্র—শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গৃহস্থালী, বাণিজ্য, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যের চিত্র দেখিতে পাই। সে চিত্র এইরূপ ঃ—

শিক্ষা—সে কালে টোল বা চতুষ্পাঠীই শিক্ষাগার ছিল। এক এক জন অধ্যাপক বিদ্যা-কল্পদ্রুম হইয়া একাকী শত শত শিষ্যকে নানা বিদ্যা—কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণাদি শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষা ব্রাহ্মণের জন্য মুখ্যরূপে বিহিত হইলেও ইহার ব্যাপ্তি ঘটিয়াছিল। গন্ধবণিক চাঁদ ও লক্ষ্মীন্দর সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইয়াছিলেন। পিঙ্গলাচার্য্য-রচিত ছন্দঃশাস্ত্র সে কালে পঠিত হইত। বেদের চর্চ্চা ছিলনা।

জাতি—ব্রাহ্মণগণ সেকালে ও একালে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও পদ্মাপুরাণে ব্রাহ্মণ প্রভুতার চিহ্ন নাই। গন্ধবণিক দিগকেই সেকালে সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান দেখা যায়। গ্রাম্য দেবতারা—চণ্ডী, মনসা, সত্য-নারায়ণ,—গন্ধবণিকদিগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই গন্ধবণিকেরা কেবল লক্ষপতি কোটীপতি ছিলেন না, বিদ্যা, বিনয় ও পুরুষকারে ইহাদের চরিত্র উজ্জ্বল ছিল। গ্রাম্য দেবতারা সহজে ইহাঁদের গৃহে আসন পান নাই। চণ্ডীমঙ্গলের শৈব ধনপতি খুল্লনার 'মেয়েদেবতা' চণ্ডীর ঘট লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়াছিলেন, পদ্মাপুরাণের চাঁদ সওদাগরের হেতালের লাঠির চোটে পদ্মার কাঁকালে বেদনা হইয়াছিল—এসকল বর্ণনায় গন্ধবণিকদিগের চরিত্রগত একটা তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। একালের বণিক সমাজে সে তেজের চিহ্নও নাই। কি বিদ্যার হিসাবে কি অর্থ ও সম্মানের হিসাবে—বর্ত্তমানে বণিক সমাজের অধঃপতন হইয়াছে বলিতে হইবে।

পদ্মাপুরাণে কায়স্থ ও বৈদ্যের কোনই উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ দুই এক স্থলে থাকিলেও উহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত—যেন ব্রাহ্মণ, সমাজে উপেক্ষিত একটা সম্প্রদায়। ডোমদিগের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখা যায়। কবি, ভগবতী ও বেহুলাকে ডোমনী সাজাইয়া ছিলেন।

গৃহ—সেকালে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অধিক ছিল না। সাধারণ গৃহস্থগণ বাঁশ, বেত ও ছন দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। সমৃদ্ধগণের বিলাসের জন্য 'ফুলটুঙ্গী' বা 'কামটুঙ্গী' গৃহ নির্ম্মিত হইত। এই সকল 'টুঙ্গী' গৃহ দ্বিতল বলিয়া বোধহয়। অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটী দুইটি পৃথক্ চতুঃশালা ছিল। ধনিগণের বাটী প্রাচীর-বেষ্টিত থাকিত। উহাতে প্রবেশের দুইটি দ্বারছিল—বহির্দ্বার বা সিংহদ্বার, এবং অন্তঃপুরদ্বার বা খিড়কী দুয়ার। বহির্দ্বারে অস্ত্রধারী প্রহরী থাকিত। ধনীরগৃহে পালঙ্ক ও চাঁদোয়া থাকিত। লেপ, গ্রিদা, মশারি প্রভৃতি শয্যার উপকরণ ছিল।

গৃহিনী—গৃহিনী, অন্তঃপুরের কর্ত্রী ছিলেন। রন্ধন, ভোজন, পরিবেশন, পূজা ও ব্রত নিয়মাদি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। একা একশত হইয়া গৃহিনী এই সমুদয় কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করিতেন। গৃহী ও গৃহিনীতে স্নেহপ্রেমের অভাব ছিলনা, কিন্তু সে প্রেম বা স্নেহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর প্রবাহের ন্যায়; বাহ্য উচ্ছ্বাসে উহা অন্যের চক্ষুর গোচর হইত না। গৃহিনীরা নানাপ্রকার ব্রত করিতেন। এই সকল ব্রত করিতে উপবাস করিতে হইত।

বিবাহ ও সপত্নী কলহ—সে কালে কোন বয়সেই বিপত্নীকের বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। দুই পত্নীও অনেকের ছিল। সুতরাং 'সতীন-চুলাচুলী' অনেক গৃহেরই নিত্য ঘটনা ছিল। দুইয়ের অধিক বিবাহের কথা মনসা-মঙ্গলে নাই। উচ্চ বর্ণের বিধবারা সহমৃতা হইতেন। নিম্নশ্রেণীর অল্পবয়স্ক বিধবারা 'মালা বদল' করিয়া পুনরায় পতিগ্রহণ করিত। এইরূপ বিধবাবিবাহের নাম ছিল—'সাঙ্গা'। বিবাহ অপেক্ষা সাঙ্গা হেয় বলিয়া বিবেচিত হইত। সাঙ্গাতিয়া সন্তান বংশমর্য্যদায় বিবাহ-জাত সন্তান অপেক্ষা হেয় ছিল।

রন্ধন ও ভোজন—সে কালে রন্ধনদক্ষতা রমণীর গর্ব্বের বিষয় ছিল। 'পঞ্চাশ ব্যঞ্জন' প্রবাদ বাক্য নহে, সে কালের গৃহিনীরা সত্যই উহা রাঁধিতেন। উনন এমন কৌশলে নির্ম্মিত হইত যে, এক মুখে জ্বাল দিলেই একবারে নয়টি পাত্রে রন্ধন করা যাইত। উনন নির্ম্মাণের সেই প্রাচীন কৌশল এখনকার মাতৃগণ অবগত নহেন। এখন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন কথা মাত্র।

ব্যঞ্জন দুই প্রকার ছিল—সামিষ ও নিরামিষ। সামিষ ব্যঞ্জন মৎস্যের। মাংসের বর্ণনা, শাক্তের গৃহেও দেখা যায় না। সে কালের ভদ্রলোকেরা দেবীর প্রসাদ ভিন্ন মাংস খাইতেন না। সুতরাং মাংস ভক্ষণ কদাচিৎ হইত। নিরামিষ ব্যঞ্জন ঘি দিয়া রাঁধা হইত। কৈ, চিতল,

কাতল, রোহিত, বাচা, ভাঙ্গনা, ও ইচা মাছ, ভাজা ও ব্যঞ্জন উভয় প্রকারে রন্ধন করা হইত। বেতের ডোগা 'পলিয়া' (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া) উহার সহিত চুচরা মাছ (ছোট মাছ) রাঁধা হইত। ভাজা মাছের সঙ্গে মূলা খাওয়ার রীতি ছিল। আহারান্তে কর্পূর ও তাম্বুল সেবন করিয়া মুখশুদ্ধি করা হইত। তখনও তামাকের ধূমপান প্রচলিত হয় নাই।

দাস দাসী—সমৃদ্ধের গৃহে দাস ও দাসী থাকিত। দাস দাসীগণের মধ্যে কেহ ক্রীত, কেহ বা বেতনভোগী ছিল, ইহাদের সহিত অর্থ ও শ্রমের বিনিময় ছাড়া গৃহীর একটা স্নেহ বন্ধন ছিল। সেই বন্ধন বশতঃ প্রভুর ধন সম্পদ্ তাহারা আপনার বলিয়া মনে করিত এবং প্রভুর হিতসাধন কর্ত্তব্য বলিয়া নহে,ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিত। প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ প্রায়শঃ পুরুষানুক্রমিক ছিল।

বিবাহ পদ্ধতি—বিবাহ পদ্ধতি সে কালেও প্রায় এ কালের মতই ছিল। তবে কন্যা নির্ব্বাচনে এ কালের মত অর্থ আদায়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া রাশি নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি করা হইত। মুখে "পঞ্চ হরিতকী" দিয়া কন্যা-দানের কথা বলিলেও সমৃদ্ধ কন্যাদাতারা জামাতাকে ভূমি, গো, দাস, দাসী ও মণি মাণিক্যাদি ইচ্ছানুসারে যৌতুক দিতেন। এ কালের মত বরপক্ষ দাবী করিয়া কিছু লইতেন না।সে কালে কন্যার মাতা, জামাতাকে কন্যার বশীভূত করিবার জন্য বরণের সময়ে নানা প্রকার বশীকরণ ঔষধ প্রয়োগ ও সম্মোহন ক্রিয়া করিতেন। সেই বশীকরণ ঔষধের ফলশ্রুতি বর্ণনায়, নারায়ণ দেব সে কালের তরুণীগণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন :—

হোড় গুয়া যোড় পান মক্ষিকা মাকড়,
উভতনেঙ্গরার ছাল মানের শিকড়।
একত্র বাটিয়া পুন কেশে দেহ জড়ি,
এক তিল জামাই যে নাহি যাবে ছাড়ি।

এক পত্নী থাকিতেও পত্যন্তর গ্রহণ সেকালে সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত কামপত্নীও অবাধে রক্ষিত হইত। সুতরাং স্বামী সোহাগিনী হওয়া বহু ভাগ্যের কথা ছিল। পত্নী-বহুল স্বামীর উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা রমণী মাত্রেরই যে স্বাভাবিক তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তরুণীরা রূপ, গুণ ও স্নেহে যথেচ্ছাচারী স্বামীর পদ-বন্ধন করিতে না পারিয়া মন্ত্রৌষধির উপরে সহজেই নির্ভর করিতেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

স্বর্গীয় রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ।

গত ২৩শে ফাল্গুন রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুসঙ্গের স্বর্গীয় রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর চারি পুত্র রাখিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর কৌলিক প্রথা অনুসারে সুসঙ্গের রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ২য় পুত্র কমলকৃষ্ণ : ৩য় স্বর্গীয় জগৎকৃষ্ণ চতুর্থ আমি।

আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের পরলোক গমনের পর, তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র মহারাজা শ্রীমান কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ, ঐ উপাধি উপভোগ করিতেছেন।

রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ ১২৪৬ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আমি তাঁহার ১০।১২ বৎসরের ছোট। আমার শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটে। পরিবারিক প্রথা অনুসারে ৫ম বর্ষে আমাদের সকলেরই বিদ্যাভ্যাস বা 'হাতে খড়ি' হইয়াছিল। আমরা সকলেই বাড়ীতে লেখা পড়া করিতাম।

সে সময় দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। আমরা সকলেই পার্শি পড়িতাম। মধ্যমদাদা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর উর্দ্দু ও পারস্য ভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তখন শিশুপাঠ্য পুস্তক ছিল না। বাঙ্গালা বর্ণমালা শিখিবার বোধ হয় একমাত্র পুস্তক ছিল—'শিশুবোধক'। এই শিশুবোধকে ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী স্ত্রীর সম্ভাষণ লিপি পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের জন্য সেই পুস্তকের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা বাড়ীতে মুসলমান মুন্সীর নিকট পার্শি 'তালীম' লইতাম ও কলার পাতে কখনও বা তাজপুরী কাগজে লিখিতাম। মুখে মুখে বাঙ্গালা ক খ শিখিয়াছিলাম। লেখা পড়া করিবার আমাদের তেমন তাড়না ছিলনা, শীকার শিক্ষা করিবার জন্যই আমরা অধিক উৎসাহ পাইতাম। ফলে মধ্যম-দাদা অল্প বয়সেই অত্যন্ত শীকারী হইয়া উঠিলেন।

তখন গারো পাহাড় আমাদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গারো পাহাড়ে আমরা স্বাধীন ভাবে হস্তী ধরিবার খেদা করিতাম। মধ্যম দাদা ছোট হইতেই হস্তী খেদায় যাইতেন। দুই একবার আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছি। হস্তী খেদায় তাঁহার অসীম সাহস ছিল। তিনি শীকারে জীবনকে পুনঃ পুন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও সাহস হারাইতেন না।

শীকার ব্যতীত গান বাজানায়ও তাঁহার অত্যন্ত সখ ছিল। তিনি নিজে সুন্দর গাইতে পারিতেন এবং সেতার বাজনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তিনি নিজে গান প্রস্তুত করিয়া গাইতেন। এইরূপে তাঁহার কবিতা লিখিবার অভ্যাস হয়। পূর্ব্বে আমাদের অঞ্চলে কেহ গান কাগজে লিখিত না, মুখে মুখেই তাহা থাকিত। মধ্যম দাদা কাগজে গান লিখিতেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইত। গানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেতার শিক্ষারও এক খানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এরপর নাটক এবং যাত্রার দল করিয়াও তিনি আমাদিগকে বিস্তর নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করাইয়াছেন। তিনি কলিকাতা হইতে অর্থব্যয় করিয়া লোক আনাইয়া নাটক করিতেন। "রামাভিষেক," "চিতোর আক্রমণ" প্রভৃতি অভিনয় হইত। তিনি নিজে সেতার বাজাইতেন।

প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে আমাদের ঘটনার বিবরণ জানিবার একটা আগ্রহ জন্মে, কিন্তু আমাদের অঞ্চলে ডাকঘর না থাকায়, আমরা যথা সময়ে দেশের অবস্থা জানিতে পারিতাম না। আমাদের সহরের মোক্তার আমাদিগকে সংবাদ লিখিয়া জানাইত, আমরা তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতাম। মধ্যম দাদা এই অভাব দূর করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজধানীতে একটা ডাকঘর স্থাপিত হয়।

এই সময়ে দেশে বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন অল্পে অল্পে বিস্তৃত হইতেছিল। বড়দাদা ও মধ্যমদাদার ছেলেদের জন্য মধ্যমদাদা বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার চেষ্টায় কুমারদিগের জন্য ১৮৬৫ সনের আগষ্ট মাসে রাজধানীতে মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়। অতঃপর কুমার দিগের মাইনর স্কুলের পাঠ শেষ হইলে, মধ্যম দাদা ঐ স্কুলকেই এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত করেন। বালিয়াচান্দার ব্রজনাথ বৈষ্ণব এই সময় বি, এ, পড়িয়া আসিয়াছিল, তাঁহাকে আনিয়া তিনি হেড মাষ্টার করিয়া লইলেন। তিনি ব্রজনাথকে হেডমাষ্টার করিলেন বটে, কিন্তু ব্রজনাথ রাজকুমার দিগকে পড়াইতে সঙ্কোচ প্রকাশ করিতে লাগিল। সে সময় সেই পথ ঘাট হীন পার্ব্বত্য অঞ্চলে এণ্ট্রেন্স স্কুলের উপযুক্ত হেডমাষ্টার সংগ্রহ করা বড়ই দুর্ঘট হইয়া পড়িল—এদিকে ব্রজনাথও একদিন আসিত ত তিন দিন আসিত না। এইরূপ অবস্থায় ব্রজনাথের জন্য প্যাদা মোতায়ন হইল। ব্রজনাথকে প্রতিদিন প্যাদায় যাইয়া আনিতে হইত; নতুবা ব্রজনাথের সর্দ্দি কাশি শির-পীড়া লাগাই

থাকিত। ইহার পর ব্রজনাথ উকীল হইয়া গেলে স্বর্গীয় ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় (পরে ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট ও ঐতিহাসিক) বি,এ, পাশ করিয়া আমাদের স্কুলের হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হন এবং কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় পণ্ডিত হইয়া যান। এইরূপ কিছুদিন চলিয়া ছিল; ইহার পর নানা অসুবিধায় সে স্কুলটী চলিল না! মধ্যমদাদা কুমারগণের কলিকাতা বাসই ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার এই সকল সুব্যবস্থায় সুসঙ্গ রাজপরিবারে আজ পাঁচজন গ্রেজুয়েট হইয়াছেন।

সাহিত্য চর্চ্চা আমাদের এক রকম পৈত্রিক ব্যবসায়। আমাদের প্রপিতামহ রাজা রাজসিংহ বাহাদুর একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন, তিনি "ভারতী মঙ্গল", "রাগ মালা", "মনসা পাচালী" প্রভৃতি গ্রন্থ * রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র (আমাদের খুল্ল পিতামহ) রাজা জগন্নাথ সিংহও "জগদ্ধাত্রী গীতাবলী," নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বড় দাদা মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ এবং মধ্যমদাদা রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহও সাহিত্য চর্চ্চায় পৈত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হন নাই। মহারাজা বাহাদুর এক খানা 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ছোট হইতেই সঙ্গীত লিখিতেন এবং এইরূপে তাহার সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি পায়। রাজা কমলকৃষ্ণ সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন দেখিয়া আমরাও সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু লিখিতে চেষ্টা করিতাম। আমরা "বঙ্গদর্শন", "বান্ধব", "বাঙ্গালি" প্রভৃতি মাসিক পত্র পাঠ করিতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সুসঙ্গে সাহিত্যের আলোচনা একটু জমকালো রকমেই চলিতে থাকে। তখন স্বর্গীয় রুক্মিণী কান্ত ঠাকুর, স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, শিবদয়াল ত্রিবেদী প্রভৃতিও গদ্যে ও পদ্যে বাণীর অর্ঘ্য সজ্জিত করিতে থাকেন।

ময়মনসিংহের মাসিক পত্র 'বাঙ্গালি' পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া উঠিয়া গেলে, আমরা সুসঙ্গ হইতে একখানা মাসিক পত্র বাহির করিতে চেষ্টা করি। ১৮৮৫ সনে শিবদয়াল ত্রিবেদীর সম্পাদকতায় সুসঙ্গ হইতে "আর্য্য-প্রদীপ" বাহির হয়। পত্রিকা খানা এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। অতঃ-পর ১৮৮৭ সনে পুনরায় সুসঙ্গ হইতে "আর্য্যপ্রভা" বাহির হয়। আর্য্যপ্রভা উঠিয়াগেলে আমি রুক্মিণীকান্ত ঠাকুরকে সম্পাদক করিয়া 'কৌমুদী',

* ১২৯৭ সালে এই পুস্তকগুলি রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরই মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

বাহির করি। 'কৌমুদী' রাজকৃষ্ণরায়ের "বীণার" ন্যায় কবিতা ময় ছিল। মধ্যম দাদার সঙ্গীত, কবিতা এবং নানা বিষয়ক রচনা এই তিন খানাতেই প্রকাশিত হইত।

জমীদারী পরিচালন কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। বড়দাদা রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইলেও মধ্যমদাদার মন্ত্রণা ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। বর্ত্তমান মহারাজের সময়ও তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তাই ছিলেন। এক কথায় মধ্যমদাদা সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ ছিলেন—তিনি যে জানিতেন না কি, তাহা আমরা জানিতাম না। সঙ্গীত, বাদ্য, পশু পালন, কৃষি, শীকার, জমিদারি শাসন সকল বিষয়েই তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। তাঁহার এই সকল গুণের পরিচয় তাঁহার প্রণীত নিম্ন লিখিত গ্রন্থাবলিতে কতকটা পাওয়া যায়।

সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থঃ—	সঙ্গীত শতক।
বাদ্য " "	তূর্য্য-তরঙ্গিণী (সেতার শিক্ষা)।
পশু পালন " "	অশ্ব-তত্ত্ব, গো-পালন।
কৃষি " "	আম্র।

এতদ্ব্যতীত কৃষি, পুষ্প, পাখী, হস্তী, গো ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গত ভূমিকম্পের পর তিনি গারো পাহাড়ে শীকার করিতে যান; ঐ সময় এক পর্ব্বত গহ্বরে একখানা আশ্চর্য্য পুস্তক, একখানা কুশাসন, ও একটী কমণ্ডলু প্রাপ্ত হন। এই জিনিস গুলি তিনি বিগত ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনে তিনি গো জাতি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধও লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। মহারাজা শ্রীমান কুমুদচন্দ্র তাহা পাঠ করেন। ইহাই তাঁহার শেষ সাহিত্যস্মৃতি।

সুসঙ্গ এক সময় সাহিত্য চর্চ্চার একটী প্রধান বৃত্ত ছিল; মধ্যমদাদা তাঁহার কেন্দ্র ছিলেন। তাঁহার অভাবে সুসঙ্গ একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী এবং প্রকৃত সাহিত্য সেবক হারাইল। আমাদের পরিবারে এখন ভ্রাতষ্পুত্র মহারাজা শ্রীমান কুমুদচন্দ্র এবং মদীয় পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সাহিত্য চর্চ্চায় মধ্যমদাদার পদাঙ্কুসরণ করিতেছেন, তজ্জন্য আমি গৌরব অনুভব করিতেছি।

শ্রীশিবকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।
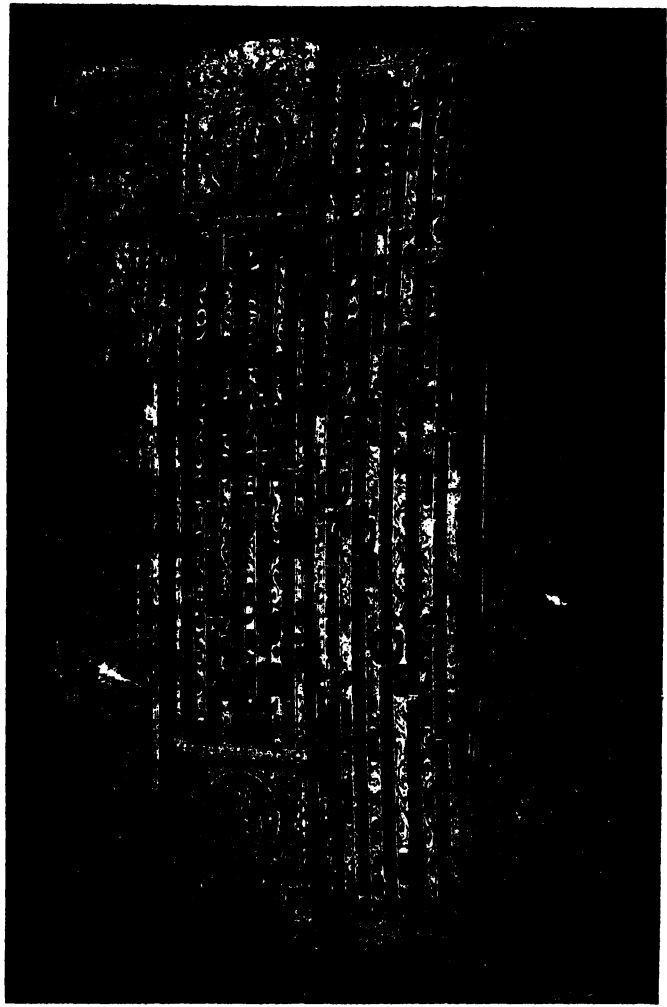
স্বর্গীয় রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক গারো পাহাড়ে প্রাপ্ত অদ্ভুত পুঁথি

প্রেস্‌ক্রুপসন্‌।

জজ কোর্টের উকিল হারাণ বাবু সকাল বেলা শোয়ার ঘরের তক্তপোষটার উপর বসিয়া এক রকম বাসি মুখেই অর্থাৎ তখন পর্য্যন্তও চা না খাইয়া—দৈনিক খবরের কাগজটার উপর ঘুমন্তভাবে চোখ বুলাইতেছিলেন, এমন সময় পিছন দিক হইতে সুমধুর বলয় শিঞ্জনের সহিত অঞ্চল বদ্ধ চাবির গোছাটার ঝন্‌ ঝন্‌ ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া দাম্পত্য-যুদ্ধের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সহসা পশ্চাৎদিক হইতে আক্রান্ত, বিপন্ন, অসহায় উকীল বাবু ভীত দৃষ্টিতে শুষ্ক মুখে তাকাইয়া দেখেন—সর্ব্বনাশ—আজ প্রেয়সী নীরদবালার আদ্যোপান্ত রণ-রঙ্গিনী মূর্ত্তি। মাথার এলোকেশে রণ বেশই অতি সুস্পষ্টভাবে সূচিত! এমন খণ্ড প্রলয়ের সন্নিহিত ছায়া দেখিয়া উকীল বাবু মনে করিলেন, আজ যখন ভোর হইতে না হইতেই এমন দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছে, তখন যে বহ্বারম্ভে একটা লঘুক্রিয়া হইয়াই গোলযোগ মিটিয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা দেখা যায় না! হারাণবাবু কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছিল না। নীরদবালা কাছে আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল:—"দিন রাত দেখ্‌চিতো খবরের কাগজে উপুর হয়ে পড়ে থাকো, নগেনের জন্যে যে চাকরির চেষ্টা কত্তে বলেছিলাম, তা ভুলে বসে আছো অবিশ্যি"?

প্রেমালাপের মধ্যে এরূপ বীর রসের অবতারণা বিষয়ে পাড়ার কুললক্ষ্মীগণের নিকট নীরদবালা অনেক দিন হইতেই যশস্বী হইয়াছিল। নগেন্‌ হারাণবাবুর শ্যালক সপ্তর্ষির মধ্যে একটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এই নগেনবাবুটী করিবার মত কোন কাযেরই উপযুক্ত নন, সেই জন্যই হারাণবাবুকে তাঁর জন্য একটা কিছু করিয়া দিতেই হইবে অথচ সেটী হারাণবাবু কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; এই বলিয়াই দাম্পত্য কার্য্যবিধি আইনের অন্তর্গত—অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলার অভিযোগে হারাণবাবু আজ দায়রায় সোপর্দ্দ! নীরদবালা যখন নিজের মামলায় নিজেই জজ হইয়া বিচার সুরু করিয়া দিল, তখন হারাণবাবু ভাবিয়া দেখিলেন যে খালি বিচার বিভাগে নয়, দাম্পত্য বিভাগেও এক্সিকিউটিভ জুডিশ্যালের ভাগাভাগি বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তঃপুরে পুরুষ জাতির বিড়ম্বনার লাঘব হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। আদালতে জজ সাহেবের ধমক খাইয়াও যাঁর মাথার শামলা কখনো এক ইঞ্চিও ট'লে নাই, আজ নীরদবালার বাক্যের ঝাঁজ লাগিয়া সেই হারাণবাবুর হাত হইতে খবরের কাগজের অরক্ষণীয় কলেবরটা আলগোছে পড়িয়া গেল! তিনি গা মুড়ামুড়ি দিয়া মাঝারি রকমের একটা হাই তুলিয়া বলিলেন:—"না গো, কাল কোথাও বেরুতে টেরুতে পারিনি।" নীরদবালা কৈফিয়ত তলবী কড়া মিজাজে বলিল:—"কেন বল দেখি? কাল দিনটাতো আগাগোড়াই রবিবার ছিল।"

হারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন:—রবিবারে নাকি স্বয়ং পরমেশ্বরও কয়েক ঘণ্টার ছুটী পেয়েছিলেন—অন্ততঃ বাইবেলে এরূপ বলে থাকে।"

নীরদবালা কহিল:—ইস্‌, ভারি বাইবেল মেনে চলা হয় কি না! মক্কেল এলেত রবিবার ফাঁক যায় না! নিজের হলে পার, পরের হলে পার না—তাই বল।' হারাণবাবু

সংবাদ পত্রটা তুলিয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন—"মিছে বকোনা যাও।' রাগে অভিমানে নীরদবালার গলা পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। সে নেকড়ে জাতীয় একটা থাবা মারিয়া হারাণবাবুর হাত হইতে খবরের কাগজটা ছিনাইয়া লইয়া সবিস্তারে সালঙ্কারে—মিছে বকা কাহাদের ব্যবসা—সে সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, গতিক বুঝিয়া উকীলবাবু তর্কটার চাবি অবলীলা ক্রমে বিষয়ান্তরে ঘুরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি তক্তপোষ হইতে উঠিয়া তাকের উপর হইতে একখানি আর্শি লইয়া নীরদবালার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। কলহস্তারিতার আরক্ত সুন্দর মুখচ্ছবি স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হইল। হারাণবাবু একটু নরম সুরে বলিলেন :—

"চট্‌লে তোমায় ভারি চমৎকার দেখায়! চট্‌বার ও কিন্তু তোমার আশ্চর্য্য ক্ষমতা!"

হারাণবাবুর রহস্য বাণটা নীরদবালার অভিমানের ভিতরে অতি গভীর ভাবে গিয়া বিঁধিল! নীরদবালার রূপের খ্যাতি, বন্ধু মহলে হারাণবাবুর ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে কথা হারাণবাবুই নিজেই নীরদবালার নিকটে সবিস্তারে রিপোর্ট করিয়া সময়ে অসময়ে তাঁর নিকট স্নেহ ভাজন হইবার চেষ্টা করিতেন। নীরদবালা সে আয়নাটাতে একটা ঠেলা দিয়া বলিল :—"আমি যে কুৎসিত তা তো দশ জনেই জানে, আমি মলেই তুমি বাঁচো। মনে ভাবচো, আপদটা মলেই আর একটা পছন্দ মত বিয়ে করে বসবে—সে হচ্চে না কিন্তু! আমি শীগ্‌গীর মরচি নে।"

যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার এবং আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রাণ ভিক্ষা করা বই হারাণবাবুর আর গত্যন্তর ছিল না। তাই তিনি বলিলেন—"দোহাই তোমার থামো, দিনকার মত খোরাক বেশ হয়েছে এখন! এর বেশী আজ আর হজম কত্তে পারবো বলে ভরসা হচ্চে না; তার উপর আবার আজ কদিন যে কেমন গা-বমি গা-বমি কচ্ছে—তা ভগবান জানেন। কাছারীতে চব্বিশ ঘণ্টা মাথা কন্ কন্ করে। তারপর—নিজের হাতটার পানে সুললিত নাটকীয় ভাবে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতি ক্ষীণভাবে বলিলেন :—"দেখ দেখি! দিন দিন কেমন কাহিল হয়ে যাচ্চি, কি যেন একটা অন্তরে অন্তরে ব্যামো হয়েচে!"

এমন আত্ম নিবেদনেও নীরদবালার কঠিন মন একটুও ভিজিল না, কিন্তু মুখে বলিল :—"এমন ভিতরে অসুখ বাহিরে কোন রকম লক্ষণ নেই! এতো ভাল কথা নয়! এখনি ডাক্তার ডাক"! উকীল বাবু নীরদবালার মনের দিকে না লক্ষ্য করিয়া মুখের কথার উপরেই বলিলেন—"আজ কালকার ডাক্তার গুলোত আর ধন্বন্তরী নয় যে এসেই অমনি আমায় চট্ করে সারিয়ে দেবে।' নীরদবালাও হাসিয়া বলিল :—কবিরাজ যোগেন্দ্রকিশোর ব্যাধি ধন্বন্তরীকে না হয় ডেকে পাঠান যাক, তাহলে। তাদের লেজে ধন্বন্তরী বাঁধা!'

উকিল বাবু একটু মর্ম্মান্তিক ভাবেই বলিয়া উঠিলেন :—"ব্যামোটা নিরেট বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃতে যে সেরে উঠবে মনে হচ্চে না। পশুপতিকে না হয় ডাক।"

নীরদ বালার সম্পূর্ণ বিশ্বাস—হারাণ বাবুর ব্যারাম পীড়ার অজুহাতটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক; নেহাৎ স্বামী বলিয়া মিথ্যা অপবাদটা দেওয়া উচিত নয়। পশুপতি ঘরের ডাক্তার ও হারাণ বাবুর বন্ধু। নীরদবালা মনে করিল, মস্ত একটা লাটিন নাম যুক্ত ব্যারামের ফাঁকা আওয়াজ-

করিয়া, তাহার পাওনার বিলটা অসম্ভব রকম ভারি করিয়া দিয়া বন্ধুত্বের খাতিরটা ঘনীভূত করিয়া তোলা পশুপতি বাবুর পক্ষে একেবারেই আশ্চর্য্য নয়। তাই সে মনে মনে বলিল ও সব চালাকিতে কুলাবে না। কিন্তু সে প্রকাশ্যে একেবারে নাছোড় হইয়া ধরিয়া স্বামীকে বুঝাইল:—ব্যারাম যখন শক্ত গোছের মনে কর, তখন সিভিল সার্জ্জনকেই দেখান দরকার! উকিল বাবু পকেট ডায়েরী হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন:—পাটের ফসলটা না উঠা পর্য্যন্ত মামলার বাজার বেজায় নরম। কিন্তু নীরদ বালারও ধনুর্ভঙ্গ পণ, সে বলিল—মামলার বাজার দেখিয়া ব্যারাম প্রকাশ পায় না আর তার চিকিৎসাও চলেনা! এ অতি অদ্ভুত। তোমাকে সাহেব দেখাতেই হইবে। নীরদবালা যখন কোনও রকম সোয়াল জবাবে পড়িল না, তখন উকিল বাবু নিষ্কাম ভক্তের মত নির্ব্বিকারচিত্তে বলিলেন:—"আচ্ছা, ষোল টাকা ভিজিট দণ্ড দিয়ে এলেই যদি তুমি খুসী হও, তবে যাবো ডাক্তার সাহেবের কাছে। কিন্তু আগে এই বেলা একবার পশুপতি ডাক্তারকে ডাক"।

"সে আবার কেন?"

"ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে তার বড্ডো খাতির! Consultation প্রয়োজন।"

নীরদবালা এই প্রস্তাবে নীরবে সম্মতিদান করিল।

এইরূপে স্বামী স্ত্রীতে একটা সাময়িক সন্ধি সংস্থাপন হওয়ার পর, পশুপতি বাবুর জন্য লোক প্রেরিত হইল।

(২)

সন্ধ্যার পর যখন চাঁদের আলো স্নেহার্থী শিশুটীর মত নীলায়মান পৃথিবীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল, তখন হারাণ বাবু ক্লান্ত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন নীরদবালা ঘরে একলা চুপটী করিয়া বসিয়াছিল। ও বাড়ীর মেয়েরা তাকে তাসের বৈঠকে ডাকিতে আসিয়াছিল, আজ সে যায় নাই! আজ তার বেদনার উপর বাসনার রং পড়িয়া, বাসনার উপর বেদনার ছায়া পড়িয়া—তার সমুদয় চিত্তবৃত্তিটা এক অপরূপ ভাবের কুজ্‌ঝটিকায় ঢাকা পড়িয়াগিয়াছিল। ডাক্তার সাহেব যে হারাণ বাবুর সখের ব্যারামটা একদম ধরিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন, সে বিষয়ে নীরদবালার মনে আদৌ কোন সন্দেহ ছিল না। হারাণ বাবুকে দেখিয়া নীরদবালা জোরার সুরে জিজ্ঞাসা করিল:—"ডাক্তার সাহেব দেখে কি বল্লে?"

হারাণ বাবু এক পশলা হাসিয়া বলিলেন -"না অমন কিছু নয়।"

নীরদবালা বিজয়গর্ব্ব অনুভব করিয়া মনে মনে বলিল—সে তো আমি জানিই! তবু ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করিল—"তবু শুনি, অমন কিছু নয়—তবে কেমন কিছু?"

হারাণ—তিনি খুলে কিছু বল্লেন না শুধু পশুপতি ডাক্তারের নামে একখানা চিঠি দিলেন আর বল্লেন, ওর মধ্যে ওষুধ, ব্যবস্থা নিয়ম পত্তর সব লেখা আছে।

নীরদ—বাঃ! তিনি কি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে ডাক্তার সাহেবের কাছে যান নি?

হারাণ কয়েকটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন:—"না রাস্তায় থেকে একটা কলে যেতে

হয়েছিল তাকে ! তুমি এই চিঠিখানা পশুপতি বাবুকে দারোয়ান দিয়ে পাঠিয়ে দাও, আমি ততক্ষণ একটু বাইরে থেকে আসচি।"

নীরদ—"আবার এত রাত্রে বেরুচ্চ কোথায় ? ক্লাবে হাজির দিতে হবে বুঝি ?"

হারাণ—"না একটা কাজ আছে। পরে এসে বলব এখন।"

নীরদ—"এত রাত্রে আবার কায !"

হারাণ বাবু একটা ছোট রকমের "হুঁ" ঠুকিয়া আয়নার দেরাজের উপর চিঠিখানা রাখিয়া তাড়াতাড়ি অন্তর্ধান হইলেন।

রাত্রি ৮টায়ও হারাণ বাবু ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া নীরদবালার চিত্ত আরো বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তার মনে হইল, এত রাত্রেও অমন কি গোপনীয় কাজ আসিয়া জুটিল যা স্ত্রীর কাছেও বলা যায় না ? কায টায কিছু নয়, ওসব কেবল ক্লাবে ইয়ারকি জমাইবার ফন্দি ! সে যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পারিল—ডাক্তার সাহেব বুঝিয়াছেন ব্যারাম ট্যারাম কিছুই নয়। কেবল ভিজিটের খাতিরে একটা প্রেস্‌ক্রুপসন্ করিয়া দিয়া হারাণ বাবুকে মদ ধরাইবার ফন্দি করিয়া দিয়াছেন মাত্র ! মনের আবেগে নীরদবালা চিঠির খামটা ছিড়িয়া ফেলিল। কিন্তু সে ইংরেজী জানিত না, তাই ভিতরের ইংরেজী লেখা পড়িতে পারিল না। কিন্তু চিঠির মর্ম্মটা সে দিব্য দৃষ্টিতে যেরূপ দেখিয়াছে, ঠিক হুবহু সেইরূপ কিনা জানিবার জন্য তার কৌতুহল অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। আর সবুর সয় না ! অমনি ঝির উপর হুকুম হইল—"পশুপতি ডাক্তারকে ডেকে পাঠাও এখ্‌খুনি !"

যথা সময়ে শ্রীযুক্ত পশুপতি নাথ রায় এল্ এম্ এস্ কোট পেণ্টুলুন পরিয়া মাথায় জার্ম্মান বাবু কেপ আঁটিয়া এবং ষ্টেথোস্কোপ যন্ত্রের রবরের ডালপালাটা পকেটের উপর খানিকটা বাহির করিয়া—ছোটখাটো একহারা গড়নের মানুষটী—খট্ খট্ করিয়া আসিয়া হারাণ বাবুর বাড়ীতে হাজির ! পশুপতি বাবু সরকারি ডাক্তার না হইলেও কলে যাইতে কখনো ড্রেস না করিয়া বাহির হইতেন না, বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতেও না। এ সম্বন্ধে তাঁর এটিকেট জ্ঞান ভারি টন্‌টনে।

পশুপতি বাবু চিঠি পড়িয়া একেবারে যেন সাদা হইয়া গেলেন ! খানিকক্ষণ চিঠিটা নাড়িয়া চাড়িয়া অতি সংক্ষেপে বলিলেন :—"একটা ব্যামোর কথা বলচে বটে, তবে কি না ওসব কি জানেন—ব্যারামের কথা কেউ কিছু বলতে পারে না।" পাশকরা ডাক্তারকেও ব্যারামের নাম শুনিয়া এমনভাবে ঘাবড়াইতে দেখিয়া নীরদবালার হৃৎপিণ্ডটা যেন সহসা কাঁপিয়া উঠিল, মুখটা পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া উঠিল। এবার পরদার আড়াল হইতে একখানি অশ্রুসিক্ত ব্যাকুল ভীত প্রার্থনা বহির্গত হইল :—চিঠিতে ঠিক কি লেখা আছে আগাগোড়া সবখানি পড়ে শুনাতে হবে।" পশুপতি বাবু স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন পরদার ভিতর ভারি একটা নাড়াচাড়া পড়িয়াগিয়াছে। পশুপতি বাবু চিঠিটার উপর কতক্ষণ চোখ রাখিয়া কহিলেন :—"না অমন কিছু নয় ! তবে কিনা ডাক্তার সাহেবেরও ভুল হতে পারে।" তারপর আবার চুপ করিয়া, তিনি মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

নীরদবালা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। ঝিকে চাপা গলায় ডাক্তারকে শুনাইয়া

শুনাইয়া বলিল :—ডাক্তার বাবুকে বল্ আমি ওর পায়ে পড়ি, উনি সব কথা খুলে বলুন। ডাক্তার জোরে জোরে ইংরাজীর ভাঙ্গা বাংলা করিতে করিতে পড়িতে লাগিলেন :—"ডাইলেটেসন অব দি হার্ট! হঠাৎ হার্টফেইল হতে পারে! প্রধান ঔষধ ডিজিলেটেলিস—সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং কার্য্য ত্যাগ! বর্ত্তমানের অশান্তিকর সংশ্রব হইতে কিছু দিন রোগীকে দূরে সরাইয়া রাখা! বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে ভাল হয়।

বরফের মত হিম একটা আশঙ্কা নীরদ বালার রক্ত স্রোত যেন সহসা বন্ধ করিয়াদিল। একটা অব্যক্ত বেদনায় তার মুখ নীল বর্ণ হইয়াগেল। বিদ্যুতের সচকিত নীলাভ পাণ্ডুর আলো লাগিয়া নিশিথের গাছপালা গুলি যেমন বিশীর্ণ মুখে শিহরিয়া উঠে নীরদবালার মুখখানি যেন তেমনি বিবর্ণ হইয়া গেল! সে যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল নিয়তির বিচারালয়ে অদৃষ্ট পুরুষ তাকে বজ্রকণ্ঠে বলিতেছেন—"তোমারি দোষে আজ তোমার স্বামীর মৃত্যুদণ্ড হইল!" পশুপতি বাবুর হাতের কাগজ যেন ডাক্তার সাহেবের ব্যবস্থাপত্র নয়, সে যেন অদৃষ্টের আপন স্বাক্ষরযুক্ত সীলমোহর করা মৃত্যুর ওয়ারেণ্ট! নীরদবালার মুখ হইতে একটা আর্ত্ত অস্ফুট চিৎকার বাহির হইয়া গেল।

পশুপতি বাবু তখন একটু অতিরিক্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন—এত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? রোগ এখনও চিকিৎসার বাহিরে যায় নি। আমি এখনি একবার সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে দেখা করে আসচি। পরে অষুধের বন্দোবস্ত করবো! সাবধান রোগীকে এসব কথা কিন্তু কিছু বলবেন না—তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

পশুপতি যাইবার সময় নীরদবালার রুদ্ধ অশ্রুবেগ বর্ষার বারিধারার মত তার চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কতক নিজে বলিল, কতক ঝিকে দিয়া বলাইল—স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য যত টাকা লাগে লাগুক, সে তার গহনাপত্র বেচিয়া স্বামীর চিকিৎসা করাইবে। তার যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে শুধু তাকে তার স্বামীকে বাঁচাইয়া দিতে হইবে। সমুদয় পৃথিবীর বিনিময়ে সে আজ শুধু তার স্বামীর জীবনটুকুর ভিখারিণী।

পশুপতি বাবু গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন :—"মানুষের সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আর একবার ভাল করে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে বুঝে আসি। মোদ্দা সাবধান, কথাটা যেন হারাণ বাবুর কাণে না পঁহুছায়। ১০টার মাঝে আমি ফিরে এসে অষুধ পত্তর দিবার বন্দোবস্ত করে যাব এখন।"

(৩)

উজ্জ্বল দীপালোকিত গৃহ! বাহিরে জ্যোৎস্নার আবছায়া জড়ানো—আমাদের সুন্দর শ্যামল পুরাতন পৃথিবী! আজ নীরদবালার নিকট ঘরের ভিতরটা নির্জ্জন বন্দীশালার চাইতে নীরস ঠেকিতে লাগিল। বাহিরের পৃথিবীও যেন নিতান্তই প্রাণহীন বলিয়া তার মনে হইল—সে যেন আজ মৃত্যুলোকের দ্বারে একলাটী দাঁড়াইয়া আছে—সমুখে বিরাট বিস্তীর্ণ জনহীন, মূর্ত্তিহীন, প্রেতলোকের ছায়া! কপালের ঘাম মুছিয়া সে জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিল—বনশ্রী মৃদু জ্যোৎস্নায় অত্যন্ত ধূসর, প্রেতলোকের মতই পাণ্ডুর : সমুখের বাগানের

চারা গাছগুলি মৃদু হাওয়ায় মর্ম্মরিত হইয়া ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় ঐ আকাশের পানে বাহু মেলিয়া দিয়া যেন তারি মত চঞ্চলভাবে সান্ত্বনা খুঁজিয়া মরিতেছিল।

আজ যখন পুঞ্জীভূত অশ্রুধারায় নীরদবালার বাহিরের জলস্থল নিতান্ত ঝাপসা হইয়া গেল, তখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মত, অম্লান লাবণ্যের মত, অশ্রুধৌত পূণ্যরেখার মত একটী মূর্ত্তি তার সমুদয় হৃদয় পূর্ণ উজ্জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল ;—সে মূর্ত্তি তার স্বামীর।

জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আলোকস্নাত ঘরখানির পানে বার বার চাহিয়া সে দেখিল, চারিদিকে তার স্বামীর স্নেহের দান সামগ্রী গুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো! সুন্দর সুন্দর ছবি, কত কাঁচের ফুলদান, নানা রঙ্গের গন্ধ দ্রব্যের শিশি, শঙ্খ, ঝিনুক, জামা, বডিস্, কত কি! আবার দুই চোখ অন্ধকার করিয়া অশ্রুধারার বাণ আসিল! অমনি সে আবার তাড়াতাড়ি চোখের জল মুঁছিয়া লইল! স্বামীর জন্য—ডাক্তার বলিয়াগিয়াছে—স্বামীর জীবনের জন্য—তার সমুদয় দুঃখ বেদনা আজ গোপন করিতে হইবে! আজ তাকে ভাঙ্গা হৃদয় হাসির রূপালি তবকে মুড়িয়া জীবন নাট্যের এক আশ্চর্য্য প্রহসন অভিনয় করিতে হইবে; আর বেশী দেরী নাই! বড় কঠিন সে অভিনয়! অন্তরে অশ্রু চাপিয়া মুখে হাসির অভিনয়! কিন্তু আজ তাকে তা করিতেই হইবে।

ডাক্তার সাহেবের চিঠির কথা মনে পড়িল—বর্ত্তমানে অশান্তির সংশ্রব হইতে তার স্বামীকে না সরাইলে তার আর জীবনের আশা নাই। হারাণ বাবু ডাক্তারকে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে কিছু বলে নাই। ঘরের কথা বাহিরে গাহিয়া বেড়ান হারাণ বাবুর অভ্যাস নয়। বিচক্ষণ ডাক্তার, রোগীর ক্লিষ্টমুখে তার অশান্তির গুপ্ত ইতিহাস সহজ শিশু শিক্ষার মত যেন সবখানি পড়িয়া লইয়াছে! স্বামীর সন্নিহিত মৃত্যুর জন্য সমুদয় পৃথিবীর নিকট আজ সে ই যেন একা অপরাধী। সে তো নিতান্ত মিথ্যা অপবাদ নয়। সে ই অপরাধী! সে ই অপরাধী! জগতের চক্ষে তো সে ই অপরাধী! সে ই তার স্বামীকে সুখী করিতে পারে নাই, তাই সে নিজে এতদিন স্বামীর সমুদয় অসুখ অশান্তি নিষ্ঠুরভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে! তার ভালবাসা এমন বিশ্বাসঘাতিনী, এমন প্রাণনাশিনী, এত নিষ্ঠুর!

নীরদবালা ভাবিল, ডাক্তার ঠিক বুঝিয়াছে! আমার মত হাল্‌কা স্বভাবের স্ত্রী চরম বিপদের কালে কখনো সেবাপরায়ণা দেবীর অটল আসনে বসিবার যোগ্যা নয়। রোগীর উষ্ণ ললাট স্নেহের মঙ্গল স্পর্শে শীতল করিয়া দিবার মত কোমলতা বুঝি আমাতে নাই। বায়ু পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবটায় এই নির্ম্মম সত্যটাই মৃদুভাবে রূপান্তরিত করিয়া বলা হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে নীরদের আজ আবার মনে সেই পাঁচ মাসের মৃত শিশু কন্যার মধুর স্মৃতি বেদনা সাগর মথিত করিয়া ফুটিয়া উঠিল। আসন্ন বিপদের মেঘের উপর মাতৃভাবের অমৃত জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিয়া কে যেন তার হৃদয় স্বর্গের মাধুরীতে রঞ্জিত করিয়া দিল। সে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—না ডাক্তার! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। স্বামীর মঙ্গলের জন্য আমি জন্মজন্মান্তরে লক্ষ লক্ষ বার মৃত্যুর ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে প্রস্তুত আছি। তাড়াতাড়ি আচল্ দিয়া সে চোখের জল মুছিয়া লইল। নীরদবালা যতই মুছে, অশ্রু যেন ততই আরো উচ্ছসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। রোগশয্যা, রোগীর রক্তহীন পাংশু মুখচ্ছবি,

ডাক্তারের ক্ষিপ্র গতি বিধি, ঔষধের শিশি, গ্লাসের চকমকি, অশ্রু, মৃত্যু, বৈধব্য বই—আজ আর কিছু যেন তার চোখে পড়িতেছিল না! সকলগুলি দৃশ্য আজ একত্র হইয়া যেন তার চারিদিকে মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিল! সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল।

তখন ষষ্ঠীর ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত যায় যায় দ্বিতল ভবনের গাঢ় নীল ছায়া দীর্ঘতর হইয়া পড়িয়া বাগানের এক অংশে গাঢ় মসীলেখা ঢালিয়া দিয়াছে। ফুলের বুকে মূর্চ্ছিত চন্দ্রালোক পাণ্ডুরমুখে কাননভূমির নিকট যেন নীরবে বিদায় চাহিতেছিল। কেবল ঝিঁঝি পোকার রিম রিম শব্দ, বড় ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ, আর নীরদের হৃৎপিণ্ডটার প্রবল টিপ্ টিপ্ শব্দ বই নীরদের নিকট সমস্ত জগতের আর সমুদয় শব্দ যেন থামিয়া গিয়াছিল।

সে আজ স্পষ্টই দেখিতে পাইল, চারিদিকে মৃত্যুর কালো ছায়া নিশীথের অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে! সে মুহূর্ত্তে নীরদ তার স্বামী অপেক্ষা মহত্তর, সুন্দরতর, পূর্ণতর মানুষ যেন আর কোথাও দেখিতে পাইতেছিল না। এত দিন সে যাকে ভাল করিয়া বুঝে নাই, মৃত্যুর সম্ভাবনা আজ তাকে এতই বড় করিয়া দিয়াছিল!

গৃহলক্ষ্মীগণ যদি এরূপটী সর্ব্বদাই মনে রাখেন, তবে গৃহ সংসার শান্তিপূর্ণ হয় না কি?

সহসা সিড়ির উপর সুপরিচিত চটির শব্দ শুনা গেল। নীরদবালা তাড়াতাড়ি মুখ চোখ মুছিয়া সম্বৃত হইয়া দাঁড়াইল। হারাণবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। হাসি হাসি মুখে শ্রান্তির ছায়া! তিনি ঘরে আসিতেই নীরদবালা তাঁর গা হইতে ফ্লানেলের সার্টটী খুলিয়া লইল। নিজে ভিজা গামছা দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিয়া শুকনা তোয়ালে হাত মুখ ভাল করিয়া মুছাইয়া দিল। হারাণবাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। যেন এতটা সেবাপরায়ণতা নীরদবালার কাছে আগে কখনো পান নাই, এখনও প্রত্যাশা করেন নাই। নীরদবালা তাড়াতাড়ি একটা গ্লাসে করিয়া খানিকটা ঠাণ্ডা সরবত আনিয়া উপস্থিত করিল। হারাণ বাবু ভাল ছেলের মত এক চুমুকে সব খানি নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। নীরদ কাছে দাঁড়াইয়া এক খানা হাত-পাখা লইয়া তাঁকে বাতাস করিতে লাগিল। হারাণ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন:—"আহা তুমি নিজে কেন! ঝিকে ডাক না!" নীরদ অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখের জলটা গোপন করিয়া বলিল:—"থাক না, আমিই দিচ্চি!"

হারাণ—"তা হলে আগে বক্‌শিশটা লও।" এই বলিয়া সার্টের পকেট হইতে একটা ছোট গ্যাটাপার্চ্চার বাক্স বাহির করিয়া তার সমুখের দিকের স্প্রীং টিপিলেন, ডালা চট্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তার ভিতরে ভায়োলেট্ রংএর পুরু ভেলভেটের গদীর উপর দু'টী হীরার ইয়ারিং দীপালোকে ঝিক মিক করিয়া উঠিল।

আজ নীরদের ব্যথিত হৃদয়ে স্নেহের স্পর্শ সহিতে ছিল না। সে আবার অন্ধকারের, দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল:—কাহিল শরীরে কেন অত ঝকমারি সইতে যাওয়া! তোমার যত সব অনাসৃষ্টি!" আজ স্নেহের তিরস্কারের কথার মাঝে তৃষিত চাতকিনীর নিরাশা মাখানো মর্ম্ম বেদনার ভাবাই অতি মধুরভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল।

হারাণ—'বীণাপাণি' ইয়ারিং আজকাল বাজারে নূতন আমদানী হয়েছে; এমন জিনিষটা হাতের কাছে পেয়ে তোমার কাণে পরিয়ে দেয়ার লোভটা সম্বরণ করতে

পারি নি।" —এই বলিয়া ইয়ারিং দুটী হারাণবাবু নীরদের কানে পরাইয়া দিলেন। আরক্তিম কর্ণমূলে হীরকাঙ্কুর দুটি দুই ফোঁটা জমা অশ্রুবিন্দুর মতই দেখাইতেছিল।

'তোমার চাইতে কি ইয়ারিং দুট বেশী হলো ?" ছল ছল চক্ষে নীরদবালা বলিল।

উকীল বাবু নিজের সাফাই গাহিয়া বলিলেন :—না, নগেনের জন্য চাকরীর তালাসে রাজবাড়ী গিয়াছিলাম, সেখান হতে ফিরিবার সময় পথের পাশে জুয়েলারী দোকানে ইয়ারিং জোড়াটা চোখের উপর ভারি ঝলমল করে উঠলো, তাই নিয়ে এলাম! আর তুমি শুনে খুব খুসী হবে যে নগেনের চাকরী হয়ে গেছে, তাকে আসতে টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি।

নীরদ এবার চোখের জল সামলাইতে পারিল না; তাই সে উকিল বাবুর নিকট ধরা পড়িয়া গেল। তিনি একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাঃ কাঁদচো যে ?

নীরদ তাড়াতাড়ি বলিল—"কাঁদছি কৈ ? না।" কিন্তু বেচারী তখনো চখের জলটা মুছিবার সুবিধা পায় নাই। হারাণ বাবু পরম স্নেহে তার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন :—"সত্যি নিরু আমার কোন কষ্ট হয় নি, এর জন্যে আবার কাঁদা, ছিঃ" !

কষ্টের প্রসঙ্গে ডাক্তারের চিঠির ভীষণ মর্ম্ম হঠাৎ আবার নিরদবালার মনে পড়িয়া গেল। কষ্ট হয় নাই—ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ বিশ্রামই এখন ব্যবস্থা; তার উপর এত হাঁটা হাঁটি! অজ্ঞ আশঙ্কায় তার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সেটা লক্ষ্য করিয়া হারাণ বাবু হাত ছাড়িয়া পরম স্নেহভরে তার মাথায় উপর হাতখানি রাখিয়া বলিলেন:—"ছিঃ নিরু, আজ তোমার হলো কি ? আমার এমন ধারা কান্নাকাটি ভাল লাগে না; তার চাইতে সকাল বেলাকার মত একটা সখের কন্দল জুড়ে দাও, সেটা নিতান্ত মন্দ নয়। জানতো ডাক্তার সাহেব আমায় বলে দিয়েছে—আমার কিছু হয় নাই।

নীরদের হৃদয়ে আবার শঙ্কার নীলাভ বিদ্যুত চমকিয়া গেল। সে শিহরিয়া ভাবিল, চিঠির ভিতরের কথা হারাণ বাবুকে ডাক্তার সাহেব কিছু বলেন নাই, তাই তাঁর এরূপ ধারণা। হায়; এ জগতে ভালবাসার মাঝে যদি এত আশঙ্কা, এত অশ্রু জল না থাকিত, তবে কি আমাদের এত শোক দুঃখভরা দুদিনের পৃথিবী এমন সুন্দর হইত!

হারাণ বাবুর কথা শুনিয়া নীরদবালা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণ বাবু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। নীরদ বালার অমন অসহায় সুন্দর মুখ খানা দেখিয়া তাঁরো প্রাণটা যেন বড় কেমন করিয়া উঠিল। নীরদবালাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। কিছুতেই আজ তাঁহার আর হাসির উচ্ছ্বাস থামিতে চায় না। নীরদবালার হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়া হারাণ বাবু হাসিয়া বলিলেন :—এই নাও তোমায় আর ভাবতে হবে না, একবার এই প্রেস্ক্রপসন খানা পড়ে দেখলেই সব কথা বুঝতে পারবে। পশুপতি ডাক্তার সাহেবের সহিত কনসাল্ট করে এই প্রেস্‌ক্রপসন করেছে।

কাগজ খানা পড়িয়া নীরদাবালার ঘাম দিয়া যেন জ্বর ছাড়িয়া গেল।

প্রেসক্রপসন এইরূপ—

Re.

ডায়মণ্ড ইয়ারিং	২টী
নগেনের চাকরী	১টী

আপাততঃ এই। সহপান, অনুপান, আহার ও বাসের ব্যবস্থা আমি নিজে স্বয়ং শুশ্রুষা কারিণীকে বলিয়া আসিয়াছি, অলমতি বিস্তরেণ। শ্রীপশুপতি রায়।

১লা এপ্রিল।

P. S. আজকার তারিখ ও মাসটার কথা স্মরণ করিয়া বউ দিদিকে ক্ষমা করিতে বলিবে। পশু।

প্রেসক্রপসন পড়িয়া নিরদবালার কিছু রাগ হইল বটে, কিন্তু তার চাইতে আরাম বোধ করিল সে বেশী। আজ তার বারেবারে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতে লাগিল, মৃত্যুর মুখ হইতে কে যেন বড় দয়া করিয়া তার রুগ্ন স্বামীকে সুস্থ শরীরে তার নিকট ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। পয়লা এপ্রিলের তামাসার মধ্যে আজ নীরদবালা সত্যি সত্যি এত বড় একটা খাঁটি সত্যের আস্বাদ পাইয়া ভারি আরাম বোধ করিল।

নীরদ বালা যখন হাসিমুখে পশুপতি বাবুর লিখিত 'এপ্রিল ফুলের' প্রেসক্রপসন পড়িতে পড়িতে লজ্জা ও অপ্রত্যাশিত আনন্দের মিশ্রণে বারবার লাল হইয়া উঠিতেছিল, তখন হারাণ বাবু প্রফুল্লচিত্তে হার্ম্মনিয়ামটাতে সুর দিয়া গান ধরিলেন :—

"শ্রীমুখ পঙ্কজ হেরবো বলে, আমি এসেছি গো এ গোকুলে— ——"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

শ্মশানে।

দিবা নিশি কত যাত্রী, আসে তব মঙ্গল নিলয়ে
নিদ্রার আঁচল পাতি সবে তুমি ভুলাও পলকে!
ধূলি পরে সম শেজ সকলের তরে নিরমিয়ে
দেখাইছ মহা সত্য বিশ্বলোকে—চিতার আলোকে!
সংসারের শেষ তীর্থ, ধ্যানমগ্ন শ্মশান উদার,
তোমারি বিস্ময় মাঝে, স্বরগের দ্বার খুলে যায়—
রহেনা কর্ম্মের ক্লান্তি, রোগ, শোক, বাসনা, বিকার,
মৃত্যুর মাধুরী মাঝে, অন্ত আসি আরম্ভে লুটায়!

শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেন চৌধুরী

পুরীর নক্সা।
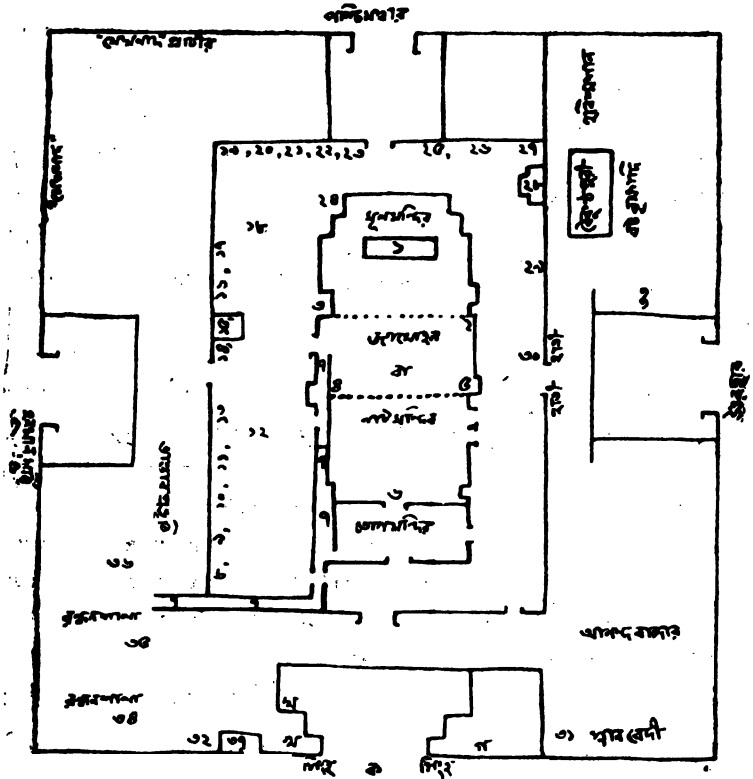
বড় দাণ্ড বা বড় রাস্তা

ক। অরুণ স্তম্ভ, ২২ হাত উচ্চ। খ। ছাউনি মঠ, দ্বিতলে গ। ছাতা মঠ—দ্বিতলে। ঘ। বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ ১। মূল মন্দিরে রত্নবেদী। ২। লোকনাথ ও ৩। মদনমোহন (৺জগন্নাথ দেবের প্রধান প্রতিনিধি দ্বয়)। ৪।৫ জয় ও বিজয় দ্বারপাল দ্বয় ৬। গরুড় স্তম্ভ। ৭। রন্ধন শালা হইতে ভোগ বাহকদের আবৃত রাস্তা ৮। সত্য নারায়ণ ৯। রাধা কৃষ্ণ ১০। অক্ষয় বট কল্প বৃক্ষ তন্নিম্নে বট বৃক্ষ ১১। সর্ব্ব মঙ্গলা ১২। মার্কণ্ডেয় শিব ১৩। গণেশ ১৪। ক্ষেত্রপাল ১৫। মুক্তি মণ্ডপ বা ব্রহ্মাসন। ১৬। নৃসিংহ ১৭। চন্দন মণ্ডপ। ১৮। রোহিণী-কুণ্ড ও কাক ১৯। বিমলা দেবী। (বৎসরে একটি বলি, দুর্গাপূজার সময়) ২০। বেণীমাধব ২১। বৃন্দাবন ২২। কৃষ্ণ ২৩। সিদ্ধি গণেশ ২৪। কারারুদ্ধ একাদশী (পুরীতে একাদশীর উপবাস নাই)। ২৫। কৃষ্ণ। ২৬। সরস্বতী। ২৭। দক্ষিণেশ্বরী কালী। ২৮। লক্ষ্মীদেবী। ২৯। সূর্য্য নারায়ণ ৩০। রামলক্ষ্মণ ৩১। ছাহানি মণ্ডপ ৩২। ভেট মণ্ডপ। ৩৩। শীতলা ৩৪। ময়দার ঢেঁকি ঘর ৩৫। গঙ্গা কূপ। ৩৬। যমুনা কূপ। ৩৭। ডাক ঘর।

ক্ষেত্র-কাহিনী।

পুরাতন হইলেও অনেক কথা 'নিতুই নব'। সুতরাং ক্ষেত্র-তত্ত্বের আলোচনায় ভূমিকার প্রয়োজন নাই।

সত্যযুগের কথা। মালব-রাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সুখাসনে বসিয়া আছেন। সহসা জনৈক জটিল সন্ন্যাসী আসিয়া কহিলেন, মহারাজ, এখানে বসে কর্‌চো কি? রাজ্য ধন ত্যাগ করে এখনি উৎকলে ছুটে যাও। ক্ষীর সমুদ্র হতে এসে লবণ সমুদ্রের তীরে নীলাচলের অরণ্যের ভিতর স্বয়ং বিষ্ণু নীলমাধব দেব গোপনে অবস্থান কোরচেন। তুমি তাঁর সেবা করে জন্ম সার্থক করোগে, যাও, আর দেরী করোনা। এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ভাবিতে লাগিলেন, তাই তো, ভগবান দর্শনের জন্যই মানব জন্ম; তাই যদি না হলো, তবে রাজত্ব করিয়া লাভ কি। আমি এই দণ্ডে রাজ্য ধন ত্যাগ করিয়া উৎকলে যাত্রা করিব। তখন অমাত্যেরা সাত পাঁচ ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে নিবেদন করিলেন,—মহারাজ, উৎকল দেশ বহুদূর, রাস্তা-ঘাট অজ্ঞাত, ভগবান নীলমাধব দেবকেও পাহাড়ে জঙ্গলে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সুতরাং প্রথমে কোন খোঁজ খবর না লইয়া, কেবল জটিল বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সহসা সুদূর বিদেশ যাত্রা করাটা—মন্দ বলিতে পারি না—ভালোই; কিন্তু যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একজন চর প্রেরণ করিয়া খবর জানিয়া লওয়াটা উত্তমতর, অর্থাৎ কি না আরও বেশী ভালো।

রাজপুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুচতুর নবীন যুবক বিদ্যাপতি ঠাকুর এই কার্য্যে প্রেরিত হইলেন। তিনি উৎকলের সমুদ্রতীরে—বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। গহণ অরণ্যে ব্যাঘ্র ও ব্যাধ ব্যতীত অন্য প্রাণী বিরল। বিশ্বাবসু নামক জনৈক ব্যাধ এই দুর্গম স্থানে পার্ব্বত্য প্রস্তর মধ্যে জগজ্জ্যোতি নীলমণি দেবকে একদিন সুপ্রভাতে আবিষ্কার করেন। এই ব্যাধের সাহায্যে বিদ্যাপতি ভগবানের সন্দর্শন লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সপরিবারে পাত্রমিত্র পরিবৃত হইয়া বিদ্যাপতি প্রদর্শিত পথে বৎসরাধিক কাল ভ্রমণের পর শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এই স্থান তখন অরণ্যময় গণ্ডশৈল। সুনীল আকাশের তলে নীল বারিধি তীরে নীলাভ পাদপ-পত্র সমন্বিত স্থান বলিয়াই ইহার নাম তখন নীলাচল ছিল। শ্রীমন্দিরের

উচ্চ অবস্থান দৃষ্টি করিলেই "অচল" নামের সার্থকতা প্রতীত হইবে। যাঁহারা বাইসিকেলে চড়িয়া জিলাস্কুল রোড্ এবং কাছারীর পূর্ব্বদিকস্থ রোডের 'লেভেল' অনুভব করিয়াছেন, পার্ব্বতীয় ভূমি সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ থাকিবে না। "বেলা-বাস" কত উচ্চ-ভূমিতে অবস্থিত তাহাও লক্ষ্য করিবেন।

নীলাচলে উপনীত হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবানের দর্শন পাইলেন না! কারণ বিদ্যাপতিকে দর্শন দিয়া নীলমাধব তিরোহিত হন ও শ্রীক্ষেত্র বালুকাবৃত হইয়া যায়। রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহর্ষি নারদ তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন! এমন কর্ম্ম নাই, যাহাতে নারদ মুনি না আছেন। তাঁহার সহসা আবির্ভাব দর্শনে আমরা চির অভ্যস্ত। ইস্তক ভরত মিলন, রাই উন্মাদিনী প্রভৃতি সাবেক যাত্রায়, নাগাইদ বভ্রুবাহন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি রকমারি নামকরণ বিশিষ্ট হাল যাত্রার অভিনয়ে আমরা নারদ মুনিকে দেখিতে দেখিতে হয়রাণ হইয়া গিয়াছি। সুতরাং শিবের বিবাহের বর যাত্রায় কিম্বা ইন্দ্রদ্যুম্নের উৎকল যাত্রায় তাঁহার আবির্ভাব ও সঙ্গ গ্রহণ বিস্ময়ের বিষয় নহে।

রাজা অনুতাপ করিতে লাগিলেন, হায়. কেন আমি অবিশ্বাসীর ন্যায় বিদ্যাপতিকে পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়া বিলম্ব করিলাম ; এই জন্যই জগন্নাথদেব অপ্রসন্ন হইয়া থাকিবেন। নারদ কহিলেন, "রাজন্! বিদ্যাপতি পথশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তোমার আরও অপরাধ হইয়াছে। বৎসরাধিক হইল সপরিবারে দেশ হইতে যাত্রা করিয়াছ, তোমার রাণীর পুত্র জন্ম সম্ভাবনা হইয়াছে, এইজন্য প্রভুর দর্শন পাইবে না। যাহাহউক, গতস্য শোচনা নাস্তি, তুমি এখন এক কাজ কর, শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দাও।" রাজা তাহাই করিলেন। তখন জগৎপতি নারায়ণ তাঁহাকে স্বপ্নে—বলরাম; সুভদ্রা, জগন্নাথ ও সুদর্শনচক্র এই চতুর্দ্ধা মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। রাজা নারদের উপদেশ ক্রমে সমুদ্রজলে ভাসমান এক অপূর্ব্ব দেবদারু বৃক্ষ লইয়া, স্বর্গ হইতে বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার দ্বারা ঐ চারিমূর্ত্তি গঠন করাইলেন। কথা ছিল, রুদ্ধদ্বার গৃহে প্রতিমা নির্ম্মাণ হইবে, পনের দিন পর্য্যন্ত কেহ দ্বার খুলিবে না। রাণীর বিলম্ব সহিল না, তাঁহার ঔৎসুক্য নিবারণ জন্য অকালে দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। এই জন্য প্রতিমা অতি অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। অগত্যা কোন-মতে নাক মুখ চোখ আঁকিয়া দেওয়া হয়। হায়! আদম ও ইভের কাল হইতেই যে স্ত্রীবুদ্ধির প্রলয়ঙ্করীতা!

শ্রীমন্দির—শ্রীক্ষেত্র।
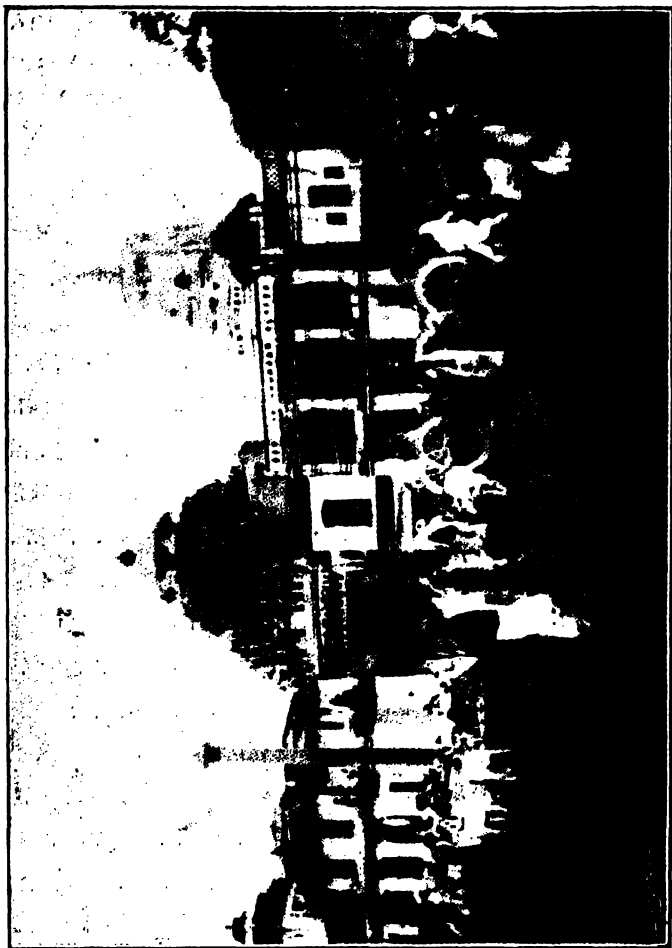
বিশ্বকর্ম্মা মর্ত্ত্যে আসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কেন ঐরূপ কড়ার করিয়া লইয়াছিলেন বলিতে পারা যায় না। কএক বৎসর পূর্ব্বে কোন জমীদারের স্থাপিত কালিকা দেবীর পাষাণ মূর্ত্তিতে পুরাতন রং তুলিয়া লইয়া নূতন রং করিবার জন্য বিদেশ হইতে এক সুনিপুণ চিত্রকরকে নিযুক্ত করা হয়। পাথরের উপর কিরূপে রং ফলাইতে হয়, তাহা স্থানীয় চিত্রকরগণ শিক্ষা করিয়া না লয়, এই ভয়ে বিদেশী চিত্রকরও এইরূপ কড়ার করিয়া লইয়াছিল। বোধ হয় বিশ্বকর্ম্মার কড়ারেরও ইহাই কারণ।

শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রশস্ত রথবর্ত্ম উত্তর পূর্ব্বদিকে গিয়াছে তাহার স্থানীয় নাম "বড়দাণ্ড"। বড়দাণ্ড প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ। ইহার অপর প্রান্তে অবস্থিত "গুণ্ডিচা বাড়ী"তে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ও বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক শ্রীমূর্ত্তি গঠিত হয়। ইন্দ্রদ্যুম্নের মহিষীর নাম গুণ্ডিচা দেবী। তাঁহার নামানুসারে যজ্ঞভূমির ঐরূপ নামকরণ। নীলাচলের বালুকাবৃত স্থানে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাজা গুণ্ডিচা বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া ব্রহ্মার সাহায্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। যজ্ঞের স্মরণার্থে তদবধি প্রতি বৎসর "গুণ্ডিচা যাত্রা" বা রথ যাত্রা হইয়া থাকে। ইতর লোকে ইহাকে জগন্নাথের মাসীর বাড়ী যাওয়া বলে। গুণ্ডিচা বাড়ীতে মাঝে সাত দিন থাকিয়া নবম দিবসে প্রভু শ্রীমন্দিরে পুনর্যাত্রা করেন। গুণ্ডিচা নিকেতন প্রকৃত পক্ষে একটী উদ্যান বাটিকা। ইহার দৃশ্য মনোহর ও শান্তিপ্রদ। সহরের সুদূর পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত লোকনাথের মন্দিরও ঐরূপ একটী বাগানবাড়ী। গুণ্ডিচার বাগানে আসিয়া ভ্রাতা পুরুষোত্তম দেবের কিছুদিন নিশ্বাস ফেলিবার ও শান্তিতে থাকিবারই কথা। কিন্তু এ কয়দিন কলরব ও মহোৎসবের অন্ত নাই। উড়িষ্যায় দেবতাদিগকে প্রায়ই অতি অন্ধকার ময় বায়ু সঞ্চালনহীন ক্ষুদ্র সেঁত সেঁতে গৃহে অবস্থান করিতে হয়। এত যে কারুকার্য্যময় নয়নরঞ্জন উচ্চচূড় শ্রীমন্দির, তবু রত্নবেদীর প্রকোষ্ঠের অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করুন। জলসিক্ত অসূর্য্যম্পশ্য অন্ধকারাবৃত নির্ব্বাত স্থান! প্রভু জগন্নাথ দর্শনে অধীর বহুদূরাগত বৃদ্ধ যাত্রিগণ বাহিরের আলোক হইতে সহসা নাটমন্দিরের অভ্যন্তরে কাষ্ঠের রেলিং নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের তৃষিত ও ক্লান্ত নেত্রে সম্মুখের অন্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ হইলে, যেরূপ ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক। সুবিধার বিষয় এই যে যখন পণ্ডাদের অনুগ্রহে মূল মন্দিরে অতি সতর্কতার

সহিত ভীত হইয়া ক্ষীণ ঘৃতপ্রদীপের কৃপাকণার সাহায্যে ভক্তগণ অবশেষে জগৎপতির দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহাদের হৃদয় রাজ্য অতুল আনন্দ ও ভক্তিতে বিভোর হইয়া থাকে; সুতরাং জলসিক্ত পিচ্ছল সোপানে কেহ স্খলিত পদ হইলেও তাহার মনের ভিতর কষ্ট প্রবেশ করিতে অবসর পায় না। বারো বৎসর পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব একবার গুণ্ডিচা উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে আসিলেও এখানেও তাঁহাকে ঠিক পূর্ব্ববৎ অন্ধকারাবৃত জলসিক্ত গুপ্তগৃহে দিবানিশি অবস্থান করিতে হয়। শ্রীমন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে উত্তর দিকে মার্কণ্ডেয় সরোবর পর্য্যন্ত এক রাস্তা গিয়াছে। সেই সরোবর তীরে প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের মন্দিরের অভ্যন্তরের অবস্থা আরও শোচনীয়। কাশীর বিশ্বেশ্বর কিঞ্চিৎ মুক্ত বায়ু সেবন করেন বটে, কিন্তু যাত্রিগণ অবিরাম তাঁহার মস্তকে হস্ত বুলাইয়াই তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। এজন্যই বোধ হয় জল ঢালিবারও ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে! কাশীতে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠীত শ্বেতপ্রস্তর সজ্জিত মন্দিরে মহাদেবের মুক্তকক্ষে-উচ্চাসন আদর্শ স্থানীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

পুরীর বর্ত্তমান ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত রমাবল্লভ মিশ্র মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি, তিনি শ্রীমন্দিরে ইলেক্‌ট্রিক লাইটের বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াসী ছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলাম এই প্রস্তাবে "রামানুজ দাস" মোহান্তদের কেহ কেহ অসম্মত নহেন, কিন্তু অধিকাংশ মঠাধীশ্বর ও মন্দিরের সেবকগণ কোনরূপ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছা করেন না। কালে সব হইতেছে—সবই হইবে।

গুণ্ডিচা বাড়ীর নিকট উত্তর পূর্ব্বদিকে "ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর"। ইহা ৫৮৬×৩৯৬ বর্গফিট। পূর্ব্বোক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞকালে রাজা ব্রাহ্মণদিগকে গবী (গাভী) দান করিয়াছিলেন। সেই সকল গবীর খুরের আঘাতে এই বৃহৎ সরোবর উৎপন্ন হয়। বালখিল্য মুনিগণ গোপদ গর্ত্তের কর্দ্দমাক্ত জলে হাবুডুবু খাইতেন এরূপ গল্প আছে বটে, কিন্তু অসংখ্য গবী একত্র হইলে অকঠিন স্থানে একটা দহ পড়িয়া যাইয়া সরোবর খনন করার সুবিধা হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মার্কণ্ডেয় ও নরেন্দ্র সরোবর এবং শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গার জলে ডুবদিয়া যাত্রিগণ মুক্তি অন্বেষণ করিয়া থাকেন। দীর্ঘিকা গুলির চারিধারে বহুদূর বিস্তৃত পাষাণময় সোপান। শ্বেত গঙ্গা (শ্বেত মাধবের নামানুসারে) অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও ইহার সোপানাবলী উচ্চ

বলিয়া দুরারোহ। কুম্ভকক্ষা জনৈকা রমণীকে এই সোপান শ্রেণী বহুকষ্টে অতিক্রম করিতে দেখিয়া কবি-বচন মনে উদিত হইল :—

"রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষাচ্চ্যুতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমারুহ্য চকার শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঠঃ॥"

শ্রীমূর্ত্তির ন্যায় শ্রীমন্দিরও রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পর অনেক বার নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দির পুরীরাজ অনন্ত ভীমদেব কর্ত্তৃক ১১৯৮খৃঃ সনে নির্ম্মিত হয়। বিষ্ণুচক্র ও ধ্বজা সুশোভিত প্রধান দেউল প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের নাম মেঘনাদ প্রাচীর। ইহা ২৪ ফিট উচ্চ। আয়তন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ৬৮৭ ফিট এবং উত্তর দক্ষিণে ৬৭৬ ফিট। মন্দির তিন ভাগে বিভক্ত পশ্চিম প্রান্তে রত্ন সিংহাসনান্বিত মূলমন্দির বা হরি মন্দির, পূর্ব্বপ্রান্তে ভোগমন্দির এবং মাঝে সুবিস্তৃত নাট-মন্দির বা 'জগমোহন'। জগমোহনের পূর্ব্বাংশে গরুড় স্তম্ভ। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ইহাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিতে হয়। তৎপর অগ্রসর হইয়া জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালের অনুমতি লইয়া রত্নসিংহাসনোপরি নীল নীরদ শ্যাম রুচি বনমালা বিভূষিত পীতাম্বরধারী স্বয়ং ভগবানের সুদর্শন চক্র সহ চারিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। রত্নবেদী ১৬×১৩×৪ ঘন ফিট, কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহাতে লক্ষ শালগ্রাম শিলা আছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ললাটে বহুমূল্য হিরক জ্যোতিঃ—দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব বর্ণিত বিশ্বাবসু ব্যাধের বংশধরগণ (৮৪ ঘর) এখনও বর্ত্তমান। ইহাদের উপাধি দৈত্যপতি। যথা, শ্রীদামোদর দাস দৈত্যপতি, শ্রীমাধব দাস দৈত্যপতি। বিদ্যাপতি ঠাকুরের বংশে একমাত্র শ্রীরামচন্দ্র পতি মহা-পাত্র নামক ১৬ বৎসরের বালক ব্যতীত আর কেহই জীবিত নাই। ইহারা এখনও মন্দিরের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ব্যাধের সন্তান দৈত্যপতিগণ বিবাহ বিষয়ে করণ কায়স্থদের সঙ্গে আদান প্রদান করিয়া থাকেন। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় (স্নানযাত্রা) অত্যধিক স্নানের ফলে পুরুষোত্তম যখন জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং দুই সপ্তাহ কাল রোগশয্যায় (অনবসর বেদীতে) অবস্থান করেন, তখন কেবল দৈত্যপতি বিদ্যাপতি বংশীয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই জগন্নাথ দেবের রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারেন না। ইহা হইতেই এই বিশিষ্ট সেবকেরা যে মহাপ্রভুর "চিহ্নিত" প্রিয়পাত্র তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রোগীর নিকট কিম্বা বিশ্রাম গৃহে নিতান্ত বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কে

যাইতে পারে? এ কয়দিন পাকশালা বন্ধ থাকে। প্রভুর চিত্রপট দ্বারা আবশ্যক বিধি পরিচালিত হয়। পক্ষান্তে আরোগ্য স্নানের পর রথযাত্রার পূর্ব্ব দিবস অন্যান্য সেবক ও জনসাধারণের নিকট জগন্নাথ দেবের পুনরায় আবির্ভাব হয়। ইহার নাম "নবযৌবন" দর্শন। জগন্নাথ দেব শব্দে বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীকেও বুঝিতে হইবে।

দ্বাদশ বৎসর পর নবযৌবনের সঙ্গে সঙ্গে নবকলেবর দর্শনও হইয়া থাকে। স্নানযাত্রার অব্যবহিত পর, উপর্য্যুক্ত "অনবসর" কালে, কোনও শাস্ত্রবিহিত দিনে, দ্বাদশ বৎসর পরে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নূতন দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিয়ম। কিন্তু ঐ দিন আষাঢ় মাস ও মলমাস হওয়া চাই। ফলে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তরেই নব কলেবর ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এইজন্য প্রতি বৎসর ভক্তদের আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত বিদ্যমান কলেবরকেই মার্জ্জিত করিয়া 'নবযৌবন' করা হয়। সুদীর্ঘ ৩৯ বৎসর পর গত বর্ষে (১৩১৯) কলেবর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুরীর রাজা পুরুষানুক্রমে মহাপ্রভুর প্রধান সেবক ও মন্দিরের অধ্যক্ষ। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পুরাতন কলেবর পরিত্যাগের কিছুকাল পর দুই একজন পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার তনুত্যাগ হয়। ইহা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান পুরীরাজ নবকলেবর প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। পরে তিনি পাণ্ডা ও পণ্ডিতগণের শাস্ত্র বিহিত মতের প্রাবল্যে বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। নূতন দারুমূর্ত্তি পূর্ব্ব হইতে দেবালয়ের বহিপ্রাঙ্গনের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত 'বৈকুণ্ঠ' ভবনের (যে গৃহে "আটকে বন্ধন" হয়) এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে গোপনে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভগবানের পুরাতন কলেবর ত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর গ্রহণ কালে দৈত্যপতিগণ ব্যতীত আর কাহারও মন্দিরে থাকিবার অনুমতি নাই। এরূপ জনশ্রুতি শ্রীমূর্ত্তি ত্রয়ের উদরের ভিতর এক একটী অমূল্য রত্ন কৌটা আবহমান কাল হইতে অতীব যত্নে রক্ষিত আছে। নির্দ্দিষ্ট দিন রাত্রিকালে বস্ত্রদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া তিন জন দৈত্যপতি উক্ত রত্নকৌটা নূতন মূর্ত্তি ত্রয়ের উদরের ভিতর রাখিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠ ভবনের পশ্চিমে "হরিশ্মশানের" জঙ্গলে পুরাতন কলেবর বিসর্জ্জন করা হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

পরলোকে দ্বিজেন্দ্রলাল।

আর বুঝি বাজিবে না, ওমা বীণাপাণি
তোমার নিকুঞ্জ দ্বারে, সাধকের বীণা ;
তারে যার কেঁপেছিল হাসির রাগিণী
শিখিতে যা কুঞ্জে উড়ে এসেছিল শ্যামা !
সুচির বসন্ত স্বপ্নে মুগ্ধ বঙ্গবাসী,
নব কুসুমিত বনে শুনিত ঝঙ্কার,
নিত্য শরতের স্নিগ্ধ কৌমুদী পিয়াসী—
লইত হৃদয় ভরি অঞ্জলি সুধার !
মালঞ্চের পুষ্পগন্ধ ছন্দে জড়াইয়া
শ্যামা জননীর পদে দিতে অর্ঘ্য ভার।
কে দিতে রহিল ছন্দে, হৃদয় সেঁচিয়া
রক্তের উদ্দাম লীলা ! কে গাহিবে আর
উদাত্ত গম্ভীর স্বরে আনন্দে বিহ্বল
নব উদ্বোধন মন্ত্র ! বীণায় কাহার
ঝরিবে সুধার ধারা, সঙ্গীত তরল,
সপ্ত কোটী কণ্ঠে তুলি প্রতিধ্বনি তার !
কে শিখাবে, হে বরেণ্য বৈদিকের মত
সবারে মোহিতে মন্ত্রে মণ্ডপে পূজার,
কে দাঁড়াবে, হে ঋত্বিক, লয়ে সঙ্গী যত
নিবেদিতে বাণীপদে অঞ্জলি আত্মার !
চির তরে, নন্দনের শুভ আশীর্ব্বাদ
ঝরে গেছে !—মৌন তব হাসি তান লয়,
সপ্ত কোটী মুখে লিপ্ত গভীর বিষাদ,
ঘন বরিষায় কাঁদে বঙ্গের হৃদয় !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য সেবক

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত—নিবাস চট্টগ্রাম। জন্ম ১৮৬৬ সনের ৮ই আগষ্ট। মিঃ দত্ত বিলাতের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পাস করিয়া আসিয়া ১৮৯৪ সনে জব্বলপুর কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতেই তিনি সাধনা, ভারতী, প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকায় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। ১৯০৮ সনে মিঃ দত্ত রাজসাহী কলেজে বদলি হন। ১৯১২ সনে শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তিনি ৩।৪ খানা ইংরেজী গ্রন্থও লিখিয়াছেন।

শ্রীঅবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ—ঢাকা জেলার অন্তর্গত আউটসাহী গ্রামে ১২৯৩ সনের ৩রা কার্ত্তিক তারিখে ইহার জন্ম। ইঁনি বিক্রমপুরের অন্যতম প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গগত শশীভূষণ সেন মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র। ইঁহারা সাত ভাই। অবনীকান্তের ভ্রাতৃ বর্গের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য সেবী। অবনীকান্তের অনুজ স্বর্গগত যামিনীকান্ত সেন "ঢাকা জগন্নাথ কলেজ ম্যাগাজিন" নামক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক ছিলেন। পাঠ্য জীবনেই অবনীকান্ত গদ্যেও পদ্যে বহুবিধ প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৩১১ সনে মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত "কনিকা" নামক মাসিক পত্রে ইঁহার "জীবন যাত্রা" শীর্ষক একটী কবিতা প্রকাশিত হয়। অতঃপর অন্যান্য মাসিক পত্রেও তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩১৪ সনে অবনীকান্ত এণ্ট্রান্স পাশ করেন। এই সময় জগন্নাথ কলেজ ম্যাগাজিনে ইঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন বাবুর শেষ জীবনে "ছায়া দর্শন" প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ রচনায় অবনীকান্ত বিশেষরূপে তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন। "শিক্ষাসমাচারে" সহকারী সম্পাদক রূপে ইনি কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সনে পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় পণ্ডিত অবনীবাবুকে "সাহিত্য বিশারদ" উপাধি প্রদান করেন। ভারত মহিলা, সোপান, তোষিণী এবং ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন প্রভৃতি মাসিক পত্রে অবনী বাবুর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি অবনীবাবু কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত "২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত—পিতার নাম স্বর্গীয় নবকুমার গুপ্ত। নিবাস জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত কোঁয়রপুর। ১২৮৩ সনে অবিনাশ বাবু

জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্য সেবী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর। ১৮৯৬ সনে বি, এ, পাশ করিয়া অবিনাশবাবু কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। অতঃপর বি, এল পাশ করিয়া ঢাকাতে উকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি "নব্য ভারত" 'প্রদীপ,' "ভারতসুহৃদ" প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। অতঃপর দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, উত্তীর্ণ হইয়া সাঁওতাল পরগণার দুমকায় কতক দিন উকালতি করেন, ১৯০৩ সনে তিনি সাংখ্য শাস্ত্রে গবর্ণমেণ্টের উপাধি পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হন কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সম্পূর্ণ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। ১৯০৮ সনে তিনি ঢাকা হইতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় পাক্ষিক সংবাদপত্র "শিক্ষা-সমাচার" বাহির করেন। ১৯০৯ সনে ইহা সাপ্তাহিক হয়। ১৯১১ সনে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে অবিনাশবাবু "বিশ্ববার্ত্তা" বাহির করেন। এই উভয় কাগজই এখন যথারীতি পরিচালিত হইতেছে। অবিনাশবাবু অনেক গুলি স্কুল পাঠ্য পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত ঝালকাটী থানার অধীন রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺শঙ্করচন্দ্র গুহ বরিশালে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকীল ছিলেন। অবিনাশ বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর সন্তান। অবিনাশ বাবু ১৫ বৎসর বয়সের সময় বরিশাল জিলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি ও একটী স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। এফ্, এ পরীক্ষায়ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বি, এ পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সংস্কৃতে Honour লইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম, এ, পাশ করিয়া প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। পরে মেডিক্যাল কলেজে দুই বৎসর শিক্ষা লাভ করেন এবং রসায়ণ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া একটী সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। এখানে শিক্ষা সম্বন্ধে কোন বিষয়ে ইহার আপত্তি হওয়ায় এবং অভিযোগে কোন প্রকার ফল না পাওয়ায় তিনি মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আইন শিক্ষায় মনোযোগ দেন এবং যথা সময় বি এল, পরীক্ষা পাশ করিয়া হাইকোর্টে উকালতী আরম্ভ করেন। ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার ন্যায় পার্শি এবং ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে নব্যভারতে কবিতাও সমালোচনা লিখিয়া থাকেন। ইঁহার বয়স এখন ৩৭।৩৮ হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য

অনারেবল নবাব সৈয়দ নবাবআলী চৌধুরী খান্‌বাহাদুর

ASUTOSH PRESS, DACCA.

৺
সৌরভ

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩২০ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

স্ত্রী শিক্ষা।

এখন স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের আর মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে, বালিকাগণ যেরূপভাবে শিক্ষা পাইতেছে তাহা নারী জীবন গঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী কিনা; নারীধর্ম্মের অনুকূলে কিম্বা প্রতিকূলে এই শিক্ষা ধাবিত হইতেছে কিনা? বালকগণ ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা পাইয়া সমাজকে প্রাণহীন করিয়া ফেলিতেছে, আমরা পদে পদে ইহার প্রমাণ পাইতেছি। নারীগণ ধর্ম্মহীনা হইলে সমাজের অশেষ দুর্গতি হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। রমণীই সমাজে ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্রী। বর্ত্তমান যুগে এত অবিশ্বাস ও কপটতার মধ্যেও ভারত রমণীগণের ধর্ম্ম-প্রাণতা সমাজকে বিনাশের হস্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অন্ধ বিশ্বাসই হউক আর যাহাই হউক তাঁহাদের অস্থি মজ্জাগত ধর্ম্ম বিশ্বাস ও একাগ্রতা এই বিশাল সমাজকে নানাপ্রকার সংঘর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রভাবে পুরুষগণ একদিকে প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা দিন দিন ঘোরতর অবিশ্বাসের মধ্যে পতিত হইতেছেন। অপরদিকে গৃহে অশিক্ষিতা কিম্বা অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীর সংসর্গে তাঁহাদের সেই অবিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হইতেছে। এই সন্ধিক্ষেত্রে যদি উচ্চ শিক্ষিতা, ধর্ম্মভাবাপন্না এবং কোমল হৃদয়া ভারত রমণীগণ যথার্থ কর্ণধারের কার্য্য করিতে পারেন, তবে ভারতে নবযুগের সঞ্চার হইতে পারে। এখন নারীদিগকে সেই শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রাণতা আরো সুন্দররূপে পরিস্ফুট ও সুপরিমার্জ্জিত হইয়া পুরুষ সমাজের প্রাণ অভিষিক্ত করে; তাঁহাদের সমুদয় নির্জ্জীবতা ও অবিশ্বাসকে বিনাশ করিয়া নবতেজ ও নবভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

এখন দেখা যাক্ ইদানীং রমণীগণ যে শিক্ষালাভ করিতেছেন তাহাতে তাঁহারা সেই মহৎকার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত হইতেছেন কিনা? চিন্তাশীল

ব্যক্তিগণের প্রাণে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইতেছে। তাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়া ভীত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এখনও তাঁহাদের এত ভীত হইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই। যে দেশে আজও এক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে চারিজন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে, সে দেশে এখনও ঐ প্রশ্নের সময় আসে নাই। যে দেশে আজিও শিক্ষার সূচনা হইতে না হইতেই কন্যাগণ পরিণীতা হইয়া গৃহে আবদ্ধ হইতেছেন এবং অপ্রাপ্ত বয়সে জননী হইয়া পড়িতেছেন, সে দেশে এ প্রশ্ন আদৌ উঠিতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

যে যে উন্নত ধর্ম্ম সমাজ নারীদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিতে প্রয়াসী হইয়া অনুপায়স্থলে পুত্রগণের ন্যায় প্রাণহীন শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের অবশ্য চিন্তার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষা কাহাকে বলে? কেবল কয়েকখানি পুস্তক মুখস্থ করিয়া তাহা পরীক্ষা মন্দিরে উদ্গীরণ করিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। প্রকৃত শিক্ষাতে পুরুষ নারী ভেদ নাই। শিক্ষা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তি ভগবান পুরুষ ও নারী উভয়কেই সমভাবে দান করিয়াছেন। কেবল কর্ষণের অভাবে নারী জীবন ম্লান হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা তাহাই যাহা অন্তর্দৃষ্টি দান করে, যে শিক্ষা মনকে নির্ম্মল করে, যে শিক্ষা জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে শিখায়, যে শিক্ষা নব নব সংস্কার ও ভাবকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে সক্ষম করে, যে শিক্ষা গৃহে শান্তি আনয়ন করে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী এইরূপ নারীচরিত্র গঠন করিবার অনুকূলে কিনা? বর্ত্তমান শিক্ষাদ্বারা (শিক্ষা বলিতে আমি বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষার কথা বলিতেছি) নারীগণ উচ্চাঙ্গের পুস্তক সকল পাঠ করিয়া অনেক নূতন বিষয় জানিতেছেন এবং জ্ঞানলাভের সুবিধা পাইতেছেন। তাঁহাদের চিন্তাবৃত্তি পরিস্ফুট হইতেছে। তাঁহাদের স্বাবলম্বন শক্তি জাগ্রত হইতেছে। তাঁহারাও পুরুষগণের ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম হইয়া অনেক স্থলে গৃহ পরিবার রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এই শিক্ষা আবার নারীদিগকে কিরূপ বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়। বিলাতের শফ্রেজিষ্ট সম্প্রদায় ইহার সাক্ষী। সেখানে রমণীগণ নারীকুলোচিত সলজ্জভাব পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ ভীষণ কাণ্ডের অবতারণা করিতেছেন ভাবিলে লজ্জা হয়। এই কঠোর শিক্ষা প্রভাবে নারীগণ অনেক স্থলেই কঠোর প্রকৃতি হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা বিনষ্ট হইতেছে।

তাঁহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। যে স্নিগ্ধ তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণীগণ আরাম ও সুখলাভ করে তাহা যদি কঠোর মরুভূমি সদৃশ হইয়া পড়ে তবে ত সংসার আর বাসোপযোগী থাকিবে না। এইরূপ শুষ্ক জীবন লইয়া ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক অনেক রমণীকে আজীবন অবিবাহিতা থাকিতে হইবে। তাঁহাদের নীরস জীবন যে কতদূর ভারবহ হইয়া পড়িবে তাহা চিন্তা করিলে ভীত হইতে হয়। এইরূপ নীরস জীবন যে নারীধর্ম্ম-বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। পতি পুত্র ইত্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত গৃহে উপযুক্ত গৃহিণী এবং সহধর্ম্মিণী হইয়া উত্তম ভবিষ্যৎ বংশ সৃষ্টি করাই রমণীর কার্য্য। যে সকল রমণী এই দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া সুপত্নী, সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষিতা। কেবল পারি-বারিক সুখ, সুবিধা ও সুবন্দোবস্ত হইলেই চলিবে না। শিক্ষিতা-নারী পরিবারের শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতিরও বিধাত্রী হইবেন। তাঁহাদের কার্য্য কেবল গৃহে আবদ্ধ থাকিবে না। যতদূর সম্ভব তাঁহাদের হস্ত জনসমাজের কার্য্যেও ব্যবহৃত হইবে। তাঁহারা স্বামী পুত্রের উন্নতির বিঘ্ন না হইয়া তাহার বিকাশের পথই উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। ইহাই শিক্ষিতা নারী জীবনের প্রকৃত অবস্থা। যে শিক্ষা দ্বারা রমণীর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে ম্লান না করিয়া বিকাশ করে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীদ্বারা এই কার্য্য আশানুরূপ সুসাধিত হইতেছে না। পুরুষ এবং নারী লইয়া মনুষ্য সমাজ। কঠোর পুরুষ-প্রকৃতির সহিত কোমল নারী চরিত্রের সম্মিলনই বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধান। প্রকৃতির আদান প্রদানেই সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়। রমণীচরিত্রে পুরুষ-প্রকৃতির বাহুল্যে সমাজে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টলাভ হইবে না। যে প্রণালীদ্বারা রমণীর রমণীয়তাকে আরো উজ্জ্বল করে সেই শিক্ষা প্রণালী অবিলম্বে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মহিলা বিদ্যালয়গুলি যতদূর সম্ভব বস্তী হইতে দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহিলাগণ যাহাতে নারীজনোচিত শারীরিক ব্যায়াম করিতে পারেন তাহার সুবন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষিতা প্রায় সকল মহিলারই শরীর ভগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম অথচ সেই পরিমাণ শারীরিক ব্যায়ামের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। এইরূপ রুগ্ন মাতার সন্তান যে দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব এই দিকে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

স্কুল কলেজ সংসৃষ্ট বোর্ডিং থাকা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই বোর্ডিং পরিচালন অতীব কঠিন কার্য্য। পরিচালন-কর্ত্রীর কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। একদিকে যেমন তিনি উৎকৃষ্ট শাসনকর্ত্রী হইবেন অপরদিকে তাঁহাকে মাতার ন্যায় সুকোমল হইতে হইবে। একাধারে কঠোরতা ও কোমলতা সন্নিবিষ্ট থাকিবে। কেবল কড়াকড়ি, তিরস্কার গঞ্জনার মধ্যে বালিকাগণ বৰ্দ্ধিত হইলে তাহাদের জীবন নিশ্চয়ই শুষ্ক হইয়া পড়িবে, আবার উপযুক্ত শাসন না থাকিলে তাহার ফল যে অত্যন্ত শঙ্কাজনক তাহা সকলেই অনুভব করেন। আমি এখানে দৃষ্টান্তস্থলে একটী মহিলার নাম উল্লেখ করিতেছি। আমার একান্ত পূজনীয়া কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী মহাশয়া এই কার্য্যের আদর্শ স্থানীয় মহিলা। ইনি বহুকাল বেথুন কলেজে শিক্ষকতা করিয়াছেন। তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে অতি দুর্দ্দান্ত-বালিকাও শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার মাতৃসম শাসনে দুষ্ট মেয়ে-লক্ষ্মী হইয়াছে। তিনি একদিকে যেমন ফুলের মত কোমল অপরদিকে সুশাসন কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহাতে একাধারে এই দুইটী গুণ ছিল বলিয়া তিনি অনেক সুচরিত্রা নারী গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার বয়স ষাটের অধিক হইয়াছে। আজীবন সুনির্ম্মল কুমারী-জীবন যাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে চরিত্রের মধুর সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া তিনি আজ জীবনের সান্ধ্যায় উপনীতা হইয়াছেন। কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী মহাশয়া উপাধিধারিণী মহিলা নহেন, কিন্তু তাঁহার মত শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতা ইদানীং কয়জন মহিলা লাভ করিয়াছেন জানি না। হৃদয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্ম এবং হস্তে প্রিয় কার্য্য সাধন ইহা তাঁহার জীবনে সংসাধিত হইয়াছে। গুরু শিষ্যের এমন সুমিষ্ট সম্বন্ধ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লোক দেখান স্পৃহা তাঁহার মোটেই ছিল না। কুমারী-জীবন কেমন সুনির্ম্মল সুন্দরভাবে কাটাইতে হয় তাহা এই মহিলা দেখাইয়াছেন। বিলাতের ফ্রোবেল ইনষ্টিটিউটের অধীন শিক্ষয়িত্রী গঠন কলেজের অধ্যক্ষ কুমারী লরেন্সের সঙ্গে ইহাঁর তুলনা করা যাইতে পারে।

শিক্ষার নামে একটী নূতন অদ্ভুত জীব সৃষ্ট হইলে দেশের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। শুনিয়াছি অধিকাংশ ইউরোপীয় মহিলা কোন কলেজে পড়িয়া শিক্ষা লাভ করেন না কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা এত অধিক যে সকল বিষয়েই তাঁহাদের অধিকার জন্মায়। পণ্ডিতগণের পুস্তক পাঠ করিয়া, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, তাঁহাদের এই শিক্ষা লাভ হয়। ভগবান করুন সেইদিন অতি শীঘ্র আসুক যে দিন ভারতরমণীগণ নবশক্তি বলে জাগ্রত হইয়া ভারতবাসীকে সতেজ করিতে সমর্থ হইবেন। ভারতবাসীর অবিশ্বাস নির্জ্জীবতা দূর হউক। তাঁহারা শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হউন।

শ্রীকুলদা দেবী।

"দেয়ালা" বা স্বপ্নে শিশুর হাসি কান্না।

পৃথিবীতে শিশুর জীবন একটী আশ্চর্য্য প্রহেলিকা রূপে প্রতীয়মান হয়। শিশুর স্বপ্ন সেই প্রহেলিকার একটী প্রধান ব্যাপার। এই স্বপ্ন ব্যাপারের রহস্যোদ্ভেদের প্রয়াসেই উপস্থিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে শিশুর বয়ঃক্রম এক মাস হইলেই তাহাতে স্বপ্নের বিকাশ প্রত্যক্ষীভূত হয়।

স্বপ্ন সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যা যে যে সমস্ত সংস্কার আমাদের মনোমধ্যে লক্ষিত বা অলক্ষিতরূপে সঞ্চিত হয়, আমাদের নিদ্রিতাবস্থায় যখন আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তিরোহিত হয়, তখন উক্ত সংস্কার সকল প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেই তাহাতে স্বপ্নের সৃষ্টি হয়।

সংসারের নিত্য সংঘটিত ঘটনাবলী হইতেই স্বপ্নের সংস্কাররূপ উপাদান সকল সংগৃহীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে শিশু কোথা হইতে জীবনের প্রথম সূত্রপাতেই তাহার সংস্কার সকল লাভ করে? শিশুর সংস্কার সংগ্রহের আমরা দুইটী পথ নির্দ্দেশ করিতে পারি, একটী পূর্ব্বজন্ম অপরটী বর্ত্তমান জন্ম।

শিশু যে বর্ত্তমান জীবনেই সম্পূর্ণ নূতন জীবন আরম্ভ করে তাহা নহে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার সকলকে প্রধান সম্বল করিয়াই শিশুর জীবন আরম্ভ হয়। মৃত্যুর পর জীবনের সমস্ত সংস্কার একটী সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিয়া বায়ু ভূত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, ইহাই শাস্ত্রের মত। এই সূক্ষ্ম দেহ 'লিঙ্গ শরীর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই লিঙ্গ শরীরই স্থূল দেহ ধারণ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রের এই মর্ম্মের অনুসরণ করিলে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার কিরূপে শিশুর সহচারী হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

জন্মান্তরীণ সংস্কার সকলের যোগেই নূতন দেহ গঠন আরম্ভ হয়। দেহ যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্র ব্যতীত কার্য্য সম্ভব পর হয় না। সংস্কার সকল এই নূতন যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করে। এই রূপে পূর্ব্ব সংস্কার সকল নূতন দেহে অনুপ্রবিষ্ট ও আবদ্ধ হইয়াই জীবনের মূলগতি নির্ণয় করিয়া থাকে। ইহাই দার্শনিক ভাষায় কর্ম্মফলের প্রভাব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

হস্ত সংযোগে একটী চক্রকে ঘুরাইয়া দিয়া হস্তযোগ রহিত করিলেও যেমন চক্রটী পূর্ব্ব বেগবশেই ঘুরিতে থাকে, পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার সকলও তেমনই পার্থিব দেহের সহিত মৃত্যুদ্বারা তাহাদের যোগ ছিন্ন হইলেও বহুকাল পূর্ব্ববৎই ক্রিয়াশীল থাকে। শিশুর নবদেহে সেই ক্রিয়ারই ফল হইতে থাকে।

জাগ্রদবস্থায় চতুষ্পার্শ্বিক বিষয় সকল দ্বারা আকৃষ্ট ও অধিকৃত হওয়ায়

শিশুতে পূর্ব্বসংস্কার সকলের কার্য্য তেমন পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু নিদ্রাবস্থায় যখন শিশু পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে পূর্ব্বসংস্কারের জগতে প্রবেশ করে তখনই সেই সমস্তের প্রভাব তাহার উপর বিশেষরূপে প্রখ্যাপিত হইতে থাকে, শিশুর স্বপ্নে তাহাই হাসি কান্নারূপে প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত সংস্কারের রাজ্যে প্রবেশ হইতে যেন 'সংবেশ' শব্দটী স্বপ্নের বাচক হইয়াছে।

সুখ দুঃখেরই সংমিশ্রণে সংসার। আমাদের হাসি কান্না ইহাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। সুতরাং আমাদের সংস্কার সকলের সহিত এই হাসি কান্না যে বিজড়িত হইয়া থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম বলিতে হইবে। শিশুতে এই স্বাভাবিক নিয়মের ক্রিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই "ওঁয়া ওঁয়া" করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং ক্রন্দন যে তাহার সহজাত তাহার আর প্রমাণ আবশ্যক করে না। দুঃখের ফলে ক্রন্দন ও সুখের ফলে হাসি ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। শিশু মাতৃ-জঠরে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসে বলিয়া প্রথমেই তাহাকে কাঁদিতে দেখা যায়। তাহার পরেও ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নায় তাহাকে কাঁদিতে হয়। তাহার নূতন সুকোমল দেহের পক্ষে বাহ্য শীতোষ্ণতা সহজে সহনীয় না হওয়াও তাহার ক্রন্দনের অন্যতম কারণ। এই প্রকার ক্রন্দনের ভাবই ইহাতে প্রথম প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রম বিকাশের দিক দিয়া দেখিলেও অনুরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। শিশু সংসারে একটী স্বতন্ত্র বিকাশ নহে; পিতা মাতার প্রকৃতিই শিশুতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং পিতৃমাতৃ প্রকৃতির একটী ছাঁচ শিশুতে জন্মের সময়ই প্রতিফলিত হয় বলিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের শাস্ত্রে বলে "সুতঃ পিতৃগুণং ধত্তে"—পুত্র পিতারই গুণ ধারণ করে। আমাদের 'আত্মজ আত্মা বৈজায়তে পুত্রঃ' প্রভৃতি শাস্ত্র কথাও ক্রম-বিকাশ মতের পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বেরই প্রমাণ দিয়া থাকে। সন্তানে পিতা মাতার প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়াই যদি নিয়ম হয় তবে হাসি কান্না যে শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হয় তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ সুখ দুঃখের মধ্য দিয়াই প্রকৃতির শিক্ষা হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সুখ দুঃখ বা ইহাদেরই প্রাথমিক পরিণামভুক্ত হাসি কান্নার মধ্য দিয়া যেমন সকলেরই শিক্ষা হয়, তেমনই হাসি কান্নার মধ্যেই শিশুরও প্রথম শিক্ষারম্ভ হয়। স্বপ্নে প্রকৃতির এই প্রাথমিক হাসি কান্না শিক্ষার আবৃত্তিই আমরা দেখিতে পাই।

হাসি কান্নাতেই যে শিশুর প্রকৃতি ও দেহ গঠন হয় হাসি কান্না এই উভয়াত্মক শিশু স্বপ্নের একটী প্রচলিত নামেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। সে শব্দটী "কবিকঙ্কণ চণ্ডিতে" 'দেহালা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যথা কালকেতুর বাল্য বর্ণনায়—

"দীর্ঘনিদ্রা যায় শিশু করয়ে দেহালা।" "দেহালা" শব্দটী দেখিলেই ইহার সহিত যে দেহ শব্দের যোগ আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের এতদঞ্চলে যে "দেহালা" শব্দেরই একার্থক একটী শব্দ প্রচলিত আছে, তাহার সহিত ইহার তুলনা করিলে 'দেহ' শব্দের সহিত উভয়েরই যোগ আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। সেই শব্দটী 'দেঅর।' এই 'দেঅর' আমরা 'দেহর' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করি। 'হর' উচ্চারণ যে কথিত ভাষায় অনেক সময়ই 'অর' ন্যায় হয় তাহার বহু দৃষ্টান্তই দেখিতে পাওয়া যায়। 'দেহর' শব্দটীকে 'দেঅর' শব্দের সংস্কৃত মূল বলিয়া ধরিলে ইহার সুন্দর অর্থ ই করা যাইতে পারে। 'দেহ' ও 'রা' এই দুইটী শব্দযোগে 'দেহর' শব্দ সাধিত হইলে, 'রা' ধাতুর গ্রহণার্থ হইতে 'দেহর' শব্দের অর্থ দেহ গ্রহণ বা গঠন করা হয়। 'দেহালা' শব্দও 'দেহ' ও 'লা' যোগে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে এবং 'লার' পূর্ব্ব 'আ' উপসর্গের যোগে 'দেহালা'ও হইতে পারে। 'লা' ধাতুর অর্থও রা ধাতুর ন্যায় 'গ্রহণ' বলিয়া 'দেহেলা' শব্দের অর্থও 'দেহর' শব্দের ন্যায়ই দেহ গ্রহণ বা গঠন করা হয়। 'র' ও 'ল' ব্যাকরণ মতে অভেদ বলিয়া 'রা' ও 'লা' ধাতু যে একার্থক হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 'দেহালা' ও 'দেঅর' শব্দ দুইটীর সঙ্গে 'করা' ধাতুর প্রয়োগ হইতে নূতন নির্ম্মাণের অর্থ পাওয়া যায়।

শিশু যে ভয় ও আব্দারের মর্ম্ম প্রথমেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইতেও শিশুর হাসি কান্নার প্রথম বিকাশের প্রমাণ হয়। কেহ ভয় প্রদর্শক ভ্রূকুটি বা শব্দ করিলেই শিশু ঠোঁট ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে উদ্যত হয়, আবার আব্দার করিলেই আস্য বিকাশ করিয়া হাস্য করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে ভয় আব্দারের মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে শিশুর যে হাসি কান্নার সংস্কার সঞ্চিত হয় শিশু স্বপ্নে তাহাই দেখিয়া থাকে। ইহাই 'দেহেলা' বা 'দেঅর'।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নীতি ও আচার।

পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছিলাম যে আধুনিক হিন্দুসমাজ যে নিজেকে অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ মনে করেন, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ; এবং সেই প্রমাণ আমাদের বর্ত্তমান সময়ের আচার ব্যবহারে প্রাপ্তব্য। ধর্ম্মের হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, যাহা প্রায়ই আমরা করিয়া থাকি, তাহার প্রমাণ চাহিলে অনেকে রামায়ণ বা মহাভারতের অথবা ইতিহাসের অন্যান্য আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। অথবা আমাদের শাস্ত্রে আদর্শ জীবনের যে চিত্র অঙ্কিত আছে তাহাই দেখাইয়া দেন। কিন্তু বিশিষ্ট চরিত্র বা শাস্ত্রের আদর্শ নিয়া বিচার করিলে সমগ্র জাতির ধর্ম্মবত্তার ঠিক ধারণা অনেক সময়ই হয় না। রাম যখন জন্মিয়াছিলেন তখন রামের মত আর ক'জন ভারতে ছিলেন? আর এই রঘুবংশেই রামের মত আর একটী চরিত্র পাওয়া যায় কি? এটা বোধ হয় সব সময়ে এবং সব দেশেই ঠিক, যে যাঁহারা ইতিহাসে প্রথিতনামা এবং পরবর্ত্তী বংশের নিকট ঐশীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হন, তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক জনসাধারণের চেয়ে অনেক উন্নত। অভ্রভেদী পর্ব্বতশৃঙ্গ নিম্নবর্ত্তী সমতল ভূমির উচ্চতার পরিমাপক নহে। সুতরাং ইতিহাসের দুই একটী বাছা বাছা রত্নদ্বারা সমস্ত জাতির নৈতিক উন্নতির ইয়ত্তা করা চলে না। অবশ্যই, যদি কোন জাতিতে মহৎব্যক্তির সংখ্যা যথেষ্টই থাকে, তবে সে জাতিকে উন্নতই মনে করিতে হইবে; কিন্তু আদর্শ চরিত্র মাত্রকেই যখন আমরা অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তখনই এ কথা প্রমাণিত যে তাঁহাদের মত চরিত্র আমরা খুব বেশী পাই নাই।

আদর্শ নিয়া বিচার করিতে গেলেও প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদর্শ ক'জনের জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যায়? বাইবেলের আদর্শ ক'জন খ্রীষ্টান কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন? আর একটী কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। যদিই বা ধরিয়া নেই যে যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক আমাদের দেশে খুব প্রচুর ছিল, যদিই বা ধরিয়া নেই যে আমাদের শাস্ত্রের আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে এক সময়ে আমাদের জাতি খুব উন্নত ছিল, এই মাত্র প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর কথা বলিতেছি, সে আমাদের নিজের, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের নয়। যদি বর্ত্তমানে আমরা বাস্তবিকই খুব ধার্ম্মিক হই, তবে আমাদের বর্ত্তমান আচার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ থাকা উচিত।

আমাদের ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ তীর্থব্রত। কিন্তু এই তীর্থে যে সমস্ত আচার এখনও প্রচলিত আছে এবং অনেক দিন পূর্ব্বেও ছিল বলিয়া মনে হয়, তাহাতে কি খুব নৈতিক উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়? এবং সে সমস্ত জায়গায় যাঁহারা রাজত্ব করেন এবং যাঁহাদিগকে অনেক সময় তীর্থযাত্রীরা পূজাও করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি খুব চরিত্রবান্? তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া কি প্রকারান্তরে আমরা নিজেদের হীনত্ব প্রতিপাদন করি না? তীর্থস্বামীদিগের পাপের বিচার প্রায়ই ইংরেজের আদালতে হয় না। তথাপি মোহন্তের মোকদ্দমা প্রভৃতির সংখ্যার দিকে একবার চাহিলে বুঝা যায়, তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ! যায়গায় যায়গায় যে সকল দেবদাসী প্রথা রহিয়াছে, তাহাতেই বা তীর্থের পবিত্রতা কতদূর প্রকটিত হয়? তীর্থ বিগ্রহের নিকট কুমারী সম্প্রদান প্রথা অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। অথচ এ সমস্ত আচার যে হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া নিতেছে, ইহা কি নৈতিক উৎকর্ষের পরিচায়ক?

হিন্দুসমাজে যত প্রকার ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হয়, বৈষ্ণবধর্ম্ম তার মধ্যে একটী প্রধান। এই বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত যে কতকগুলি আচার আছে—নাম নাই বা করিলাম, এ ত আর কাহারও অবিদিত নয়—তাহা দ্বারা কি খুব নৈতিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়? ধর্ম্মাচারের তথাকথিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিয়া বিচার করিতে বসি নাই; কাজে তান্ত্রিক ধর্ম্মটা যা দাঁড়াইয়াছিল, (এখনও ইহা একেবারে লোপ পায় নাই) তা হইতে কি প্রমাণিত হয়?

দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়াইয়া কোন লাভ নাই। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইবেন, আমাদের ধর্ম্মে এমন অনেক আচার আছে, যাতে নীতির উৎকর্ষ দূরে থাকুক, নীতির অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বোধ হয় এখনও অভাব হয় নাই; কিন্তু নিষ্ঠা আর নীতি একার্থদ্যোতক নহে। তিন বেলা যিনি সন্ধ্যা উপাসনা করেন, অন্য জাতির পৃষ্ঠ অন্ন যিনি ভোজন করেন না, এবং যিনি দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্—তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। কিন্তু নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেই কি মিথ্যা প্রতারণাকে ঘৃণা করেন? 'ঘুষ'—যাহা চুরির নামান্তর মাত্র—এখনও হিন্দসমাজে বিশেষতঃ সাবেকী ধরণের হিন্দু সমাজে, তত নিন্দিত নয়। আদালতে, আফিসে, রেলওয়েতে, প্রত্যহ যে ঘুষের অভিনয় চলিতেছে, জানি না তাতে কতটুকু নীতি আছে! অথচ এ সমস্ত অনৈতিক কাজ যাহারা করে, তাহারাই যদি খাওয়া দাওয়ায় একটু সাবধান হয়, তবে ধার্ম্মিক হিন্দু

বলিয়া গণ্য হইবে! বাস্তবিক, আমাদের ধর্ম্মে অনুষ্ঠানের উপর যতটুকু জোড় দেওয়া হয়, নীতির উপর ততটুকু হয় না।

অপরাধীর যাতে শাস্তি হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা, সমাজ হইতে পাপ দূর করিবার চেষ্টা করা, সমাজে শান্তি এবং সুবিচার রক্ষা করিবার চেষ্টা করা, একজনের উপর অত্যাচার ও অবিচার হইতে দেখিলে তাহাকে সাহায্য করা, এক কথায়, ইংরেজিতে য়্যাকে civic virtue বলিব, তার একটা কল্পনাও আমাদের সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পূজা, পালি, সবটাতেই একটা স্বার্থপরতা ভাব আসিয়া পড়িয়াছে; সবই যেন করি নিজের জন্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে, রত্নাকরের পিতা মাতা প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছিলেন—তাঁহারা রত্নাকরের পাপ পুণ্যের ভাগী নন। এটা শুধু রত্নাকরের পিতা মাতার কথা নয়, এটা আমাদের সমগ্র জাতির কথা। "আত্মৈব শত্রুরাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব চাত্মনঃ।" সমাজে পরস্পরের প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, সমাজের মধ্যে যে একটা সাধারণ জীবন আছে, এটা যেন আমরা এখনও বুঝি নাই। অনেকে হয়ত বলিবেন, আমাদের সমাজে কি কোন গুণ নাই? যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে ত গুণের কোন চিহ্ন নাই। উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে—গুণও আমাদের আছে। কিন্তু আমরা যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করি, এত সব গলদ থাকিতে তাহা ন্যায্য নহে। নিজেদের সম্বন্ধে একটা মিথ্যা ধারণা পোষণ করায় হানি আছে। নিজেরা খুব বড়, সর্ব্বদা এ বিশ্বাস মনে থাকিলে, দোষ সারিবার অবসর হয় না।

আমাদের আদর্শ আছে বেশ। কিন্তু এ আদর্শও খুঁজিয়া নিতে হইবে। আজকাল, সংস্কৃতে যা আছে, তাহাই শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ডামরতন্ত্র বা যোগিনীতন্ত্র, কামসূত্র বা কল্কিপুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া যদি সবকেই শাস্ত্র বলিতে হয়, তবে অবস্থা কিছু শোচনীয়ই বুঝিতে হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর বিশেষত্ব—নীতি ও আচারে। সেই নীতি ও আচার সম্বন্ধে যাহাতে হিন্দুজাতি জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ, বি. এল।

লাজের বাঁধ।

——o——

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীমতী অপরাজিতা—হরিদাস বাবুর নবশিক্ষিতা যুবতী কন্যা।
শ্রীযুক্ত প্রীতিকুসুম গুপ্ত—"বঙ্গ হিতৈষী" নামক সাপ্তাহিকের লেখক এবং বর্ত্তমান বঙ্গের উদীয়মান দরিদ্র সাহিত্যিক।

স্থান কলিকাতা।

দৃশ্য—অপরাজিতার খাস কামরা। সময়—অদ্য রজনী।

শ্রীমতী অপরাজিতার গায়ে পাতলা লেসযুক্ত ঝুলানো আস্তিনওয়ালা ব্লাউজ, পরিধানে জরি পেড়ে ঢাকাই সাড়ী। মাথার আলুলায়িত কেশ লাল রেসমি ফিতায় বাঁধা। চোখে সোণার চসমা। হাতে সাটীনের মলাটে সোণার জলে নাম লেখা—রবি বাবুর খণ্ড কাব্যগ্রন্থ। পায়ে ফুলদার ছোট চটি। কামরার ভিতরে অস্থির ভাবে পায়চারি করিতেছে।

অপরাজিতা—(স্বগতঃ) আমি যা ভাব্‌চি, বোধ করি, তাই ঠিক। কারুর সঙ্গে আগে একবার পরামর্শ করে নিলে বেশ হতো। কিন্তু সে কথা যে আর কারুর কাছে বলবার নয়! মনে হচ্চে আমি যেন নানা রংএর ফুল ফুটানো, জোছ্‌না মাখানো ছোট একখানা নতুনতর সবুজ পৃথিবীর মাঝে একলা ঘুরে বেড়াচ্চি!—নারী কি একলা এমন স্বপ্নের জগতে ঘুরে বেড়াতে পারে! তা আর ভাবনা করে কি হবে? যা কর্‌বার তাতো করেই ফেলেচি—যখন তার নামে চিঠি লিখে দিয়েচি, তখন কর্ত্তব্য এক রকম স্থির হয়ে গেছে। (টেবিলের উপরে সীসার পরির হাতের "বী" টাইমপিসটীর পানে তাকাইয়া) এই যে রাত সাড়ে আটটা হয়েচে। লোকটা যে এখনও ফিরে এল না! (দেয়ালের এক পাশে ঝুলানো, কোণে ফুলপাতা লেখা আয়না খানিতে মুখখানি একটু হাসি হাসি করিয়া দেখিয়া লইয়া এবং তোয়ালের কোণে মিল্ক অব রোজ মাখাইয়া ঘসিতে ঘসিতে সারা মুখ লাল করিয়া দিয়া) আচ্ছা, আমার চিঠি পেয়ে, সে নাজানি কত কি ভাবচে এখন! সে যেমন লাজুক, বাবা বাড়ী নেই, এই কথা পড়ে হয়ত সে না আসতেও পারে। (সহসা দারোয়ানের চিঠি হস্তে প্রবেশ—অপরাজিতার ত্রস্ত হস্তে তাহা গ্রহণ ও খুলিতে খুলিতে) ভগবান, ভগবান রক্ষা কর। (চিঠি পাঠ) "দশ মিনিটের মধ্যে আসচি কিছু মনে করবেন না। কাগজ

পত্র গুলো একটু গুছিয়ে রেখেই ছুটে আসবো এখন। কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো?" কি সুন্দর! কি সুন্দর হাতের লেখা, কে যেন মুক্তো সাজিয়ে রেখেচে! মুক্তাগুলি ফেটে ফেটে যেন স্নেহের কোমল গুঞ্জন আশঙ্কা জড়িত হয়ে কেঁপে কেঁদে উঠ্‌চে! ভগবান তোমায় সুখী করুণ! (চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া এবং পুনরায় খুলিয়া পড়িয়া) "অসুখ করেনি তো?"—করেচে বই কি! অসুখ তো আমি সাধ করেই বরণ করে নিয়েচি! এখন তারি চিকিৎসা চল্‌চে! তাই আমাকেই লাজের বাঁধ ভাঙ্গতে হবে! কিন্তু নারী হয়ে আপনাকে যেচে বিলিয়ে দেওয়া!— সে বড় কঠিন! তবু শুধু তুচ্ছ লাজের জন্যে দুটো জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? সে হতে দিচ্ছি না আমি! তেমন মেয়ে আমি নই!

জানি আমি সে আমায় দূরে থেকে গোপনে গোপনে ভালবাসে! কবি কুল যেমন বহু দূরে থেকে আকাশের তারা কে, বনের বিহঙ্গিনীকে ভালবাসে—তেমনি! কি স্নিগ্ধ কাতর চোখ দুটী তার! কি স্বপ্নময় চাহনি! জানি আমি, বড় লাজুক সে; জানি আমি, অভাবের তাড়নায় সদা সঙ্কুচিত হয়ে রয়েচে সে! তবু তারে আমি ভালবাসি! সে যে দৈন্যকে মা সরস্বতীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মনে করে চিত্তার নির্ম্মল আনন্দের মাঝে তাকে বরণ করে নিয়েচে! তাই তার দারিদ্র্যের এত অভিমান। তার কাছে আমার নত হতেই হবে! তাই আমি কতদিন জোরহাত করে বলেচি—ওগো দয়াময়, ওগো ভগবান, আমায় তুমি তার মত দীন দরিদ্র করে দিয়ে তার আনন্দের রাগিণীটী আমার হৃদয়ে বিস্তার করে দাও! তবে তো তার অন্তরের কথা আমার কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়বে!

যদি তারে কেউ বলতো, অভিমানের কাছে তোমার একি আত্মপ্রতারণা, যে আত্মপ্রতারণার নিকট প্রেমকে তুমি বিসর্জ্জন দিচ্ছ? তবে বুঝি তার অন্তরের বাণী এতদিন ব্যক্ত হয়ে পড়তো! কিন্তু আর নয়—প্রেম জগতে নারী রাজ রাণীর মতো পুরুষের হৃদয় লুণ্ঠন করে চিরকাল শুধু রাজস্ব অপহরণ করে নিচ্ছে। কিন্তু আমি আজ আমার প্রেম-দেবতার কাছে ভিখারিনীর বেশে উপস্থিত হয়ে তারে বলবো, ওগো বন্ধু! এই লও আমার যা কিছু দিবার, ভিখারিণীর দান গ্রহণ করে তারে ধন্য করে দাও! নারী জন্ম সার্থক হোক, সার্থক হোক। আর নারীর অভিমান সাজেনা!—

[সহসা অপরাজিতাকে চমকিত করিয়া দিয়া ঝির প্রবেশ]

ঝি। দিদি মনি, প্রীতিকুসুম বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন!

অপরাজিতা। (আরক্তিম-মুখে) উপরে নিয়ে এসো তাঁরে! (স্বগতঃ) হৃদয়, স্থির হও, অভিমান, চুপকর, রূপ, তুমি আমায় আজ লজ্জা দিও না। ভগবান্! নারীর হৃদয়ে বল দাও! আজ যেন প্রেমের মর্য্যাদা বজায় রাখতে পারি!

[প্রীতিকুসুম বাবুর প্রবেশ।]

অপ। "এই যে প্রীতিকুসুম বাবু! সার্ট-টা যে ভিজে গেছে দেখতে পাচ্চি!

প্রীতি। বাইরে গুঁড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্চে, ছাতাটা ভুলে ফেলে এসেচি!

অপ। দেরী দেখে আমি ভাবছিলাম আজ বুঝি আর আসা হলো না।

প্রীতি। (হাসিয়া) সেই রকমই অবস্থা, কিন্তু তবু আস্তে হলো! অপ। হেঁয়ালী ভেঙ্গে বলুন, আজকালকার লেখকদের কথার মানে বোঝাশক্ত! প্রীতি। এতক্ষণ আমার কলম চালানই উচিত ছিল। তা লেখাটা কোন-রকমে বই চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়েচি! চুলোয় যাক সে সব। আপনার কোনো অসুখ বিসুখ করে নি তো?

অপ। কেন, আমি মর্তে না বসলে কি আপনাকে আমায় ডেকে পাঠাতে নেই?

প্রীতি। তবু যা হোক! আপনার চিঠি পেয়ে আমার কত ভাবনা! রাজ্যের ভাবনা ভিড় করে এসে জুটেছিল আর কি। পরে মনে হলো, সেই নূতন বাড়ীর ভাড়া সম্বন্ধে আপনি বুঝি কোন পাকা খবর পেয়েছেন, তাই স্নেহ করে ডেকে পাঠিয়েছেন।

অপ। না, ঠিক তা নয় অবিশ্যি। তা যে বাড়ীটা এখন পেয়েচেন, সেটা তো নেহাৎ মন্দ নয়, দিব্যি দক্ষিণ খোলা বাড়ী!

প্রীতি। তার চাইতে এ পাড়ায় একটা বাড়ী পেলে ঢের সুবিধে!

অপ। (মৃদু হাসিয়া) আমি ভাবতুম, এ পাড়াটা আপনি আদবেই পছন্দ করেন না—

প্রীতি। আরে না না—! সেটা আপনার বুঝবার ভুল! "বঙ্গ হিতৈষীর" আপিসটা এখান থেকে খুব কাছাকাছি। ট্রাম খরচাটা বেঁচে যায়!

অপ। তা-বেশ, আপনাকে এদিকে আন্তে খুব চেষ্টা কচ্চি আমি; দেখা যাক্, এখন কদ্দুর দাঁড়ায়! সে কথা পরে হবে এখন। আগে বলুন দেখি, "কুহেলিকার" রচনটা চল্‌ছে কেমন? কটা পরিচ্ছেদ হলো?

প্রীতি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ এই কথা! তা একবার আমারো মনে হয়েছিল বটে!

অপ। দেখুন প্রীতিকুসুম বাবু! আপনার সঙ্গে আমি ছলনা কত্তে পারবোনা। ঠিক যে ঐ কথা টুকুর জন্যে আপনাকে আমি আজ ডেকে এনেচি তা নয়! তবে কি না, "কুহেলিকা"র প্লটখানি আমার কাছে ভারি সুন্দর লেগেচে। নায়িকার চরিত্রটী ফুট্‌চে ভারি খাসা! শেষ কবে না আমাদের খসড়া পড়ে শুনিয়েছিলেন?

প্রীতি। বাঃ ঐ- পরশু দিন সন্ধ্যা বেলা, মিসেস রায়দের টী পার্টীতে—কমলা নিজে যেচে এসে সরোজকুমারের কাছে আত্মনিবেদন কচ্চে—ঐ পর্য্যন্ত।

অপ। (তাড়াতাড়ি ব্যস্ত ভাবে) ও মনে পড়েছে, থামুন, থামুন আপনি!

প্রীতি (হাসিয়া) তা, এরি মধ্যে ভুলে গেলেন?

অপ। না ভুলিনি ঠিক্‌; আমি বলছিলাম কি—তার পর কদ্দুর হলো?

প্রীতি। আর কদ্দুর!—কে জানে!—(তাড়াতাড়ি-কথাটা ফিরাইয়া লইয়া) "কুহেলিকার" কথা বলচেন তো?—আর বেশী এগুতে পাচ্চি কৈ?

অপ। আবার মাথা ধরাটা বেড়ে ওঠেনি অবিশ্যি?

প্রীতি। না, তেমন কিছু নয়!

অপ! থাক তবে ও কথা, ওতে আর দরকার নেই!

প্রীতি। আজ আপনি কথা বার্ত্তা গুলি জড়িয়ে জড়িয়ে কেমন হেঁয়ালী পাকিয়ে তুলছেন। আপনার সঙ্গে তো আমি আজ কিছুতেই পেরে উঠচি না। এ শাস্ত্রে মেয়েদের সঙ্গে আমাদের পেরে ওঠা ভার।

অপ। তা কতকটা ঠিক বটে; তবে সব সময় ওটা আমাদের জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়—তার পর আর "কুহেলিকার" ক' পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে?

প্রীতি। এ ক'দিন তো কলম ছুঁতেই পারি নি। কাল রাত্রে একবার বসেছিলাম—সরোজকুমারের জালে পড়বার মত হয়েচে!

অপ। আমার চিঠি যখন পেলেন, তখন বুঝি "কুহেলিকা" নিয়েছিলেন?

প্রীতি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) না, "বঙ্গহিতৈষির" জন্যে—পূর্ব্ববঙ্গে পাটের চাষ—সম্বন্ধে একটা আর্টিকল ফাঁদছিলুম। এডিটার আজই চান সেটা।

অপ। আজ রাতেই শেষ করে দিতে হবে বুঝি?

প্রীতি। হাঁ—তাই বটে। এডিটার সন্ধ্যাবেলা আবার আর্জেণ্ট তাগিদ

পাঠিয়েছেন। আমি কথা দিয়ে বসে আছি। নৈলে খবরের কাগজের আপিসে চাকরি থাকে না!

অপ। তবে কাজের মাঝখান থেকে আপনাকে ডেকে এনেচি আমি—ভারি অন্যায় হয়েচে আমার!

প্রীতি। না—না, সে তো আপনার অনুগ্রহ! সাড়ে ন'টার পরে ঘরে ফিরে গিয়েও আর্টিকলটা শেষ করে দিতে পারবো। সাড়ে ন'টা বাজতে আর এক কোয়ার্টর বাকী। এখন যদি খুলে বলেন—কি জন্যে আমায়—

অপ। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ—কি বলচেন আপনি!

প্রীতি। কি জন্যে আমায় ডেকেছিলেন আপনি?

অপ। (মুখ ফিরাইয়া চঞ্চলভাবে ডান হাত দিয়া বাঁ হাতের সোণার ব্রেসলেট খুঁটিতে খুঁটীতে)—ওঃ তাইতো, সব ভুলে গেচি যে!—তবে কিনা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্চি না—

প্রীতি। কি—কি বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চেন না?

অপ। সে কথাটা আজ খুলে আপনাকে বলতে পারবো কি না!

প্রীতি। দুঃখিত হলুম—বড় ব্যথিত হলুম! আর কি আহাম্মক আমি! আপনার চিঠি পেয়ে আমি মনে করেছিলাম, কথাটা বুঝি বড্ডো জরুরী—আর সেটা এখনি আপনি আমায় বলতে ইচ্ছা করেছেন—

অপ। না—না, ঠিক ধরেচেন আপনি। আর হেঁয়ালীর ঘোর প্যাঁচ রেখে দরকার নেই—আসল কথাটা খুলেই বলচি তা হলে!—(এই বলিয়া নতশিরে সলজ্জমুখে প্রীতিকুসুম বাবুর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া)—কিন্তু সে কথাটা খুলে বলা বড় সোজা নয়।

প্রীতি। (স্পন্দিত বক্ষে) সোজা নয়, এমন কি কথা?

অপ। (ভয়ঙ্কর সলজ্জভাবে) আর কিছু নয়, প্রীতিকুসুম বাবু, আমরা সখের লেখিকা কিনা—নিজের লেখার কথা বলতে বড্ডো বেধে যায়! আমি একটা গল্প ঠাউরিয়েচি—বিষয়টা আপনাকে দিয়ে একটু মেজে ঘসে নিতে চাই। আসল কথা, আমি প্লটটা লিখে দোবো, বাকীটা লিখবেন আপনি। কাগজে বেরুবে কিন্তু—আমার নামে!

প্রীতি। (জোরকরা হাসি হাসিয়া) বাঃ ভারি মজার কথাত! দিব্যি হবে এখন! দিন্ প্লটটা আমায়; এখনি গিয়ে কলম ধরবো, থাকগে পড়ে পাটের চাষ! প্লটটা কি রকম এখনি একবার শুনতে পেলে হতো—

অপ। সেটা তেমন বেশী জটিল রকমের কিছু নয়, সোজা কথা, কিন্তু মুখে খুলে বলতে গেলে কথাটা বোধ করি ভারি খেলো শুনাবে—তার আর কি হবে! মোট কথা ঘটনাটী দুটী স্ত্রী পুরুষ নিয়ে।

প্রীতি। (জোরে হাসিয়া উঠিয়া) সত্যি?

অপ। (লজ্জিত হইয়া) তা আগেভাগেই যদি আপনি অমনধারা হেসে উড়িয়ে দেন তবে—

প্রীতি। (হাসি থামাইয়া) বিষয়টা গুরুতর নাকি—বিয়োগান্তক?

অপ। গল্পটার নাম হবে—"নারীর স্বীকারোক্তি!"

প্রীতি। (আবার হাসিয়া) ওঃ আজকালকার ধরণের এক পরিচ্ছেদের গল্প বুঝি? বলুন দেখি প্লটখানা!

অপ। আপনিই বলুন না!

প্রীতি। আমি! কি করে জানবো বলুন!

অপ। নিন্ তবে আমার খাঁটী কথা, আমার গল্পের কোন প্লট-ফ্লট নেই!

প্রীতি। প্লটফ্লট নেই—খালি প্রেমিক প্রেমিকা!

অপ। কতকটা সেই রকমই বটে! আমার আইডিয়াটা লিখে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো এখন, সেই ভালো!

প্রীতি। মুখে শুনে গেলেই ভাল হতো! ৯৷৷০ বাজতে আরো মিনিট দশেক বাকী আছে।

অপ। তার পর—

প্রীতি। তারপর "বঙ্গ হিতৈষীর" জন্য ঘুরে গিয়ে মগজে পাটের চাষ কত্তে হবে!

[সাড়ে নটার তোপ পড়ার শব্দ]

অপ। মেয়েদের আর একটু বেশী সাহস থাকা ভাল, কেমন নয় কি প্রীতিকুসুম বাবু?

প্রীতি। না আর একরত্তিও বেশী নয়!

অপ। আচ্ছা আপনি আমার এমন একটা নাকাল অবস্থা কল্পনা করুণ দেখি, যাতে আমার আরো খানিকটা সাহস থাকলে মানায় ভালো?

প্রীতি। যতটুকু দরকার, ততটুকু আপনার আছেই!

অপ। আরো—আরো একটু বেশী?

প্রীতি। না এই ঠিক পরিমান মতো হয়েছে!

অপ। না না, প্রীতিকুসুম বাবু, আপনার অনুমানটা ঠিক হয়নি, আর একটু বেশী সাহস থাকলে, আজ আমার গল্পের প্লটটা আপনাকে বলা হতো!

প্রীতি। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) তা হলে লিখেই আমায় দিবেন বিষয়টা; দেখি আমি কিছু করে তুলতে পারি কি না! সাড়ে ন'টা হয়ে গেছে, উঠি তবে এখন আমি? নৈলে কাল এডিটারের কাছে বেল্লিক বনে যাব!

অপ। নমস্কার তবে—

প্রীতি। (অপরাজিতার হাতখানি নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া) আবার, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

অপ। (গভীর ক্লান্তির সহিত প্রীতিকুসুমের হাত হইতে নিজের হাত ছিনাইয়া লইয়া এবং সেই সময় কৌশল করিয়া হাত হইতে সোণার ব্রেসলেটটী ঘরের মেঝেতে ঠুন করিয়া ফেলিয়া দিয়া) আমি কিছুদিনের জন্য পশ্চিম বেড়াতে যাচ্চি, বোধ করি কাশ্মীরের দিকে! কেমন অসুখ অসুখ বোধ হচ্চে!

প্রীতি। (ব্রেসলেটটী মেঝে হইতে তুলিয়া লইয়া) কাশ্মীরের দিকে! এতদূর! সেখানে কদ্দিন হবে?

অপ। তা তো ঠিক করি নি। (প্রীতিকুসুমের হস্তস্থিত ব্রেসলেটের পানে তাকাইয়া) তা দিন না, আপনি ব্রেসলেটটা আমার হাতে লাগিয়ে! ইস্প্রিং টা এর এম্‌নি শক্ত—আমি আটকাতে পারি না! (প্রীতিকুসুম বাবুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া) বোধ করি কাশ্মীরে আমার দু তিন মাস হবে!

প্রীতি। কম্পিত হস্তে অপরাজিতার হাতে ব্রেসলেট লাগাইতে লাগাইতে) দু তিন মাস!

অপ। (গাঢ়স্বরে) বোধ করি;—কাকা বাবু না ছাড়লে আরো দেরী হতে পারে!

প্রীতি। (ব্রেসলেট লাগাইতে লাগাইতে সহসা কম্পিত কণ্ঠে অধৈর্য্য-ভাবে) আরো দেরী! তা যাবে যাও—এ ভিখারীর কথা মনে রেখো—অপরাজিতা—অপরাজিতা— * * *

অপ। (সহসা হাত ছিনাইয়া লইয়া সরিয়া গিয়া) একি প্রীতিকুসুম বাবু!

প্রীতি। মাপ্ করো, অপরাজিতা—আমি তবে এখন চলে যাই?

অপ। (দুই হাত মেলিয়া দরজার পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া হাসি মুখে) যাবে কোথায় প্রীতি কুসুম বাবু!

প্রীতি। অপরাজিতা! আমি যে ভিখারী!

অপ। (হাসিয়া) তবে তুমি বুঝি আমায় স্নেহের চোখে দেখ না!

প্রীতি। ঈশ্বর জানেন, অপরাজিতা! এদ্দিন সাহস করে মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারিনি।

অপ। তবে এখন বল!

প্রীতি—আর কিছু নয়—তুমিই আমার হৃদয়ের রাণী! তুমিই আমার "কুহেলিকার" কমলা! আমিই তোমার সরোজকুমার, আমি তোমাকেই ভালবাসি। তুমিই আমার সাহিত্যের সাধনা।

অপ। তবে থাম, থাম প্রীতিকুসুম বাবু! এইখানে "কুহেলিকা" শেষ করে দাও—আজ কমলা নিজে যেচে এসে সরোজকুমারের পায়ে আত্মনিবেদন কচ্চে!—*

যবনিকা পতন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

ঐশ্বর্য্য।

হে ঐশ্বর্য্য, উচ্চচূড় পাষাণ-প্রাসাদে
বিশ্ব হ'তে আপনারে রাখিয়াছ দূরে;
উদ্দাম সমীর স্রোত বহেনা অবাধে,
মুক্ত রবিকর নাহি পশে তব পুরে।
বিচ্ছেদ তোমার মন্ত্র; গর্ব্বোন্নত শিরে
মানবে মানবে শুধু ঘোষিছ প্রভেদ;
স্বার্থের পূজারি তুমি, তোমার মন্দিরে
অশ্রুমুখী করুণার প্রবেশ নিষেধ।
প্রতিদিন নব নব বিলাস-ব্যসনে
মগ্ন করি' রাখ যারে—তৃপ্তি কোথা তা'র!
হৃদয় কেবলি জ্বলে বাসনা-দহনে,
শুষ্ক শূন্য মরুমাঝে কোথা সুধা-ধার!
ঘুচাতে না পার যদি চিত্তের দীনতা
কোথা তবে, হে ঐশ্বর্য্য, তব সার্থকতা!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

---

* মিসেস বারিপেইনের একটী নাটিকার ছায়া অবলম্বনে রচিত।

কবির সম্মান।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার যশঃ সৌরভে আজ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মনীষিগণ বাঙ্গালী কবিকে যেরূপ সম্মান করিয়াছেন, তাহার স্মৃতি বিশ্ব-মানব সাহিত্যে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ জরাজীর্ণ দেহে স্বাস্থ্য লাভের আশায় ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য কেহ রক্ষা করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষার স্বাভাবিক অতুলনীয় মাধুরী এবং শব্দ যোজনার অসামান্য নৈপুণ্য কিছুই ইংরেজী সংস্করণে বিদ্যমান নাই। রবীন্দ্রনাথের চারু তুলিকা স্পর্শে কবিতার সুকোমল দেহে যে কমনীয় সুষমা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, গীতাঞ্জলিতে তাহার অভাব বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই তীব্রভাবে অনুভব করিবেন। সুতরাং ইংরেজি পাঠক রবীন্দ্র নাথের গীতাঞ্জলির সরল গদ্যানুবাদ হইতে কেবল ছাঁকা ভাবটুকুরই আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন; কবিত্বের যথার্থ পবিচয় প্রাপ্ত হন নাই। তথাপি ইংরেজ সাহিত্যিকগণ গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং কবিকে হৃদয়ের প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।

ইংরেজী ভাষা জগতে অতুলনীয় সম্পদশালিনী। এত গ্রন্থ ও এত সুলেখক জগতের আর কোন দেশেই নাই। সেই ইংলণ্ডের জ্ঞানিগণ আজ এক বাক্যে বলিতেছেন, ‘গীতাঞ্জলি’ ইংরেজী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। সে দিন শিমলা শৈলে বড় লাট প্রাসাদে রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ (Rev. C. F. Andrews) রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—‘ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালীর সাহিত্য যেমন ইংলণ্ডে নবযুগ (Renaissance) প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীও সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য জাতির সম্মুখে ভাব-রাজ্যের এক অভিনব পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে।” আমাদের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে এসিয়ার রাজকবি (Poet Laureate of Asia) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই সকল প্রশংসা তোষামোদ প্রিয় স্তাবকের অত্যুক্তি নহে।
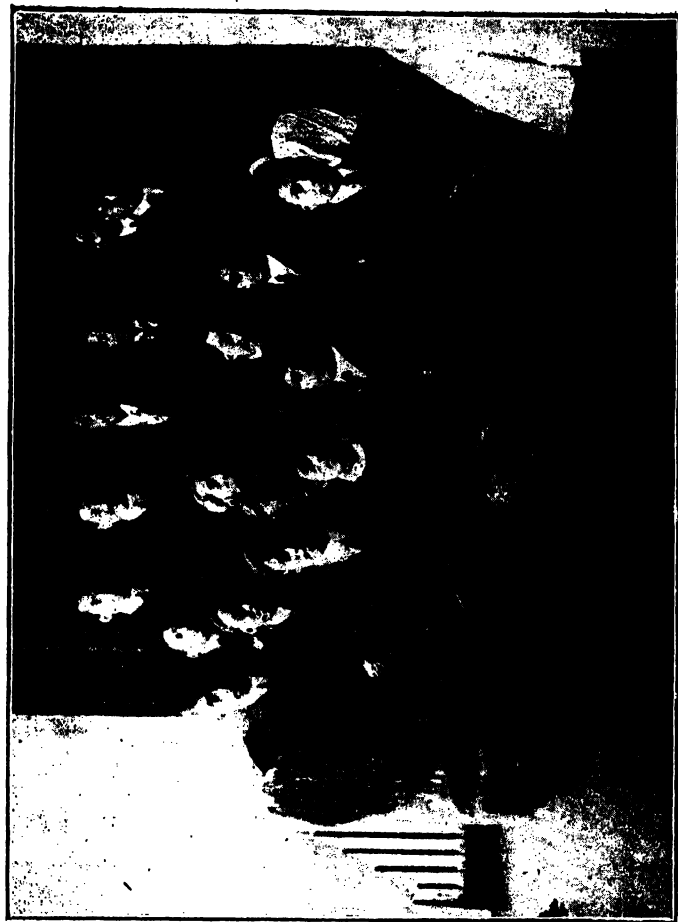
ভারতীয় ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত রবীন্দ্রনাথ—চিকাগো।

ইংরেজ যথার্থই গুণ গ্রাহী। ইংলণ্ডের জন কোলাহল পূর্ণ বিরাট কর্ম্ম ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে বাতাবর্ত্তের প্রশান্ত কেন্দ্রের ন্যায় একটী শান্তিপূর্ণ পবিত্র পীঠ স্থান আছে; ইহাই ইংলণ্ডের জ্ঞান নিকেতন। আভিজাত্যের গর্ব্ববল, ঐশ্বর্য্যের অভিমান বল, বিজাতি বিদ্বেষ বল, কোন প্রকার বৈষম্যই তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। সেই তপঃ ক্ষেত্রই ইংলণ্ডের গৌরবের সামগ্রী। রবীন্দ্র নাথ বাঙ্গালী হইলেও বাণীর এক নিষ্ঠ সাধক। তাঁহার বীণার পীযুষবর্ষী অপূর্ব্ব ঝঙ্কার শ্রবণে তন্ময় হইয়া ভাবুক সম্প্রদায় তাঁহাকে সমাদরে ইংলণ্ডের কবিকুঞ্জে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

একটী কথা এখানে ভাবিয়া দেখা উচিত। 'গীতাঞ্জলিতে' এমন কি মাদকতা আছে যে উহা পাঠ করিয়াই ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন! গীতাঞ্জলি বাঙ্গালী পাঠকগণও অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাতো এমন প্রশংসা করেন নাই। গীতাঞ্জলি ইংরেজ পাঠকের হৃদয়ে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিয়াছে। ইহার প্রতি অক্ষরে যে কি মন্ত্রশক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। রবীন্দ্রনাথের বীণার অশ্রুতপূর্ব্বধ্বনি ইংরেজদিগের শ্রবণ পথে প্রবেশ করিয়া মরমে অমৃত ধারা বর্ষণ করিয়াছে। কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসে ইংরেজ সুধী সমাজ যেন বিভোর হইয়াছেন। আমরা এই নিগূঢ় ব্যাপারের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটী উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যে সকল কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, তাহাতে তাঁহার শৈশব ও যৌবনের স্বপ্নময়ী স্মৃতি সুললিত ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। সেই সময়ের কাব্য,—শৈশব সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, সন্ধ্যা সঙ্গীত, কড়ি ও কোমল প্রভৃতিতে কবির আত্মপ্রীতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনের দ্বিতীয় স্তরে তদীয় অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতি বাৎসল্য পরিস্ফুট হইয়াছে। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ সাধনার উচ্চতম গ্রামে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার যে আত্মপ্রেম স্বজাতি প্রেমে পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা এখন বিশ্বমানব-প্রেমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কবি আর দেশকালে আবদ্ধ নহেন। এখন বিপুলা ধরণী তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র, সমগ্র মানব জাতি তাঁহার শ্রোতা!

রবীন্দ্রনাথ এখন ভারতীয় আধ্যাত্মতত্ত্বের সার উপনিষদ নিহিত মহা-সত্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পত্নী কন্যা ও পুত্রের মহাশ্মশানে কঠোর

সাধনা করিয়া তিনি প্রাচীন আর্য্যঋষি আবিষ্কৃত অক্ষয় অমৃত-খনির সন্ধান লাভ করিয়াছেন। মৃত্যু তাঁহাকে পূর্ণতার আভাস প্রদান করিয়াছে, অরুন্তুদ জ্বালাময় বিচ্ছেদের বক্ষে তিনি মিলনের মধুরতার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, শোকের ভিতরে তিনি সান্ত্বনার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। 'গীতাঞ্জলির' অক্ষরে অক্ষরে সেই অমৃতের উৎস, কঠোর সংযমের চিত্র, অপার্থিব আনন্দের মাদকতা। গীতাঞ্জলির শুচিশুদ্ধ নিষ্কাম নির্লিপ্তভাব—সাধনালব্ধ অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ আকণ্ঠবিলাস নিমগ্ন পাশ্চাত্য ধনকুবের-দিগের রাজ প্রাসাদে নাই। এই পরমা তৃপ্তি ও চিদানন্দ দারিদ্র্য-ব্রতা-বলম্বী ভোগ-বিমুখ ভারতবাসীর পর্ণ কুটীরে বিরাজিত। এই জন্যই গীতাঞ্জলির অভিনব ভাবে বিভোর হইয়া কোন কোন চিন্তাশীল ইংরেজ পাঠক টমাস কেম্পিসের 'Imitation of Christ.' এর সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন।

আর্য্য সভ্যতার চরম লক্ষ্য বা আদর্শ ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতি; নির্ব্বাণ মুক্তিলাভই ছিল জীবনের পূর্ণ পরিণতি। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ ঐহিক সুখ ও ঐহিক অমরতা। প্রাচ্য সভ্যতার গতি—ত্যাগের পথে, পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি—ভোগের পথে। এই জন্য প্রাচ্য জাতি জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত, আর পাশ্চাত্য জাতিরা পৃথিবীকে করতলগত করিয়াছে। জড় বাদিতাই (meterealism) বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ; ভোগ বিলাসই সাধনার সার, আকাঙ্ক্ষার একমাত্র সামগ্রী। পাশ্চাত্য দেশের নরনারীগণ আপাতঃ মধুর সুখের পশ্চাতে ছুটিতেছে; বাসনার অনলে অবিশ্রান্ত ইন্দন প্রদান করিয়া তৃপ্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহা বিড়ম্বনা মাত্র। উৎকট উত্তেজনার ফলে গভীর অবসাদ অনিবার্য্য। সম্প্রতি পাশ্চাত্য সমাজে প্রতিক্রিয়ার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতেছে। ভোগ বিলাস বিষে জর্জ্জরিত হইয়া শান্তিলাভের আশায় কোন কোন সুসভ্য দেশের নরনারীগণ ভারতীয় নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিতেছেন; তৃষ্ণাতুর আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্য উপনিষদে সার সত্যের অনুসন্ধান করিতেছেন। সুতরাং গীতাঞ্জলি তাঁহাদিগের নিকট অভিনব চিন্তার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ত্যাগ, নির্লিপ্ততা, সংযম ও পূর্ণতা যে গীতাঞ্জলির উপাদান তাহা জড়বিজ্ঞানের বহির্ভূত তপস্যালব্ধ সম্পদ।

বাঙ্গালার মেয়েলী ব্রত।

বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে রমণীগণ মধ্যে এক সময়ে ব্রতাদির বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। বিবিধ ব্রতের সংখ্যা বাহুল্য দৃষ্টে বোধ হয়, যেন তাঁহাদের জীবন কতকগুলি ব্রতেরই সমষ্টি ছিল। আমাদের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ এই সকল ব্রতানুষ্ঠানকে এখন কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও এক সময়ে তৎসমূহ বঙ্গ-ললনাগণের ধর্ম্ম জীবন গঠনে বিশেষ সহায়তা করিত, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মজীবনই বলুন আর কর্ম্ম জীবনই বলুন, প্রত্যেকেরই মূলে একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। জীবনের পক্ষে সংযম একটা অত্যাবশ্যক গুণ। এই সমস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় পুরনারীগণের যে সংযম শিক্ষা হইত, তাহা সম্মোহিনী পাশ্চাত্য সভ্যতার নিটক প্রত্যাশা করাই দুরাশা মাত্র। বঙ্গ বালিকারা আশৈশব এইরূপ সংযম শিক্ষা পাইত বলিয়াই উত্তর কালে তাহারা বাঙ্গালীর গৃহ ও সমাজে সুখ শান্তির আধারভূতা হইত। বস্তুতঃ তৎকালে অধিকাংশ বাঙ্গালীর গৃহ এক একটী শান্তি নিকেতন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অধুনা যে যে গৃহে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে উহার বাহ্য শোভা যতই বৰ্দ্ধিত হউক না কেন, আমরা জানি, তদ্দ্বারা নানাকারণে তাহার অভ্যন্তর-ভাগ আগ্নেয় গিরির ন্যায় নিরন্তর সন্তাপময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্ব্বাংশে আমাদের গ্রহণীয় নহে।

কতকাল হইতে এই সকল ব্রতাদি এদেশীয় মহিলাকুলের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, তাহার নির্দ্ধারণ সহজ সাধ্য নহে। তবে একথা ঠিক যে, সেই গুলি অতি প্রাচীন কালেই সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাতে বদ্ধ মূল হইয়া গিয়াছিল।

কাল চক্রের কুটিল আবর্ত্তনে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের অনেক আচার ব্যবহার এখন সভ্যতা বিরুদ্ধ বলিয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের মাতৃ জাতীয়াদের মধ্যে অনেকে শিক্ষার নবীনালোক প্রাপ্ত হইয়া রমণী জাতির বিধি নির্দ্দিষ্ট অবশ্য কর্ত্তব্য রান্ধনাদি পরিহার পূর্ব্বক এখন উল্ মোজা প্রভৃতির নির্ম্মাণ কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। গৃহস্থালী ও সন্তান পালনের ভার অনেক স্থলে দাসী ও ধাত্রীগণের স্কন্ধের উপর আসিয়া

পড়িয়াছে। এখন সন্তান-প্রসবের ভারটা কোনরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই একটা মস্ত লেঠার হাত ছাড়ান যায় বটে! নারী জাতীর এই "নবজাগরণের" দিনে শীঘ্র এরূপ একটা Coup Detalএর প্রত্যাশা কিছু বিচিত্র কথা বোধ হয় না!

দেশের এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে এই সকল ব্রতাদির অনুষ্ঠান যে খুব বিরল হইয়া আসিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যে কত বারব্রত যে চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতল জলধি তলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, কে তাহার খোঁজ রাখিয়াছে? বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এখনো যে সকল ব্রত নির্ব্বাণোন্মুখ অবস্থায় জীবিত রহিয়াছে, অথবা যে সকল ব্রত অল্প কাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, তাহাদের বিবরণ সংগৃহীত হইলে, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ের স্থান পূর্ণ হইতে পারে। মানব হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের ক্রমবিকাশ বুঝিতে হইলে এই সকল ব্রতের ইতিহাস রক্ষা করা একান্ত দরকার। তৎপ্রতি বাঙ্গালার লেখকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আমরা চট্টগ্রামে বর্ত্তমানে ও একসময়ে প্রচালিত ব্রতাদির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। বলিয়া রাখা আবশ্যক, এক ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে অপর ধর্ম্মাবলম্বীর কোন কথা বা ভাবের যথাযথ ও অভ্রান্ত বিবরণ-প্রকটন বা চিত্রাঙ্কন বিশেষ শক্তি-সামর্থ্যের কাজ। বর্ত্তমানক্ষেত্রে এ অকিঞ্চন ক্ষুদ্র মতি লেখক সেই সব গুণপনার দাবিকরণে একান্ত অক্ষম। কোন বিষয়ে অনধিকারীর পক্ষে পদে পদে প্রমাদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এই কথাটুকু মনে করিয়া পাঠকগণ আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের ক্রটী সকল মার্জ্জনা করিলে একান্ত অনুগৃহীত হইব। অন্যকে পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকিলে আমি কখনই এরূপ অনধিকার চর্চ্চায় প্রলুব্ধ হইতাম না।

চট্টগ্রামে নিম্নলিখিত ব্রতসমূহের অস্তিত্ব সংবাদ জানা যায়ঃ—

১। অন্ধেশ্বরী ব্রত। ২। ধান্য পূর্ণিমা। ৩। আচম্বিত পীর। ৪। সত্য পীর। ৫। মাণিকপীর। ৬। বুড়াবুড়ী। ৭। জয়লা কুমারী। ৮। সীতলা দেবী। ৯। জামাই ষষ্ঠী। ১০। সুবচনী। ১১। মঙ্গল চণ্ডী। ১২। ডলন (দলন) পীর। ১৩। সঙ্কট চণ্ডী। ১৪। ঈর্ষাওয়ালী। ১৫। সূর্য্য ব্রত। ১৬। জয় মঙ্গল চণ্ডী। ১৭। অশ্বিনী কুমার। ১৮। বেলভাতা। ১৯। নিকট মঙ্গল চণ্ডী। ২০। মাল্যাপীর। ২১। খোয়াজের ডিঙ্গা ভাসান। ২২। কাত্যায়নী।

২৩। মগধেশ্বরী। ২৪। মগধেশ্বরী সেবা ২৫। লক্ষ্মী পূর্ণিমা। ২৬। কার্ত্তিকেয়। ২৭। ভাই ফোটা। ২৮। অনন্ত চতুর্দ্দশী। ২৯। ললিতা সপ্তমী। ৩০। তাল নবমী।

উপরে যে সকল ব্রতের নাম করা হইল, তদ্ভিন্ন আর কোন ব্রত এখানে প্রচলিত ছিল বা আছে কি না, আজও জানিতে পারি নাই। এই সমস্ত ব্রতের সবগুলিই এক সময়ে চট্টগ্রামে প্রচলিত ছিল। অধুনা অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর কিছুকাল পরে অবশিষ্ট গুলিরও যে এই দশা ঘটিবে, ইহা একরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। যুগে যুগে এই সমস্ত অনুষ্ঠান লোকচিত্তে যে প্রভাব-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, কালের সঙ্গে মিশিয়া গেলেও তাহা একান্ত অনুশীলন-যোগ্য, সন্দেহ নাই। আমরা বারান্তরে প্রাগুক্ত ব্রত সমূহের বিবরণ প্রদানে মনোযোগী হইব।

আবদুল করিম।

পরপারে

জীবনের পর পা'রে
জানিনা কেমন,
কেমন তাহার মাটি,
কেমন পবন।
সেখানে কি এই মত
আনন্দে ধায়,
রবি শশী গ্রহ তারা
আকাশের গায়!
সেখানে কি চিরানন্দ
নাই কি ক্রন্দন?
যায় না কি কারো চোরে
হৃদয় রতন?

নাই কি তথায় তবে
বিষাদের গীতি?
সেখানে কি বহে নিত্য
সুমধুর প্রীতি?
সেখানে কেন বা গেলে
ভুলে যায় সবে,
এখানের চিনা জানা
আপনা বান্ধবে?
তাই হবে; নৈল কেন
যে যায় সেখানে,
আসেনা, চাহেনা ফিরে
আকুল আহ্বানে?

শ্রীহৈমবতী দেবী

সপ্ত চক্ষুঃ।

চক্ষুঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান। ইহার প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু চক্ষুঃ কত প্রকার তাহা বোধ হয় অনেকেই হিসাব করিয়া দেখেন না। আজ আমরা কয়েক প্রকার চক্ষুর কথা বলিব।

অদ্ভুত চক্ষুঃ, ঔদ্ভিৎ চক্ষুঃ, চর্ম্মচক্ষুঃ, যোগ চক্ষুঃ, দিব্য-চক্ষুঃ, জ্ঞানচক্ষুঃ, মুদ্রাচক্ষুঃ, এই সপ্ত প্রকার চক্ষুঃ জগতে দেদীপ্যমান।

অদ্ভুত চক্ষুঃ জগদীশ্বরের। শ্রুতি বলেন "পশ্যত্যচক্ষুঃ", ভগবানের চক্ষু নাই অথচ তিনি সমস্ত দেখেন। কারণ ভিন্ন কার্য্যের উপলব্ধি হয় না, এখানে কারণ নাই কার্য্য আছে, মাথা নাই মাথা ব্যথার ন্যায় চক্ষু নাই দর্শন ক্রিয়া আছে, সে দর্শন ক্রিয়াও যেমন তেমন নহে, ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী, অন্তরে বাহিরে সমস্তই তিনি দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা হইতে আশ্চর্য্য কোথাও কিছু নাই, সুতরাং ভগবানের চক্ষুঃ অদ্ভুত চক্ষুঃ।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন "বহুনেত্রং ক্রিমিহরং" বহুনেত্র (আনারস) ক্রিমি নষ্ট করে। আনারসের দেহে যে চক্ষুর ন্যায় দাগ আছে, উহাই তাহার চক্ষুঃ, তাই আনারস বহুনেত্র নামে অভিহিত। কেবল আনারসের কেন, মান-কচুর চক্ষুঃ আছে, বাঁশেরও চক্ষুঃ আছে। কেহ কেহ বলেন নারিকেলা-স্থিরও চক্ষুঃ আছে। এই সকল চক্ষুঃ আমাদের চক্ষুতে দৃষ্টিহীন, কিন্তু বিজ্ঞানের চক্ষুতে দৃষ্টিহীন কি না তাহা এখনও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জগদীশ চন্দ্রের গবেষণায় জড়জগতেরও আত্মা আছে, ইচ্ছা আছে, সুখদুঃখ আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিছু দিন পরে আবার কোন বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা বলে আনারস প্রভৃতির চক্ষুরও দৃষ্টিশক্তি আছে বলিয়া প্রমাণিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই সকল চক্ষুর নাম ঔদ্ভিৎ চক্ষুঃ।

চর্ম্মচক্ষুঃ—কিঞ্চুলুকাদি কতকগুলি প্রাণী ভিন্ন সমস্ত প্রাণীরই চক্ষু আছে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত, সুতরাং প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন।

যোগ চক্ষুঃ যোগী ঋষিদিগের। তাহারা ধ্যানস্থ হইলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই অবলোকন করিয়া থাকেন, ধ্যান ভঙ্গ হইলে তাঁহাদের সে দৃষ্টি থাকেনা। ভারত যুদ্ধের সময় ব্যাস দেবের কৃপায় সঞ্জয়, দিব্যচক্ষুঃলাভ করিয়া ছিলেন। সেই দিব্যচক্ষুর বলে তিনি বৈঠক খানায় বসিয়া থাকিয়াই

বহু দূরস্থ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটনা অবলোকন করিতে পারিতেন, এবং দর্শনান্তে সমস্ত ঘটনা অন্ধরাজকে নিবেদন করিতেন।

অনেকে সঞ্জয়ের এই দিব্য চক্ষুকে, একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্রবিশেষ বলিয়া মনে করেন। এই যন্ত্রের বলেই সঞ্জয় বহুদূরের ঘটনা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। চসমার নাম যখন উপচক্ষুঃ তখন দূরবীক্ষণের নাম দিব্যচক্ষুঃ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যে বিষয় নহে।

বিশেষতঃ ভারত যুদ্ধের সময় আমাদের দেশে কাচের ব্যবহার ছিল। ময়দানবের সভামণ্ডব নির্ম্মাণ প্রসঙ্গেই তাহা জানা যায়। বহু প্রাচীন গ্রন্থে সূর্য্যকান্ত মণির নাম আছে, উহাও কাচ বিশেষ মাত্র, দূরবীক্ষণও কাচই, সুতরাং দিব্যচক্ষুঃ দূরদৃষ্টিসাধক কাচযন্ত্র হওয়া কিছুই অসম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে আমরা আকাশস্থিত রাশি নক্ষত্রগুলির নামের ও আকারের দিকে দৃষ্টি করিলেও বুঝিতে পারি যে বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে দূরবীক্ষণের ব্যবহার ছিল। কেবল দূরবীক্ষণ কেন, অনুবীক্ষণও প্রাচীনকালে ছিল।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন—"অপাদাবৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষাৎ কেচিদদর্শনাঃ।" রক্তের মধ্যেও ক্রিমি আছে, তাহারা কুষ্ঠাদি রোগের উৎপাদক, উহাদের মধ্যে কতকগুলি ক্রিমির পা নাই, উহারা তাম্রবর্ণ ও বর্ত্তুল আকার; উহারা এত সূক্ষ্ম যে চক্ষুদ্বারা দর্শন করা যায় না।

চক্ষুতে দেখা যায় না—তবে পা নাই, বর্ত্তুলাকার ও তাম্রবর্ণ এ তত্ত্ব শাস্ত্রকারগণ জানিলেন কিরূপে? অবশ্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, চক্ষুর অগোচর হইলেও অনুবীক্ষণের সাহায্যেই তাঁহারা ঐ সকল ক্রিমির আকৃতি ও বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

অতএব—সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুঃ যে একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র হইলেও হইতে পারে, এ কথা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কথা নহে।

আর এক প্রকার দিব্যচক্ষুঃ একটু পৃথক প্রণালীর। "দদামি দিব্যং-চক্ষুস্তে" বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই দিব্যচক্ষুঃ দান করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সেই দিব্যচক্ষুর বলে মানবাকৃতি পরিমিত বাসুদেবের অসীম অপরিমিত অনন্ত মস্তক কর পদ বিশিষ্ট ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন। ভগবদ্দত্ত এই দিব্যচক্ষু—দৈবশক্তি বিশেষ। উহা দেবতার অনুকম্পা ভিন্ন লাভ করা যায় না। অনেকে বলেন, আজ কাল পত্রিকা সম্পাদকগণও দিব্যচক্ষুলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সেই দিব্যচক্ষুর বলে সমস্ত ভাষা,

সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকেন। তাই যে ভাষায় লিখিত যে বিষয়ের গ্রন্থই তাঁহাদের করগত হউক না, দিব্যচক্ষুর বলে কিছুই তাঁহাদের অবিদিত থাকে না। একথা এখনও অকাট্য প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, তবে অনুমিতি উপমিতিদ্বারা কেহ কেহ জিহ্বা কর্ণের কণ্ডুক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন বটে।

হিন্দুদিগের অনেক দেবদেবীর জ্ঞানচক্ষুঃ আছে। ভ্রুযুগলের উপরিভাগ মস্তিস্কাধার জ্ঞানোৎপত্তির স্থান। সেই স্থানে অর্থাৎ ললাটদেশে যে চক্ষুঃ তাহা জ্ঞানচক্ষুঃ নামে অভিহিত। মহাযোগী মহেশ্বরের ললাটে এই জ্ঞান-চক্ষু আছে। আদ্যাশক্তি মহেশ্বরীর ললাটেও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে। বিষ্ণুর জ্ঞান চক্ষু নাই।

লোকে সাধারণ কথায় বলে, পরিচিত ব্রাহ্মণের ফোটার দরকার হয় না। তাই বোধ হয় সর্ব্ববেদে পরিচিত, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি জ্ঞানচক্ষুঃ ধারণের প্রয়োজন মনে করেন নাই ; তাই তাঁহার তৃতীয় চক্ষু শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয় নাই।

সপ্তম চক্ষুঃ আমাদের মুদ্রাচক্ষুঃ। এই মুদ্রাচক্ষুর প্রভাবে কত লোক যে জ্ঞানী পণ্ডিত, সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইতেছে তাহার নির্ণয় করা সাধ্যাতীত।

কথিত আছে এবং প্রত্যক্ষও দেখা যায় যাঁহারা সরস্বতীর পুত্র, তাঁহাদের গৃহে লক্ষ্মীর পদ চিহ্ন প্রায় পড়ে না। আবার লক্ষ্মী পুত্রদিগের গৃহেও সরস্বতীর পদ চিহ্ন প্রায় তথৈবচ। সুতরাং যাঁহারা সুকবি সুলেখক ও সুপণ্ডিত, তাঁহারা প্রায়ই অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত। এই অবস্থায় সাহিত্য যশোলিপ্সু ধনীগণ অর্থ সাহায্যে উহাদের দ্বারা নানা বিষয়ের পুস্তক লেখাইয়া নিজের নামে প্রচার করিয়া থাকেন। তখন তিনি চক্ষু না থাকিলেও তোফা চক্ষুষ্মান বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জ্ঞান গরিমা কবিত্ব শক্তি প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পরে। ইহারই নাম মুদ্রা চক্ষুঃ। মুদ্রা চক্ষু সর্ব্বত্র থাকিলেও রাজধানীতেই ইহার প্রসার কিছু অধিক বলিয়া মনে করি!

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

মন্দির প্রাচীরের যেমন নাম আছে, রথগুলিরও তেম্নি পৃথক পৃথক নাম আছে। বলভদ্রদেব সর্ব্বাগ্রে যে রথে আরোহণ করেন, তাহার নাম তালধ্বজ। সুভদ্রা দেবীর রথের নাম পদ্মধ্বজ। তারপর জগন্নাথ দেবের প্রধান রথ, ইহার নামটি বেশ, নন্দিঘোষ। নন্দঘোষ নন্দনের নন্দিঘোষে চড়িয়াই অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে যুযুৎসু হুঙ্কারী কুরুবীরগণ ও অক্ষৌহিণী সৈন্য, পশ্চাতে পাণ্ডব চমূ, মাথার উপর দ্বিপ্রহরের সূর্য্য। এমত অবস্থায় গুড়াকেশ ও হৃষীকেশ স্থান ও কাল ভুলিয়া মাঝখানে হঠাৎ নন্দিঘোষের অশ্বের বলগা টানিয়া লইয়া পরম সূক্ষ্ম পরব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় বিভোর হইয়াছিলেন! বোধ হয় এই অবাক কাণ্ড দেখিয়া শত্রু সৈন্য হা করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল ও তাহাদের হাতের অস্ত্র খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল!

চন্দন সরোবর—পুরী।

মূল মন্দির বা দেউলের বামদিকে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্বতন্ত্র মন্দির। পাণ্ডারা বলেন, বলভদ্রদেবের ভাদ্রবধূ (ভ্রাতৃ-বধূ) বলিয়া লক্ষ্মীদেবী মূল মন্দিরে যাইতে পারেন না। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব ইঁহাকে ফেলিয়া ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া গুণ্ডিচার বাগান বাড়ীতে বেড়াইতে যান। ইহাতে

শ্রীশ্রীমতী অতি দুঃখিতা। সপ্ত দিবানিশি তিনি বিষম বিরহে কাল যাপন করেন। বারংবার "চাহনিমণ্ডপে" আনাগোনা করিয়া কেশবের আগমন প্রতীক্ষায় গুণ্ডিচা বাড়ীর পথপানে চাহিয়া থাকেন। এই চাহনিমণ্ডপ স্নানযাত্রার মঞ্চের দক্ষিণে একটী পতনোন্মুখ অশ্বথ বৃক্ষের নিকট, দেবালয়ের নিম্নে অরুণ স্তম্ভের কাছে দাঁড়াইলে ডানদিকে দেখা যায়। ঐরূপ বামে পোষ্টআফিসের ছাদেরদিকে "ভেটমণ্ডপ"। ভেট শব্দের প্রকৃত অর্থও চাহনি বা নজর। নজর হইতে চলিত অর্থ নজরানা বা উপঢৌকন। এইরূপে সপ্তাহকাল বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে পুনর্যাত্রার দিবস লক্ষ্মীদেবী চাহনীমণ্ডপ হইতে "নন্দিঘোষ" বিহারী জগন্নাথদেবের প্রত্যাগমন দেখিতে পান। দেখিবামাত্র দুর্জ্জয়মান উপস্থিত হইবারই কথা। তখন শ্রীমতী সেবাদাসীদিগকে আদেশ দেন—ফটক বন্ধ কর, ওঁকে ভিতরে ঢুকিতে দিও না। অমনি দেবদাসীর দল সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া দেয়। তখন জগন্নাথ দেবের পক্ষ হইতে পাণ্ডাগণ সিংহদ্বারের বাহির হইতে বহু অনুনয় বিনয় জ্ঞাপন করিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বলেন। ভিতর হইতে শ্রীমতীর পক্ষে দেবদাসীবৃন্দ যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া থাকে। এই বাক্যাবলীর নাম "পহস্তি বচনিকা।" শ্রীমতীর পক্ষেঃ—হে নিপট কপট! আবার ফিরে এলে কেন; প্রাণের ভগিনীধনকে সঙ্গে করে যেখানে গেছিলে সেখানেই থাকগে—ইত্যাদি। তখন জগন্নাথ বলেন—ভদ্রে! আর গালাগালি দিওনা, জানই তো দাদা সাথে ছিলেন, তিনি আমার সঙ্গ ছাড়েন না, তোমাকে নিয়ে যাই কি করে। আমায় এবার মাপ কর, দরজা খুলে দাও। প্রিয়ে আমি তোমা বই আর কাকেও জানিনে। শ্রীমতীর উত্তরঃ—তোমার মিছে আদরে কাজ নেই, তুমি আমায় মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা দিয়াছ, আমার এ কয় দিন রাত্রে ঘুম হয় নাই। আমি তোমার চোখের বালি, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলিয়া যাও। জগন্নাথঃ—প্রিয়তমে! প্রাণেশ্বরী! আমি বৃষ্টির জলে ভিজিতেছি, তোমার কি একটুকুও দয়া নাই! তোমার জন্যে আমি রথ বোঝাই করিয়া কতরকম গহনাপত্র ও শাড়ী আনিয়াছি, তা এখন কাকে দিব! ভাবিয়াছিলাম আজ বাড়ী গিয়া কত আদর পাইব, হায় বহুমূল্য শাড়ীগুলি বৃষ্টির জলে বুঝি ভিজিয়া গেল!

গহনা ও শাড়ী! ইহার উপর আর কথা কি। মুখ প্রফুল্ল হইল। অভিমান ছুটিয়া গেল—সূর্য্যোদয়ে তমো. যথা। শ্রীমতী ভেটমণ্ডপে গিয়া দাঁড়াইলেন, চার চোখে ও মনে মনে পুনর্ম্মিলন হইল, চোখে চোখে কথা হইল। তখন শ্রীমতীর আদেশে দেবদাসীগণ সিংহদ্বার খুলিয়া দিল।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

মাননীয়	মাননীয়	বঙ্গেশ্বর
রাজাবাহাদুর।	মিঃ গজনভী।	লর্ড কারমাইকেল।

সৌরভ

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩২০ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

তন্ত্র সাহিত্যে শঙ্করাচার্য্য ও অদ্বৈত বাদ।

পঞ্চমকারোপাসনা বিধায়ক তন্ত্র-সাহিত্যে ঘোর অদ্বৈতবাদী বৈদিকমত প্রচারক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়, এই কথা শুনিলে হয়ত অনেকেই শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু কথাটা অতীব সত্য। শঙ্কারাচার্য্য কৃত "প্রপঞ্চসার" নামক তন্ত্র গ্রন্থ শীঘ্রই লোকলোচন-বিষয়ীভূত হইবে; তখন আর এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান হইতে সংগৃহীত প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত একখানা প্রপঞ্চসার আমি দেখিয়াছি, তাহার শেষে লিখিত আছে—"ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবৎ পাদ কৃতৌ শ্রীপ্রপঞ্চসারে ষট্‌ত্রিংশত্তমঃ পটলঃ।" অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ এবং গোবিন্দপাদের গুরু গৌরপাদ ইহা বিদ্বৎ সমাজে সুপরিচিত। তারা রহস্য-বৃত্তিকা প্রভৃতি অতি প্রাচীন ও তন্ত্রসার, শ্যামা রহস্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমস্ত সংগ্রহ গ্রন্থেই প্রপঞ্চসারের বহু প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। "আনন্দলহরী"—নামক ষোড়শী বিদ্যার স্তবও শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বলিয়া বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহকারগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। নানা গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য প্রণীত আরও বহু শক্তিস্তব পাওয়া যায়। রূপবর্ণনাত্মক একটী তারা স্তব তন্ত্ররত্ন নামক প্রাচীন সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে, তারা রহস্য বৃত্তিকায় এবং বর্ত্তমান কাল প্রচলিত তারা পূজা পদ্ধতিতেও তাহার উল্লেখ আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য একজন তন্ত্রমতের বিশিষ্ট প্রচারক বলিয়া পশ্চিমদেশে এবং অস্মদ্দেশেও তান্ত্রিক সমাজে প্রসিদ্ধি আছে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তন্ত্রমত প্রচারে কেন প্রবৃত্ত হইলেন, ইহার কারণ নির্দ্ধারণ বিশেষ কঠিন নহে। মাধবাচার্য্য প্রণীত শঙ্কর দিগ্বিজয় গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়—যে সকল আত্মজ্ঞানলিপ্সু শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞানে অনধিকারীদিগকে শঙ্করাচার্য্য পঞ্চদেবতা উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রেই পঞ্চদেবতা উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রেরও অদ্বৈতজ্ঞানই মুখ্য উদ্দেশ্য।

উড্ডীশোত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

"যেষামদ্বৈতভাবো হরিচরণ পরাঃ শঙ্করা সক্তচিত্তঃ
নিন্দাবাদং ন যেষাং স্পৃশতি চ রসনা নিত্য পূজাতি পূতাঃ।
কারুণ্যঞ্চাপি যেষাং মনসি সবিনয়ং যে পরা নন্দ সারা
স্তেষাং নীলা মহেশী বিতরতি কুশলং সর্ব্বদা সর্ব্বদৈব।"

শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিধৃত শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ক্রমস্তবে উক্ত হইয়াছে—

"সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারণ কর্তৃভূতং
বেদান্তবেদ্যমজমব্যয়মপ্রমেয়ম্।
অন্যোন্যভেদ কলহাকুল মানসাস্তে
জানন্তি কিং জড়ধিয় স্তবরূপ মম্ব।"

এইরূপ বহু তন্ত্রে অদ্বৈতবাদের কথা আছে। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে—

"অস্তি সতং পরং ব্রহ্মস্বরূপো নিস্কলঃ শিবঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তাচ সর্ব্বেশো নির্ম্মলো হ্বয়ঃ।
স্বয়ং জ্যোতি রণাদ্যন্তো নির্ব্বিকারঃ পরাৎপরঃ।
নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দ স্তদংশাজীবসংজ্ঞকাঃ।
একমেব পরং ব্রহ্ম রসরূপী সনাতনঃ।
প্রকৃত্যা ক্রিয়তে ব্যক্ত স্তথাহ ব্যক্তস্তয়া পুনঃ।
তস্মাৎ প্রকৃতি যোগেন ক্ষিপ্রং প্রত্যক্ষ মাপ্নুয়াৎ।
প্রকৃত্যা জায়তে ব্রহ্ম প্রকৃত্যা লীয়তে পুমান্।
উপায়াঃ সন্তি বহুধা জ্ঞাতুং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তথাপি প্রকৃতে র্যোগাৎ ক্ষিপ্রং প্রত্যক্ষতাং লভেৎ।
তস্মাত্তাং প্রকৃতিং বক্ষ্যে দীক্ষাবিধি পুরঃসরাম্।

এই সকল প্রমাণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, প্রকৃতির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান

লাভ করাই তান্ত্রিক উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অনধিকারী শিষ্যদিগকে তান্ত্রিক পঞ্চদেবতা উপাসনার উপদেশ দান, প্রপঞ্চসার প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন এবং তন্ত্রমত প্রচারের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

নিপুণভাবে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, তন্ত্রশাস্ত্রে কোন মতই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও প্রকৃতিই তান্ত্রিক উপাসনার মূল ভিত্তি। পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগ, মীমাংসা দর্শনের মন্ত্রশক্তিবাদ এবং পাণিনীয় দর্শনের শব্দ ব্রহ্মবাদ বিশেষরূপে সমর্থিত হইয়াছে। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য অথর্ব্বভাষ্যোপদ্‌ঘাতে ঋক্ যজুঃ ও সামবেদকে কর্ম্মপ্রধান এবং অথর্ব্ববেদকে ব্রহ্মপ্রধান বলিয়াছেন। রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রেও অথর্ব্ববেদেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। চিকিৎসা, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও নিগূঢ় তত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রে নিহিত আছে। ফলতঃ তন্ত্রশাস্ত্র সর্ব্ববিদ্যার আকর বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এবং সর্ব্ববিদ্যার শীর্ষদেশে অদ্বৈতবাদ স্থাপিত। অন্য সকল বিদ্যাই সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা রূপে ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের নিবন্ধ পাঠে বোধ হয়, তাঁহারা অদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিয়াড়া গ্রাম নিবাসী পূর্ণানন্দবংশোদ্ভব সাধক প্রবর রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের (প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন) স্বহস্ত লিখিত তন্ত্রগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, এক বেদান্ত বাগীশ ইঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন এবং ইনি নিজেও বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী তান্ত্রিক সাধকদিগের বিবরণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, প্রায় কেহই বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ না করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রের অনুশীলন অথবা তান্ত্রিক উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করেন নাই। বর্ত্তমান সময় তন্ত্রের অপ্রচার ও বিচক্ষণ তান্ত্রিকের অভাবে, তন্ত্রের নিগূঢ় বিষয় জানিবার উপায় নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

রাজর্ষি সুদাস।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে সুদাস নামে এক জন রাজর্ষি ছিলেন। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে তাঁহার বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতাতেও রাজর্ষি সুদাসের নাম দৃষ্ট হয়।

রাজর্ষি সুদাসের পিতার নাম পিজবন; পিতামহের নাম দেববান্।

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ঋষি বশিষ্ঠগণ। মহর্ষি বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলে রাজর্ষি সুদাসের জয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পুরাণে সুদাস নামক দুই জন নরপতির উল্লেখ আছে, কিন্তু ঋক্ সংহিতায় উল্লিখিত সুদাসের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ থাকা অনুমাণ হয় না।

আমরা প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ হইতে সুদাস নরপতির পরিচয় প্রকাশ করিতেছি। বিষ্ণু পুরাণের চতুর্থ অংশে সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সূর্য্যবংশে সগর নামে বিখ্যাত এক জন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কশ্যপ দুহিতা সুমতি এবং বিদর্ভ রাজতনয়া কেশিনী নামে দুই মহিষী ছিলেন। কেশিনীর গর্ভে সগরের অসমঞ্জ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অসমঞ্জের অংশুমান নামে এক পুত্র ছিল। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎপুত্র নাভাগ, তাঁহার পুত্র অম্বরীষ, তাঁহার পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তাঁহার পুত্র অযুতাশ্ব, তৎপুত্র ঋতুপর্ণ। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, তৎপুত্র সৌদাস।

এই সৌদাস নরপতিকে ঋক্ সংহিতার সুদাস নরপতি বলিয়া কোন প্রকারেই বলা যায় না।

বিশাল চন্দ্রবংশে মুদ্‌গল নামে এক জন নরপতি ছিলেন। মুদ্‌গলের পুত্র বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের পুত্র দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ু হইতে চ্যবন, চ্যবনের পুত্র সুদাস।

এই সুদাস ও ঋক্ সংহিতার সুদাস অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করা যায় না।

অগ্নিপুরাণে লিখিত হইয়াছে :—

দিলীপের পুত্র ভগীরথ, যিনি গঙ্গা আনয়ন করেন। ভগীরথের পুত্র ভানগা, নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তাঁহার পুত্র

শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, তাঁহার পুত্র কল্মাষপাদ, তাঁহার পুত্র সর্ব্বকর্মা, তৎপুত্র অনরণ্য।

বিষ্ণুপুরাণের নামের সহিত অগ্নিপুরাণের নামাবলীর সামঞ্জস্য হয় না।

* * দিবোদাসান্ মৈত্রেয়ঃ সোমজস্ততঃ।

সৃঞ্জয়াৎ পঞ্চধনুষঃ সোমদত্তশ্চ তৎসুতঃ॥ অগ্নিপুরাণ ২৭৭।২৩

ভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভ, তাঁহার পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তাঁহার পুত্র অযুতায়ু। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ইনি নলের সখা। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, তৎপুত্র সুদাস। নবমস্কন্দ ৯ অধ্যায় ১৬—১৯।

অন্যত্র—দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু, তৎপুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র সুদাস। নবমস্কন্ধ ২২ অধ্যায় ১ শ্লোক।

অতএব পুরাণে বর্ণিত কোন সুদাস আমাদের আলোচ্য সুদাস সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করা যায় না।

রাজর্ষি সুদাস কোন্ সময়ে ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হন্, তৎসম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাময়িক ঘটনার সময় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ কুরুক্ষেত্র সমরের সময় নির্ণয় করা প্রয়োজন। ইয়োরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্র সমর হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সময় নিরূপণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্দ্ধারণের প্রতি নির্ভর করিতে অপারগ।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় গ্রন্থানুসারে আমরা কুরুক্ষেত্র সমরের সময় নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

যবন সম্রাট্ আলিসকন্দর (Alexander) দিগ্বিজয়ার্থ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া পঞ্জাব প্রদেশে আগমন করেন। এই সময়ে পাটলীপুত্র নগরে নন্দবংশীয় জনৈক নরপতি বর্ত্তমান ছিলেন। ভুবনবিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত তৎকালে নন্দবংশীয় শেষ নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। শতদ্রু নদীর তীর পর্য্যন্ত মগধ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। চন্দ্রগুপ্ত শতদ্রু পার হইয়া মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণ করার জন্য আলিসকন্দরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু আলিসকন্দর সে অনুরোধ রক্ষা করা অসঙ্গত মনে করিয়া শাঙ্গল নগর হইতে মুলতান অভিমুখে

যাত্রা করেন। আলিসকন্দর খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে :—

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৩২

পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক কাল ১০১৫ বৎসর অন্তর।

মহাপদ্ম নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এবং তাঁহার পুত্রগণ একশত বৎসর রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্ত চানক্যের সাহায্যে শেষনন্দ নরপতিকে সংহার করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য বংশের প্রথম নরপতি।

নন্দবংশীয় নরপতিগণের রাজত্বকাল ১০০ বৎসর, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে প্রথম নন্দের অভিষেক কাল ১০১৫ বৎসর। অতএব পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দবংশের অবসান ১১১৫ বৎসর। পরীক্ষিতের জন্ম এবং কুরুক্ষেত্র সমর সমসাময়িক। নন্দবংশের অবসান ও আলিসকন্দরের ভারতাগমন প্রায় এক সময়ে ধরা যাইতে পারে। অতএব কুরুক্ষেত্র সমর খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দী ধরা যাইতে পারে।

যশল্মীরের ভট্টিরাজগণ তাঁহাদিগকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া প্রকাশ করেন্। তাঁহাদের ভট্টগণের যে বৃত্তান্ত কর্ণেল টড সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়া এক অব্দের উল্লেখ আছে। (Vide Tod's Rajastan—Annals of Jessulmeer Chap 1)

রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে :—

শতেষু ষটষু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষুচ ভূতলে।

কলের্গতেষু বর্ষাণাম ভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥

কল্যব্দের ৬৫৩ বৎসর গতে কুরুপাণ্ডবগণ ভূমণ্ডলে বর্ত্তমান ছিলেন।

শাকেষু নবশৈলন্দুরাম যোগে কলের্গতাঃ।

শকাব্দে ৩১৭৯ যোগ করিলে কল্যব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান ১৮৩৪ শকাব্দের সহিত ৩১৭৯ যোগ করিলে ৫০১৩ কল্যব্দ হয়।

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।

ষড়্দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শককাল স্তস্য রাজ্যস্য॥

যুধিষ্ঠির নৃপতির রাজ্য শাসন সময়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল। শককালের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যথা—বর্ত্তমান ১৮৩৪ শকাব্দের সহিত ২৫২৬ যোগকর এবং তাহার সহিত ৬৫৩ যোগকর—মোট ৫০১৩ হইবে।

বিষ্ণু পুরাণেও উল্লেখ আছে ঃ—

"তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন দ্বিজোত্তম" ৪।২৪।৩৪

"তে সপ্তর্ষয়ঃ"

পরীক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন।

কথিত আছে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ সঙ্কলন করিয়া বিভাগ করিয়াছেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পিতা মহর্ষি পরাশর। পরাশরের পিতামহ মহর্ষি বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ এবং তাঁহার বংশধরগণ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। সপ্তম মণ্ডলে মহর্ষি পরাশরের নাম দৃষ্ট হয়, যথা ঃ—

প্রয়েগৃহাদমসদুস্ত্বায়া পরাশরঃ শতয়াতুর্বশিষ্ঠঃ। ৭।১৮।২১

ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঋক্ পরাশরের সময়ে রচিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ঋগ্বেদের কোন কোন ঋক্ তদপেক্ষাও বহুপ্রাচীন। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় তাঁহার ওরায়ণ (Orion) গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে কোন কোন ঋক বর্ত্তমান সময় হইতে ৭৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। অতএব ঋগ্বেদ অতিপ্রাচীনকাল হইতে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আমাদের আলোচ্য রাজর্ষি সুদাস এই সময় মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। এতৎব্যতীত তাঁহার কাল নিরূপণের উৎকৃষ্টতর কোন পন্থা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করেন নাই।

রাজর্ষি সুদাস বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশের কোন স্থানের অধিপতিছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ভারত প্রভৃতি দশজাতির সহিত সুদাস প্রমুখ তৃৎসুগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩ সূক্ত এবং সপ্তম মণ্ডলের ১৮,৩৩ এবং ৮৩ সূক্তে এই যুদ্ধের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সময়ে ভারতগণ পঞ্জাব হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন। বিশ্বামিত্র প্রমুখ ভারতগণ রথ এবং শকট সহ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া নদী পার হইয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন। যে স্থানে শতদ্রু এবং বিপাশা নদীদ্বয় সংমিলিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে, এইস্থানে বিশ্বামিত্র সৈন্যসহ শতদ্রু এবং বিপাশা নদী পার হইলেন।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩সূক্তে বিশ্বামিত্র প্রমুখ ভারতগণের শতদ্রুবিপাশা নদী উত্তীর্ণ হওয়ার বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান সময়ে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে বক্সার রেল ষ্টেসনের নিকট বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। বিশ্বামিত্র এই প্রদেশ হইতে গমন করিয়া থাকিলে, দূর দেশ হইতে শতদ্রু নদীর তীরে গমন করা প্রকৃত বোধ হয়।

এই যুদ্ধে ভারতগণ সহ দশজাতি সংমিলিত ছিলেন। ইহারা রাজর্ষি সুদাসের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

সমাজ সংস্কার।

মনুষ্যের মত মনুষ্য সমাজ এবং জাতি বিশেষও সময় সময় রুগ্ন, ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং বিকৃত হইয়া থাকে। যে রুগ্ন, যে ভগ্ন স্বাস্থ্য, তাহারই চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। যে পথভ্রান্ত, তাহারই পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। যে বিদ্যার্থী, কিংবা সাধক তাহারই আচার্য্য বা গুরুর প্রয়োজন। সেইরূপ সমাজ দেহেরও স্বাস্থ্য সংস্থাপন জন্য সমাজ চিকিৎসক বা সমাজ সংস্কারকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একজন অন্ধ ব্যক্তির অপর একজন অন্ধকে পথ প্রদর্শনের প্রয়াস যেরূপ শুধু উপহাসের বিষয় মাত্র নহে, অধিকন্তু অসঙ্গত এবং বিপদ শঙ্কুল, অযোগ্য অনধিকারী ব্যক্তির সমাজ সংস্কারকের পদ গ্রহণও সেইরূপ শুধু উপহাসের বিষয় বলিয়া উপেক্ষনীয় নহে, পরন্তু তাহার ভাবী ফলের ভীষণতার বিষয় চিন্তা করিয়া সমাজ হিতৈষী বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই তাহার প্রতিবিধান জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আজকাল এই দুস্থ, পতিত ভারতভূমিতে, সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক অযোগ্য অনধিকারীর সংস্কার প্রয়াসরূপ অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চা অথবা সমাজের নিন্দা, ভৎর্সনা, উপদ্রবময় তাণ্ডব নৃত্য, বক্তৃতা, রচনা,—নানা নির্লজ্জ যথেচ্ছাচারে এই সুপ্রাচীন গৌরান্বিত সমাজ যেন জীবমৃত হইয়া রহিয়াছেন। হিন্দুসমাজ দেহের, হিন্দুর জাতীয় ব্যাধির চিকিৎসা কার্য্যে যিনি ব্রতী হইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে হিন্দুর প্রকৃতি কি, হিন্দু জাতির বিশিষ্টতা কি, হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের মহত্বের নিদান কোথায়,

হিন্দুর অতুলনীয় জাতীয় প্রকৃতির গভীরতা কি প্রকার—এত দুঃখ দারিদ্র আপদে পতিত হইলেও জগতের অন্যান্য শিক্ষা সভ্যতাভিমানী শক্তিশালী জাতির তুলনায় আজও এ জাতির অসংখ্য নরনারীর জীবনে সুখ ও শান্তি এত অধিক কেন,—এসকল বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া সুপরিচিত এবং সুবিজ্ঞ হইতে হইবে, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ভারতের সমাজ সংস্কারক শাস্ত্রকার বর্গের প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্য নামাবলী আমরা একবার এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি ঃ—

"মন্বত্রিবিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরা
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥
পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ ॥

বিষয়-ভোগ-বাসনা-বিরত, স্বজাতি-গত-প্রাণ, সমাজ-হিতব্রত, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-পরম্পরা-মর্ম্মজ্ঞ, তপস্বী, সংযতেন্দ্রিয় উপরোক্ত সাধু মহাপুরুষদিগের প্রত্যেকেই স্বার্থ চিন্তা সমাজের হিতকল্পে একবারে বলি দিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, মানাপমানের পঙ্কিল স্পর্শের সহিত যে জীবনে তাঁহাদের কোন সংশ্রব ছিল না। সমগ্র সমাজকে তাঁহারা আত্মহৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, সমাজের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুখ দুঃখ বোধ তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রখর ছিল বলিয়া তাঁহারা সকল স্তরের সকল শ্রেণীর নরনারীর আকাঙ্ক্ষা সুবিদিত থাকিয়াও সমগ্র সমাজের কল্যাণ ও স্থিতির পক্ষে কিরূপ বিধি প্রণয়ন ও প্রচলন প্রয়োজন ও সমীচীন, তাহা তাঁহারা গভীর ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া অবধারণ করিতে সক্ষম ছিলেন।

যিনি প্রকৃত সমাজ সংস্কারক হইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে কঠোর সাধনাশীল হইতে হইবে। আত্ম সুখ ভোগেচ্ছাকে তিনি একবারে বিসর্জ্জন দিয়া, ক্ষুদ্র অহং গণ্ডী হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়া বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় সমাজদেহে আপনাকে মিলাইয়া দেখিবেন। প্রথমে আপন পিতামাতা ভ্রাতা স্ত্রী পুত্র, পরে আপন জাতি গোষ্ঠী, তৎপরে আপন পল্লী, পল্লী হইতে প্রদেশ, প্রদেশ হইতে সমগ্র দেশের বিরাট সমাজে পরে সমগ্র জাতিতে আপনাকে মিলাইয়া, আত্মশাসনের ফলে আত্মবিলোপ করিবেন। এই আত্ম বিলোপ করিতে পারিলেই বিরাট রাষ্ট্রীয় সমাজদেহের—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলশ্রেণীর

লোক সমন্বিত সমাজ জননীর এক অখণ্ড বরবপুর সন্দর্শন লাভ ঘটে। তখন ক্ষুদ্র হিংসা, দ্বেষ, আত্ম-পর ভাব থাকে না। তখন তিনি এক মহোচ্চ দেবাসনে অধিষ্ঠিত ও দৈবীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে সকল আদেশবাণী প্রচারিত করেন, ধনী-মানী-জ্ঞানী, রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্ব্বিশেষে তাহা কেহই লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন না, ইচ্ছাও করেন না। কারণ সে মঙ্গলময় বিধিবাণীতে সকলেরই অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে।

অধুনা আমাদের দেশে যাঁহারা সমাজ সংস্কার প্রয়াসী বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই অনধিকারী বলিতে পারা যায়। তাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংসর্গ, রুচি, প্রবৃত্তি, ধর্ম্মজ্ঞান, সত্যানুরাগ, সমাজ প্রীতি, সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সুতীক্ষ্ণ নির্ম্মল বুদ্ধি, শাস্ত্র ও ইতিহাস জ্ঞান, পবিত্র অন্তঃকরণ প্রভৃতি বহু অত্যাবশ্যক বিষয়ের একান্ত অভাব। তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রবৃত্তিমার্গের পথিক। নিবৃত্তি মার্গের কঠোরতার কথাই তাঁহারা শুনিয়াছেন এবং সেজন্য নিবৃত্তি মার্গের কোন কথা উত্থাপন করিলেই ভয়ে তাঁহারা বুদ্ধিহারা হন। সে পথের ভাবী স্থায়ী সুখ শান্তির কথা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবারও তাঁহারা অবসর পান না এবং তাঁহাদের সে শক্তিও নাই বলিয়া বোধ হয়। বাধা বিঘ্নকে কোন প্রকারে পরিহার করিয়া পূর্ণমাত্রায় ভোগবাসনাকে পরিতৃপ্ত করাকেই যাঁহারা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা মনে ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদের হস্তে সমাজ সংস্কারকের ভার ন্যস্ত হইলে, সে সমাজের সুখ, শান্তি, স্থায়িত্ব কিছুরই আশা করা যাইতে পারে না। নব্য ইউরোপের অস্তিত্ব এবং ইতিহাস, এই সুপ্রাচীন আর্য্য ভারতের তুলনায়, দুই দিনের মাত্র। কিন্তু এই দুই দিনের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সত্ত্বগুণান্বিত ধর্ম্ম প্রচারক বর্গের হস্তে সে সকল দেশের সামাজিক বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন ও সংস্কারের ভার ন্যস্ত না করায়, সে সকল দেশের সামাজিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয়তর হইতেছে। সামাজিক সমস্যা সে সকল দেশে দিনের পর দিন যেরূপ ভীষণতর হইতেছে, তাহাতে অচিরে ইউরোপ এক ভীষণ শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই। আজ কাল পাশ্চাত্য-দেশের কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী সমাজ তত্ত্বজ্ঞ তাই সে সকল দেশে State হইতে Churchকে স্বতন্ত্র স্বাধীন শক্তিতে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি রাজনীতি ক্ষেত্রে টাকা আনা পাই, পাউণ্ড

বন্দর, নৌসৈন্য, স্থল সৈন্য, রাজ্যবৃদ্ধি উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন, তাঁহারাই দেশের নরনারীর সামাজিক জীবনের সকল প্রকার সমস্যারও সমাধান করিবার সম্যক্ অধিকারী, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে সকল দেশের লোকে যে মহাভ্রমের কার্য্য করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইউরোপের ভ্রান্ত পথ ও ভ্রান্ত মত আমাদের ন্যায় বিজিত ও পরকীয় শিক্ষা গ্রস্ত জাতির নিকট আজ কাল উৎকৃষ্ট ও মধুর বোধ হইতে পারে। কিন্তু সে পথ আমাদের ইহকাল পরকাল, কোন কালের পক্ষেই সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তির অনুকূল নহে, সুতরাং অবলম্বনীয়ও নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্পর্শ ও সংঘর্ষে আমাদের বুদ্ধি এখন মলিন, আর্য্য আদর্শও এখন পূর্ব্বের ন্যায় অত্যুচ্চ নাই; তাই এখন আমরা সহমরণের মর্ম্মাবধারণ করিতে অক্ষম, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী বেহুলার চরিত্র অনেকের নিকট অস্বাভাবিক অথবা নারী জাতির অবমাননাকর, নীচ দাস্য ভাবের বিকার বলিয়াই বোধ হয়। বিধবার আমরণ ব্রহ্মচর্য্য-মহিমাও আমাদের অনেকের নিকট এখন দুর্ব্বোধ্য। শ্রীমচ্চৈতন্য দেবের ন্যায় সমদর্শীতা ও প্রেমময় প্রাণ আমাদের নাই, অথচ মুখে আমরা বর্ণ-বিচার মানি না,—জাতি ভেদের নিন্দা করি। আমরা এখন এমন অনেক কথা অনেক সময় বলি, যাহা আমাদের প্রাণের কথাও নয়, জ্ঞানের কথাও নয়, শুধু মুখের কথা। সুতরাং আমাদের সে সকল ব্যর্থ প্রয়াসের ফল সমাজের পক্ষে শুভকর, সর্ব্বজন গ্রাহ্য বা স্থায়ী হইতে পারে কি? আমাদের আধুনিক সমাজ সংস্কারকেরা যে সকল বিষয়ে আন্দোলন করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সমাজকে নিন্দা ও অভিসম্পাৎ করিতেছেন, সে গুলির সম্পর্কে আমরা ক্রমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। তবে এটুকু বলিয়া রাখি, হিন্দু সমাজে যে এখন সংস্কারযোগ্য কোন কিছুই নাই, আমরা এরূপ মনে করি না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

অগ্নির উৎপত্তি।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, ধর্ম্মের ঔরষে বসুভার্য্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম। অগ্নির স্ত্রীর নাম স্বাহা। ইঁহার বাহন ছাগ। স্বেতকী রাজার যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত আহার করিয়া অগ্নির মন্দাগ্নি হইয়াছিল। রোগ প্রতিকার জন্য ব্রহ্মা পরামর্শ দিলেন যে, খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতে পারিলে রোগ আরোগ্য হইবে। পিতামহ ব্যবস্থা প্রদান করিলেও দেবতাদিগের রক্ষিত এই খাণ্ডব বন দগ্ধ করা একাকী অগ্নির পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইল। তখন অগ্নি কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন বটে, কিন্তু দেবতাদিগের প্রতিদ্বন্দীতা করিবার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র তাঁহার ছিল না। যাহা হউক, অগ্নি স্বীয় সখা বরুণদেবের সাহায্যে বহু অস্ত্র সংগ্রহ করিলেন। ভারত-যুদ্ধে বিখ্যাত অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র ও কৌমদকীগদা বরুণদেবের নিকট হইতে অগ্নিই সংগ্রহ করিয়া দেন। অবশেষে কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব বন দগ্ধ হইলে পর অগ্নিদেব দুরন্ত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। অপিচ অগ্নিদেব প্রদত্ত সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রাদির বলে অর্জ্জুনও ভীষণ কৌরব যুদ্ধে জয় লাভ করেন।

অগ্নির দ্বারা এই প্রকার মহোপকার যে কেবল অর্জ্জুনেরই হইয়াছিল তাহা নহে। ঐতিহাসিক যুগেরও বহু পূর্ব্বে যে সকল স্থানে সভ্যতার ক্ষীণ দীপ্তিও বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তথাকার অসভ্য বর্ব্বর জাতিগণও অগ্ন্যুৎপাদন করার কৌশল জ্ঞাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ঘৃতাহারে স্বয়ং অগ্নিদেবেরও যখন অগ্নিমান্দ্য রোগ জন্মে, তখন অসভ্য মানবেরা কাঁচা অপক্ব মাংস কতই বা হজম করিতে পারে? সুতরাং প্রয়োজনবশে কাষ্ঠাদির ঘর্ষণে এবং চকমকির পাথর দ্বারা অগ্নির উৎপাদন আবিষ্কার হইয়াছিল। তদবধি অসভ্যজাতিরাও সুপক্ব বা অৰ্দ্ধপক্ব মাংস ভোজনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দাবাগ্নি, বিদ্যুৎ, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি সম্ভূত অগ্নির সহিতই আদিমকালের মানবের প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। এই সকল স্বভাবোৎপন্ন অগ্নির দাহিকা শক্তি অবলোকন করিয়া উহারা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল, এবং তাহা হইতেই প্রথমতঃ অগ্নি

সংগ্রহ ও সংরক্ষা করিয়াছিল। অগ্নির উৎপাদন কৌশল পরবর্ত্তী যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জ্যোতিঃ, তড়িৎ, গতি, এবং রাসায়নিক সম্মিলন (Chemical affinity) প্রভৃতি নৈসর্গিক শক্তি হইতেই উত্তাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং এই শক্তিই মানুষের অগ্নি উৎপাদনে প্রথম সহায় হইয়াছিল। কুব্জাকার কাচ অথবা দর্পণের সাহায্যে সূর্য্যকিরণ সমকেন্দ্রীভূত করিয়া অগ্নিশিখা প্রজ্বালনের প্রথাও প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। দুইটী কাষ্ঠখণ্ড ঘর্ষণ দ্বারা, দুইটী ধাতুদ্রব্য পরস্পর আঘাত করিয়া, অথবা বায়ুর চাপে অগ্নির উৎপত্তি হয়; ইহার কারণ নৈসর্গিক শক্তি—গতি ব বেগ (motion)। দুইটী কাষ্ঠখণ্ড পরস্পর ঘর্ষণ করিলে, অথবা একটী কাষ্ঠকে অপর একটী কাষ্ঠ দ্বারা করাতের ন্যায় কর্ত্তন করিবার উপক্রম করিলে অথবা একটী কাষ্ঠের উপর ছিদ্র করিয়া অপর একটী কাষ্ঠের এক প্রান্ত ঐ ছিদ্রে আবর্ত্তন করিলে যে জ্বলন্ত কাষ্ঠ চূর্ণ বহির্গত হয়, তাহা শুষ্ক তৃণের উপর রাখিয়া ফুৎকার দিলেই অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়। প্রাচীন কালে এইরূপ উপায়েই অগ্নি উৎপাদন করা হইত।

দুই খণ্ড লৌহ বা চকমকি পাথর ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন প্রথা অতি প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। এখনও ফিউজিয়ান, এস্কিমো প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা এই উপায়েই অগ্নি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ক্রমে লোকে প্রকৃত চকমকির পাথর এবং ইস্পাত আবিষ্কার করিয়া অতি সহজে অগ্নি প্রজ্বালন কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে Congreve নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে দিয়াশলাই প্রস্তুত প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সভ্য মানবেরা ইস্পাত ও চকমকির ব্যবহার করিত। এখনও অনেক দেশে পূজাদি দেবক্রিয়ার নিমিত্ত ব্যবহার্য্য অগ্নি দিয়াশলাই দ্বারা প্রজ্বলিত না করিয়া কাষ্ঠ বা চকমকির সাহায্যে উৎপাদন করা হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুইডেনের জঙ্কোপিং নগরে আইনের বলে এই উপায়ে অগ্নি উৎপাদন প্রথা নিবারিত হইয়াছিল। এতদ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে তৎকালে অগ্নিজ্বালনের অন্য কোনরূপ উৎকৃষ্টতর বৈজ্ঞানিক উপায় তৎপ্রদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহার ফলে অধুনা অগণিত দিয়াশলাইর বাক্স সুইডেনের উক্ত নগর হইতে নানা দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

ঘর্ষণাদি দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন বহু সময় ও শ্রম সাধ্য ব্যাপার। এজন্য অসভ্য জাতিরা প্রতিগৃহে অগ্নি রক্ষা করা অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য মধ্যে গণ্য

করে। সচরাচর স্ত্রীলোকদিগের উপরই এই কার্য্যভার ন্যস্ত থাকে। যে স্ত্রীলোকের রক্ষিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, অষ্ট্রেলিয়গণ তাহাকে অতি কঠিন শাস্তি প্রদান করে। আমেরিকা ও ওসেনিয়া প্রদেশে কতিপয় আদিম জাতির ভিতর নূতন অগ্নি প্রজ্বালন ক্রিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

নিরাশ্রয়ের গান।

আর আপন বলিতে কেহ নাই !
সেই প্রেম সিন্ধু জীবন-ইন্দু
তারি পানে যেন ছুটিয়ে যাই !
আপন বলিয়ে ভেবেছিনু যারে
সেত গো চাহে না ফিরিয়া।
আছি অকূল পাথারে ; গভীর আঁধারে—
ফেলেছে জীবন ঘিরিয়া।
—সকলি ভ্রান্তি ; সুখ শান্তি
সে চরণ বিনে কোথাবা পাই ?
আর আপনা বলিতে কেহ নাই !
সে যে করুণা সিন্ধু, ঢালিলে বিন্দু,
যাব সব দুখঃ ভুলিয়া,
এ শুষ্ক হৃদয় হবে মধুময়
নাচিবে লহর তুলিয়া।
সে যে শান্তি-নিলয় দীন-দয়াময়,
তারি নামে যেন গলিয়ে যাই !
আর আপন বলিতে কেহ নাই !

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার

প্রায় সার্দ্ধ ত্রিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের বেজোড়া পরগণায় তত্রত্য নন্দী-বংশের পূর্ব্ব পুরুষ আগমন করেন। ইহাদের আদি স্থান ময়মনসিংহ জিলা।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত গচিহাটার কাশ্যপ গোত্রীয় নন্দীবংশে ভুবনেশ্বর নন্দীর—লবণেশ্বর, শুক্লাম্বর (শুক্লেশ্বর) ও মহেশ্বর নামে তিন পুত্র হয়। প্রসিদ্ধ কবি রামেশ্বর নন্দী এই বংশোদ্ভব।

শুক্লাম্বর নন্দীর পুত্রের নাম পীতাম্বর, তৎপুত্র লম্বোদর, লম্বোদরের পুত্রের নাম ত্রিলোচন। ইনি বুড়ীশ্বর গ্রামে গমন করিয়া তথায় বাস করেন।

রামেশ্বর নন্দী "ক্রিয়াযোগ সার", "মহাভারত" প্রভৃতি রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কবি ত্রিলোচন কৃত মহাভারতের আদিপর্ব্ব এবং শান্তিপর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় তিনি সমগ্র মহাভারতই রচনা করিয়া গিয়াছেন, দুইটি পর্ব্ব মাত্র পাওয়া গিয়াছে; অপর পর্ব্বগুলি কোন না কোন দিন কেহ পাইতে পারেন। কবি ত্রিলোচনের পুত্র রামদাস বা রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের বিশ্বনাথ ও গোপাল নামে তিন পুত্র হয়। ইহাদের মধ্যে দুর্গাদাস আদ্ধিউড়া গমন করেন, বিশ্বনাথ বেজোড়াতেই থাকেন. গোপাল ইটখোলা বসতি করেন। এই তিন ভ্রাতার বংশধরবর্গ উক্ত তিন স্থানেই সসম্মানে বাস করিতেছেন।

কবি ত্রিলোচনের পৌত্র বিশ্বনাথের বংশ অতি বিস্তৃত। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। এই বংশের বংশধর রামকুমার একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে। পিতা রামকান্তের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল ছিল বলিয়া পুত্রের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, কোনও বিদ্যালয়ে রামকুমারের শিক্ষা হয় নাই; কিন্তু তদীয় বিদ্যানুরাগ ও প্রতিভা অসাধারণ ছিল, তাহাতেই নিজের চেষ্টাতে তিনি বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন, তৎপর অল্প সংস্কৃত এবং কিছু কিছু ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁহার ন্যায় সাহিত্যানুরাগী অতি অল্পই দেখা যায়, এবং এরূপ অশ্রান্ত লেখকও বড় অধিক পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্য বা খণ্ড কবিতা অথবা সঙ্গীত—রসের প্রস্রবণ—ছত্রে ছত্রে রস ঝরিতেছে।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের "বীরাঙ্গনা" পত্রের উত্তরচ্ছলে রামকুমার "বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য" প্রণয়ন করেন। ইহা প্রকাশিত হইলে

কবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি অনেক সঙ্গীত, গানের পালা, কাব্য গ্রন্থ ও নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর একটি অসম্পূর্ণ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল, তদতিরিক্ত তদ্রচিত অন্য কোন গ্রন্থের সংবাদ কেহ আমাদিগকে দিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

কবি রামকুমার কৃত কাব্যগ্রন্থ—

বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর—(মুদ্রিত)। উষোদ্বাহ—(মুদ্রিত)।

দশমহাবিদ্যা—(খণ্ডকাব্য)। নব পত্রিকা—(পৌরাণিক নব নারীর পত্র)।

কলঙ্ক ভঞ্জন—(পাঁচালী)। মালতী উপাখ্যান—(কাল্পনিক গল্প)।

নাটক—বঙ্গদ মহিমা নাটক—(প্রহসন)।

যাত্রার পালা—রাসলীলা। উমা গমন। কংসবধ। চণ্ডীর পালা।

সঙ্গীতের পালা—লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বন্দ্ব। ঝুলন যাত্রা। দোলযাত্রা। পদাঙ্ক দূত।
ভগবতীর জন্ম ও শিববিবাহ। দেবীর বোধন—(চন্দ্রোদয় অবলম্বনে)।

প্রবন্ধমালা—(বিবিধ কবিতা)।

পরমার্থ সঙ্গীত—(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, কয়েক ভাগ অমুদ্রিত রহিয়াছে।)

জীবন্মুক্তি—(সংস্কৃত উপদেশ)। গণিতাঙ্ক—(বালক পাঠ্য)।

কবি রামকুমার যদি পরমার্থ সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছু নাও লিখিতেন, তথাপি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

অলি ও ফুল।

অলি— আমি নিত্য মুগ্ধবেশে ফুলে ফুলে ভ্রমি;
ফুল— নির্ব্বাক অধরে মম, তুমিহে রাগিণী!
অলি— অনন্ত গুঞ্জন সে যে,—রূপের সাধনা!
ফুল— অচির যৌবনে মোর সেই তো সান্ত্বনা!

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ খাঁ।

স্ত্রী শিক্ষার গতি, পরিণতি ও পরীক্ষা।

ঢাকা।

সোণার কমল,

মা, বঙ্গ মহিলার উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম এতদিন তাহা শেষ করা উচিত ছিল। শারীরিক অসুস্থতা বশত তাহা পারি নাই। অবস্থা যেরূপ তাহাতে আর পারিব বলিয়া মনে হইতেছে না। অনেকদিন হইল এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়াছি ঐটীই তোমাকে পাঠাইয়া দিব। স্ত্রী জাতির সংযম নিয়ম এবং নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল; তাহা আর লিখি নাই। তোমার দিদিমার নিকট উপদেশ লইও। মনে রাখিও তোমাদের বি, এ, এম, এ, দের অপেক্ষাও এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা অধিক।

বি, এ, পরীক্ষার জন্য মন দিয়া পড়িবে। আশীর্ব্বাদ করিতেছি উত্তীর্ণ হইবে। তৎপর তোমাকে সরস্বতী উপাধিতে ভূষিতা দেখিলে পরমানন্দ লাভ করিব।

চির স্নেহানুগত

তোমার কাকা

সম্পাদক মহাশয়,

উক্ত পত্র পাইবার ক'দিন পরেই চির-স্নেহশীল কাকা স্বর্গারোহণ করেন। এ জনমের তরে আমার "কাকা" ডাক ঘুচে গেছে। পরীক্ষার পর বাড়ী এসে তাঁর দপ্তর খুঁজে দেখলাম—কত প্রবন্ধ, কত কবিতা, কত সঙ্গীত ও প্রহসন, কত গল্প ও নাটিকা উছাড়ে রয়েছে। তার মধ্যে একখানা লেপাফার উপর আমার নাম লেখা। টীকিট পর্য্যন্ত দেওয়া। কাকা আমাকে লিখিতে পত্রে একটু সুগন্ধি মেখে দিতেন। সে সৌরভ তেমনি রয়েছে। হায় তিনি নাই! এ লেপাফা খুলতে হাত সরলো না, প্রাণে বড় ব্যথা। তাঁহার আশীর্ব্বাদ ফলেছে কিন্তু তিনি জেনে যেতে পারলেন না। বড় দুঃখ রয়েছে। পরীক্ষার ফলের জন্য কিছু দিন বড্ড দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম। এতদিন পর আজ সেই লেপাফা যেমনটি পেয়েছিলাম, আপনাকে তেমনটি পাঠিয়ে দিলাম। যাহা করবার আপনি করবেন। নিবেদন ইতি।

বিনীতা

শ্রীসোণারকমল।

১। স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী, স্বাধীনা হইয়াও স্বতন্ত্রা নহেন। (২) পতি গ্রহণ স্ত্রীলোকের মুখ্য ধর্ম্ম। (৩) স্ত্রী সুগৃহিণী এবং সুমাতা হইবেন। এই তিনটী উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে স্ত্রী শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্র সংহিতায় কাব্য পুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে শিক্ষার, বিষয়, বিষয়াংশ,

দৈনিক নিরূপিত সময়, বিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার যথাযথ চিত্র প্রদান করা কঠিন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইত। গীত বাদ্য নৃত্য, সীবন, চিত্র প্রভৃতি কলার অনুশীলন হইত। বৈদিক যুগের শিক্ষা বেদাঙ্গ মূলক ছিল। রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা সকল স্তরের মহিলাদিগের আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র, রীতি নীতি গঠন করিত।

প্রাচীন আর্য্যগণ স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সময় ৪ চারিটী মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছিলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন—শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ ব্যতীত নারী, মহিলা নামের যোগ্যা হইতে পারেন না। ডম্বেল, সাইকেল, টেনিস্ স্কেটিং ইত্যাদি না থাকিলেও প্রাচীন আর্য্যনারীগণের সংসার যাত্রায় যথেষ্ট ব্যায়াম হইত। সে কালের অনেক অলঙ্কারের উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু "চস্মার!" উল্লেখ দেখা যায় না। তৈল, দশা, দীপাধার, দীপাবরণ সকল গুলির সমবেত কুশলতা ব্যতীত তেজস্কর প্রদীপ হয় না। চক্ষুর জ্যোঃতি শরীরের সকল যন্ত্রের স্বাস্থ্য জ্ঞাপন করে। সে কালে সধবা ষোড়শীকে চসমার অভাবে কখনও আহার কালে বিড়ালের বঞ্চনায় পড়িতে হইত না। জ্ঞানানুশীলনে মনের উৎকর্ষ হইত। অতিথ সেবা এবং পরিজন পালনে হৃদয়-বৃত্তি কোমল থাকিত। দেব-সেবায় আত্মা নির্ম্মল হইত। বর্ত্তমান সময়ে কোন জ্ঞানান্বেষিণীর উক্তির এরূপ পরিকল্পনা অতি রঞ্জিতবলিয়া গণ্য হইবার কোন কারণ নাই!—আধুনিকা বলিতেছেন, "যে বিদ্যা দ্বারা একটী সেলাইর কল, একটী হারমোনিয়ম, এক খানা মোটর গাড়ী এবং বিদ্যুৎ পাখা ও বিদ্যুৎ আলোক শোভিত বাস গৃহ প্রাপ্ত হওয়া না যায় তদ্দ্বারা আমি কি করিব।" কিন্তু পুরা কালের মৈত্রেয়ীর উক্তি "যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণাস্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি" উত্তর—"অমৃতত্বস্য তু না শাস্তি বিত্তেনেতি"। মৈত্রেয়ী বলিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্ "যদি ধনেতে পরিপূর্ণা এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয় তবে তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি।" উত্তর :—নহে। মৈত্রেয়ী :—"যদ্দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব।"

বর্ত্তমান সময়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে উহা উক্ত চারিটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। কিন্তু বঙ্গদেশে যখন প্রথম স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয় তখন

উহা তেমন স্পষ্ট ছিল না। তখন অপর দিকে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি জনসাধারণের অতিশয় বিতৃষ্ণা ছিল। বিদ্যার সঙ্গে বৈধব্য এক সূত্রে গ্রথিত বলিয়া গণ্য হইত। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও স্ত্রী-শিক্ষার তেমন আদর দেখা যায় নাই। বিদুষী Mary Somerville যখন বাল্যকালে পড়িতে বসিতেন তখন তাঁহার পিতৃব্য পত্নী মেরীর মাতাকে বলিতেন—"I wonder you let Mary waste her time in reading; she never sews more than if she were a man." পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশে স্ত্রীলোকদিগকে উপাধি দানের ব্যবস্থা ছিল না। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী Rosan Bonherকে সম্রাজ্ঞী ইউজিনি (Eugenie) এক অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁহার গুণপণার পুরস্কার দিয়াছিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ান কিয়ৎ দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী ইউজিনি তাঁহার প্রতিনিধি রূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। Rosan Bonher উপাধি পাইবার যোগ্যা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ব্যবস্থা ছিল না। অপরিচিতা সম্রাজ্ঞী এক দিন অতর্কিতে রোঁজার গৃহে উপস্থিত হন এবং তাঁহার গুণপণা স্বীকার করিবার প্রসঙ্গে আলিঙ্গন করিবার সময় অলক্ষিতে "Cross of the Legion of Honour" রোঁজার অঙ্গরাখায় বিদ্ধ করিয়া প্রস্থান করেন। সম্রাজ্ঞী চলিয়া গেলে দূরে অশ্বারোহী অনুচর দেখিয়া রোঁজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার পুরস্কর্ত্রী কে? কিন্তু তখন আর তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রত্যর্পণের সুযোগ ছিল না।

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন কাল হইতে বঙ্গীয় বালকগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। বিদ্বান স্বামী বিদুষী স্ত্রী চাহে। বিদুষীর তখন আশা কোথায়? বর্ণজ্ঞানই যথেষ্ট। স্বামী কিরূপ গোপনে বালিকা স্ত্রীকে 'শিশুবোধক' পড়াইতেন. স্ত্রী কত গোপনে কদর্য্য অক্ষরে হইলেও বিদেশস্থ স্বামীকে পত্র লিখিতেন এবং ঐ সকল পত্রের মূল্য মণিকাঞ্চন অপেক্ষা কত অধিক ছিল তাহা তৎকালের স্বামীগণ তাহা অবগত আছেন। গৃহ-স্বামীর অনুপস্থিত কালে একখানি টেলিগ্রাম আসিলে গৃহিণী শিরোনাম পাঠ করিয়া উহা গ্রহণ করিতে এবং উহার মর্ম্মার্থ অবগত হইতে আগ্রহান্বিতা হইবেন ইহা স্বাভাবিক। ইহাতে সুবিধা এবং উপকারও যথেষ্ট। প্রয়োজন, মানুষকে নূতন পথ দেখাইয়া দেয়। স্ত্রীলোকের ইংরেজী বর্ণমালা শিক্ষার প্রয়োজন-বোধ এখানে। এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে স্ত্রী শিক্ষায় আগ্রহের প্রথম উদ্ভব। বিলাতে ১৮৫০ সনে Miss Bassএর তত্ত্বাবধানে নর্থলণ্ডন

কলেজিয়েট স্কুল এবং ১৮৫৮ সনে Miss Beale এর তত্বাবধানে Chelteanham Ladies College রমণীর উচ্চশিক্ষার প্রথম আদর্শ বিদ্যালয়। প্রায় সম-সময়ে এদেশেও সংস্কারকগণ স্ত্রী শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বারাসতের কালিকৃষ্ণ মিত্র এবং প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাদের অগ্রণী। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে Drink Water Bethune কলিকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখন ভারতবর্ষে বালিকাদের জন্য গবর্ণমেণ্টের অধীন কলেজ ১০, ছাত্রী ২৭৯ ; হাইস্কুল ১৩৫, ছাত্রী ১৬৮৮৪। প্রাইমেরী স্কুল ১২৮৮৬, ছাত্রী ৭৮৫৫১১ ; পশ্চিম বঙ্গে কলেজ ৩, ছাত্রী ৮১, হাইস্কুল ১৯, ছাত্রী ২৪২৩ ; প্রাইমেরী স্কুল ৩১২৪, ছাত্রী ১৫৮৬১৬। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে হাইস্কুল ৩, ছাত্রী ৪৭৯ ; মধ্য ইং বাং স্কুল ১৮, ছাত্রী ১৬২৫ ; প্রাইমেরী স্কুল ৪৫২৭, ছাত্রী ৯৮৮৮০। * উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ দেশে স্ত্রীশিক্ষা ত্রিধারায় প্রবাহিত হইতেছে। (১) বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিক্ষা—বেথুন স্কুল কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, লরেটো, ইত্যাদি গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়। (২) হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা—মহাকালী পাঠশালা। (৩) অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা। এই তিন প্রবাহই আপন আপন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে। এই তিন স্থলেই স্ত্রীজাতির মানসিক শিক্ষার মূলনীতি স্বীকার্য্য। আধুনিক শিক্ষা সংহিতাকার Sir Joshua Fitch স্ত্রী পুরুষের মানসিক বৃত্তির সাম্য স্বীকার করিয়াও ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিতেছেন "To charm & beautify the home is accepted by her as the chief—one might say the professional,—duty which she feels to be most appropriate, hence the greater importance in her case of her artistic training." স্বাস্থ্য সংহিতাকার Dr. Clement Dukes M. D. বলিতেছেন "She is Home maker. Never forgeting the female constitution the education of girls should not be carried out at the expense of motherhood." To charm এই কথার অগ্রধ্বনি অতি পুরাকালে চণ্ডীতে উচ্চারিত হইয়াছিল—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিনীং"

এদেশে ছাত্র ছাত্রীতে মানসিক শিক্ষার সাম্য বিহিত হইয়াছে। কিন্তু

---

* সংখ্যাগুলি অপূর্ণছিল : আমরা ১৯১১-১২ সনের রিপোর্ট হইতে পূর্ণ করিয়া দিলাম। সৌ,স-

স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি এবং কর্ম্মক্ষেত্র ভেদে শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি বিষয়ে বালক বালিকার পাঠ্যে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু উহা পর্য্যাপ্ত নহে। যে প্রকৃতির মানসিক শিক্ষার পেষণে বালকদিগকে পিষ্ট করা হইতেছে, সে প্রকৃতির শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে শুভ নহে। Miss Fawcett এবং Madam Currieর উচ্চ প্রতিভার জন্য উচ্চ ব্যবস্থা থাকিবে কিন্তু সাধারণতঃ বালক বালিকার অধিত বিষয়ের পার্থক্যের সীমা রেখা আরো স্থূল হওয়া উচিত। চিত্র, সঙ্গীত, গৃহিণী-পণা, সীবন, স্ত্রীজাতির উপাধি পরীক্ষার অঙ্গীভূত করা কর্ত্তব্য উপাধি-গুলিও স্ত্রীজাতির উপযোগী হইলে সঙ্গত হয়।

হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলন জন্য স্ত্রীশিক্ষার নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন সহজ নহে। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সঙ্গে এখন বোর্ডিং অপরিহার্য্য। বোর্ডিং পরিচালনায় মাতৃভাব অধিক না থাকিলে বালিকাদের হৃদয়-বৃত্তি কঠিন হইয়া পড়িবে তৎ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভাই ভগ্নির স্নেহের দূরতা, আফ্রিকার সাহারা স্মরণ করাইয়া দেয়। অনেক পিতা মাতা অতি শিশুবালিকাদিগকে বোর্ডিং এ পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহাদের বুঝা উচিত তাহারা পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে উহাতে শিক্ষার সমস্ত সুফল ফুৎকারে উড়িয়া যায়।

বিদ্যালয়ে ক্ষুধিত আত্মার অন্ন মিলে না—ইহা সকলেরই অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে। বালকগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফল শুভ হয় নাই। বালিকা-দিগকে সাধ করিয়া ধর্ম্মহীন শিক্ষার পথে অগ্রসর করিয়া দিলে সমাজের কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। ওদিকে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান বালিকাগণ যখন একই বিদ্যালয়ে পাঠ করে তখন ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা এক জটিল সমস্যা বিশেষ। সমস্যা হইলেও উহার সমাধান আবশ্যক। পুস্তকস্থ বিদ্যায় অধিক ফল পাইবার সম্ভবনা নাই। শিক্ষয়িত্রীদিগের পবিত্র ধর্ম্ম জীবন দেখিয়া বালিকাগণ আপন আপন ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে পারে। এস্থলেও বয়স্কা মাতৃ স্থানীয়া প্রবীণা এবং নিষ্ঠাবতী শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন অধিক। মহাকালী পাঠশালায় [পূজা আহ্নিক প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে।] কিন্তু উহা কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের কোমল মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে। গৃহে পিতা মাতা ভাই ভগ্নিকে ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান নিষ্ঠাবতী না দেখিলে বিদ্যালয়ে উহার অভিনয় সুফল প্রসব করিতে পারে

না। প্রতি শিক্ষিত পরিবারের চিত্র লইলে দেখা যাইবে অধিকাংশ স্থলে পূজা অর্চনার অভ্যাস ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

সর্ব্বাগ্রে শরীরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত ছিল। কাঠামো সুদৃঢ় না হইলে প্রতিমা তিষ্ঠিবে কাহার উপর। কিন্তু ব্যায়ামের অভাব বালিকাদের শরীর সবল ও সুগঠিত হইতেছে না। সংসার-যাত্রায় পূর্ব্ব প্রচলিত ব্যায়ামে বালিকাদের আর অভ্যস্ত হইবার তেমন সুযোগ নাই। নূতন নূতন বিলাতি ব্যায়াম অতি উৎকট এবং অনেক স্থলে স্ত্রী জাতির অনুপ-যোগী। এক দিকে পাঠ্য পুস্তকের পেষণে শরীর দুর্ব্বল, অপর দিকে রমণী জনোচিত ব্যায়ামের অভাবে শিরো রোগ, চক্ষু রোগ,অজীর্ণ ও অম্বল বালিকাদের নিত্য সম্বল। আমরা বিলাতী উৎকট ব্যায়ামের পক্ষপাতী হইতে পারি না। যে ব্যায়াম শীলতার অঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত করে উহা ভারত মহিলার মহা বৈরী। Dr. Dukes বলিতেছেন—up to the age of puberty the same exercise should be common to both sexes, while after that age the games of girls should gradually merge into exercise of quieter character. কেহই গৃহে গৃহে বাজিকরী ভানুমতি দেখিতে চাহে না। পরিতাপের বিষয়, অনেক অভিভাবক স্ত্রী জাতিকে পুরুষ করিয়া তুলিতে ইচ্ছুক। এক জন পিতা তাঁহার কন্যাকে এক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তিনি শুনিয়া ছিলেন—ঐ বালিকা বিদ্যালয়ে manli-ness শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সংবাদ ঐ বিদ্যালয়ে তাঁহার কন্যা সংস্থাপনের প্রধান আকর্ষণ হইয়াছিল। কন্যা অবলা থাকিবেন না সত্য কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পুরুষছন্দানুবর্ত্তিণী প্রবলা হইবেন না। তিনি সবলা হইবেন, সরলা হইবেন, সুশীলা হইবেন। Lamartine বলেন Nature has said to man —Be a man and to woman—Be a woman and you will become the Devinity of Life.

বালিকাদের শিক্ষার সময় পূর্ব্বাহ্ন হওয়া আবশ্যক। শীত প্রধান ইংলণ্ডে ইহাই ব্যবস্থা। গ্রীষ্ম প্রধান ভারতে এই ব্যবস্থার সমধিক প্রয়োজন। এদেশের মাধ্যাহ্নিক মানসিক শ্রম মারাত্মক। উহাতে শরীরের যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটে অবসর দিন, এবং অধ্যয়ন দিনের শরীর-ধাতুর তারতম্য পরীক্ষা করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সময় সময় যুবতী ছাত্রিগণের অধ্যয়নে বিরতি একান্ত আবশ্যক। বহু ছাত্রীর জীবনে তাহা

রক্ষিত হয় না বলিয়া অনেক মাতাকে আক্ষেপ করিতে শুনা গিয়াছে। Dr. Dukes বলিতেছেন—School mistresses must not fail to recognise the difference of constitution between the boy and girl. Constant application to work from day to day, from week to week, from month to month, should never be enforced on girl; nor should they be allowed to make this efforts. Periodical cessasation and rest should be both encouraged and enforced. তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন বালিকাদিগকে তাহাদের উপযোগী শিক্ষা দিলে the aping of men would disappear in a more dignified respect for the qualities of their own sex. Dr. Dukes স্ত্রীলোকের পুরুষ-ভঙ্গিমা সমর্থন করেন না।

এখানে আহার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ভাব ও চিন্তা মনের খাদ্য। সৎপুস্তক অধ্যয়নে ভাব ও চিন্তা সৎ, অসৎপুস্তক অধ্যয়নে অসৎ হইয়া থাকে। আমরা যাহা আহার করি তাহার দোষ গুণ অনুসারে আমাদের শরীর নষ্ট বা পুষ্ট হয়। এক বিন্দু ভেষজ ঔষধ দ্বারা শরীর ও মনের পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। আহার ভেষজ ঔষধ তুল্য। আহার সাত্বিক না হইলে সংযম থাকে না। অসংযমে শরীর ও মন উভয়েরই অপকার। সর্ব্বাবস্থায় স্ত্রীলোকের সাত্বিক আহার প্রয়োজন। অধ্যয়ন কালে একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার বর্ত্তমান গতি এই। পরিণতি সুমাতা হইবার উদ্দেশ্যে পরিসমাপ্ত হওয়া উচিত। কুমারী-জীবন কাহারও কাহারও পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে কিন্তু উহা নিয়ম নহে ব্যতিক্রম। পুরুষ সমাজে সন্ন্যাসী আছেন। ভারতে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ। বৌদ্ধ সঙ্ঘে থেরিগণ ছিলেন। রোমেন ক্যাথলিক সমাজে বহু Nuns ছিলেন এবং আছেন। পাশ্চাত্য পৌরাণিক যুগে ছিন্ন-দক্ষিণ-স্তনী Amazon সকল ছিলেন। Beautiful maid of Odin—Valkarya সকল ছিলেন। উহা সংসার ধর্ম্মের বাহিরের কথা। উচ্চ শিক্ষার পরীক্ষা বি. এ. এম. এ উচ্চ উপাধি বটে। কিন্তু মহিলাগণের সংসার যাত্রায় যথার্থ পরীক্ষা ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।*

---

* মাঘের সৌরভে বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা প্রস্তাবে এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এখানে দেওয়া হইল না। ১ম প্রকরণে এইটুকু যুক্ত হইয়াছে দেখা গেল :— সৌ, স।

Mark Antonyর অন্যতর স্ত্রী Fulviaর কথা হয়ত মনে আছে। প্রতিহিংসা

১৩। সর্ব্বোচ পরীক্ষা—সুমাতায়। প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারীগণ আপ্ত ইচ্ছায় পতি গ্রহণ করেন। প্রধান পরীক্ষা যৌন নির্ব্বাচনে। এখানে একথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক—Love before marriage is a problem but love after marriage is a theorem. The former is a question the latter a solution and the former a contingency the latter a probability, nay, a sureity. যৌন নির্ব্বাচনে বিলাস ব্যসনে, সান্ধ্য সমিতি বা ভজনালয়ে স্বামী সংগ্রহ জন্য জাল বিস্তারের ব্যবসায় সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। প্রেমে একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠা চিত্তের শুদ্ধি এবং শান্তি বিধান করে। সুখ উদ্দেশ্য হইবে না। উদ্দেশ্য হইবে—সমাজের শান্তি, পরিবার এবং আপনার স্বস্তি ও শুদ্ধি। সুখ এই ত্রিবর্গের অবশ্যম্ভাবী সুফল। এই শান্তি, স্বস্তি এবং শুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যে সন্তানের জন্ম হয় সেই সন্তান পৃথিবীর ভূষণ এবং সমাজের সুদৃঢ় স্তম্ভ। যে যুবতী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন নাই তাঁহার উচ্চ শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় আনুগত্য আবশ্যক। নমনীয়তা ব্যতীত বন্ধন সম্ভবে না। দাসিত্বের কথা বলিতেছি না। স্বাতন্ত্র্য, দাম্পত্য প্রেমের পরিপন্থী। কমনীয়তা ব্যতীত কামিনী হয় না। "যা সৌন্দর্য্য গুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী" বর্ত্তমান সময়ে মনুর আর তেমন মান নাই। মহর্ষি Paul এর কথা অবশ্য প্রতিপাল্য হইতে পারে। এবিষয়ে বাইবেলে উল্লিখিত মহর্ষি পলের পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি।

যৌন নির্ব্বাচনে এবং সুমাতায় স্ত্রীশিক্ষা সার্থক হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী বঙ্গ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির অধিকারিণী হইয়াছেন। গৃহে গৃহে বহু রমণী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও কুমারী। যাঁহারা বিবাহিতা তাঁহাদের সন্তানগণ দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষে কি আদর্শ স্থাপন করেন তদ্বারা উচ্চশিক্ষার সার্থকতা প্রমাণিত হইবে। এখন হইতে এদিকে তথ্য সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কুমার সম্ভবে "অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্যুঃ" "তথাবিধ প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ" সুমাতা এবং দেব সেনাপতি জন্মের ইহাই অব্যর্থ ইতিহাস।

পত্নী [illegible] এই রমা বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সিসিরোর ছিন্ন মুণ্ড আনাইয়া উহার নিস্পন্দ রসনায় এক তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রম ধাতুর কি পাশবিক পরিণতি। সৌ, স।

আনন্দ মোহন কলেজ।

আনন্দ মোহন কলেজ ময়মনসিংহের গৌরবস্থল। এ জেলার শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাসে এই কলেজের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তাই এখানে আমরা এই কলেজের একটু প্রাচীন ইতিহাস পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

১৮৮৩ সনের ১লা জানুয়ারী মহাত্মা আনন্দ মোহন বসুর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ নগরে "ময়মনসিংহ ইনিষ্টিটিউসন" নামে এক উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পর মিঃ আনন্দ মোহন বসুর দায়িত্বে কলিকাতার সিটিকলেজ কাউন্সিল ইহার সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৯০ সনের এপ্রিল হইতে এই স্কুল সিটি কলেজিয়েটস্কুল ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ নামে অভিহিত হইতে থাকে। প্রথম প্রথম স্কুলের আয় হইতে ইহার ব্যয় সঙ্কুলন হইত না। ইহাতে মিঃ বসুকে কয়েক বৎসরে প্রায় ৭।৮ হাজার টাকা প্রদান করিতে হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আনন্দ মোহন বসু ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে "ময়মনসিংহ সভা" ও "আঞ্জমানিয়া ইসলামিয়া" তাঁহাকে এই নগরে একটী কলেজ স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই সিটি কলেজিয়েট স্কুল দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। এই কলেজের কোন মূলধন ছিল না। ছাত্রগণের বেতন হইতেই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ক্রমে স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই কলেজের জন্য একটী স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি করা হয় এবং স্থানীয় সিটি স্কুলের পুরোভাগে কলেজের জন্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়।

ইউনিভার্সিটি রেগুলেসন বিধিবদ্ধ হইবার পর কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ইহার পরিচালন বহুব্যয়-সাধ্য মনে করিয়া চিন্তিত হইয়া পড়েন। রেগুলেসনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য এক লক্ষ টাকা জন সাধারণ ও ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য যত্ন করা হয়। নানাকারণে যত্ন সফল হইতে পারে নাই। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট কলেজ পরিচালন জন্য কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সর্ত্তগুলি সিটি কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

১৯০৭ সনে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর মাননীয় স্যার লেন্সলট হেয়ার এই নগরে উপস্থিত হইলে কলেজের মেনেজিং কমিটী ও
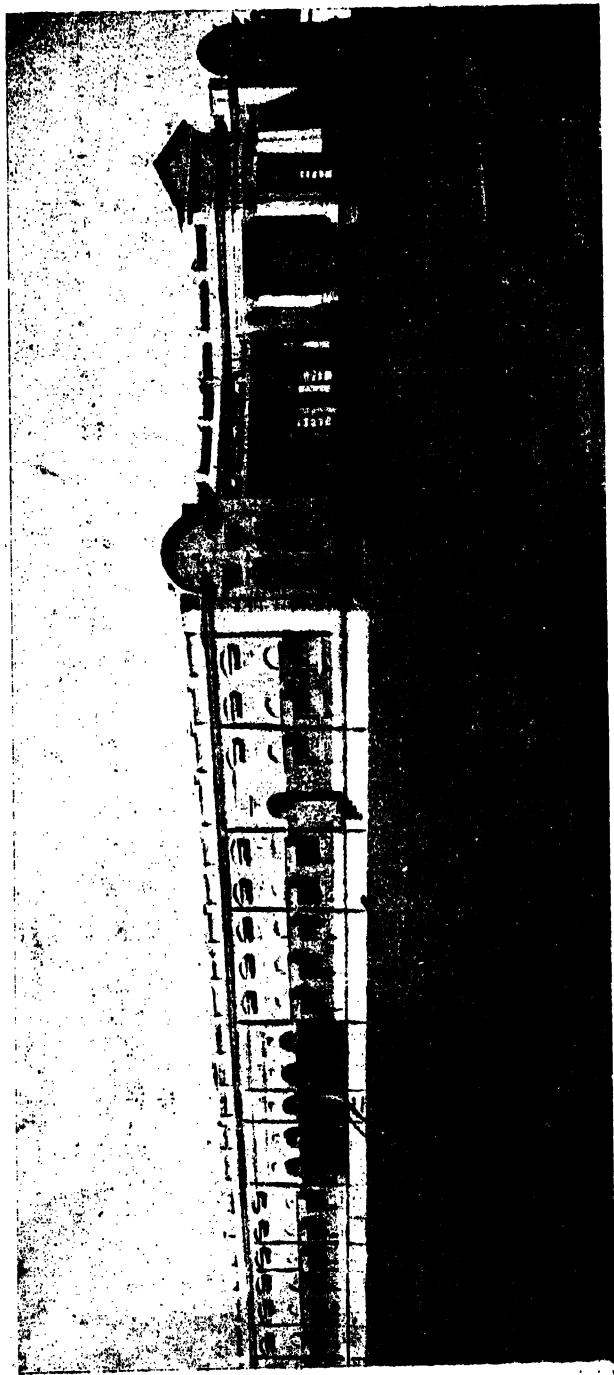
আনন্দ মোহন কলেজ।

শুভার্থিগণ তাঁহার নিকট কলেজের জন্য ৫০ হাজার টাকা প্রার্থনা করিয়া এক নিবেদন পত্র প্রদান করেন। এদিকে নানাবিষয় চিন্তা করিয়া ১৯০৮ সনের মে মাসে সিটি-কলেজ-কাউন্সিল কলেজটী তুলিয়া দেন। ঐ সময় মিঃ ব্ল্যাকউড এ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। এই নগরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই বিষয় লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং কলেজটীকে জীবিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মিঃ ব্ল্যাকউডের যত্নে এই কলেজ পুনর্জীবিত হয় এবং অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে থাকে। রামগোপাল পুরের রাজাবাহাদুর ত্রিশ হাজার টাকা দান অঙ্গীকার করেন। গবর্ণমেণ্টও মাসিক তিন শত টাকা ও ক্রমে ৮২ হাজার টাকা প্রদান করেন। ক্রমে ভূম্যধিকারিগণের দান ১ লক্ষ ২৩ হাজারে পরিণত হয়। নূতন কলেজ ময়মনসিংহ কলেজ নামে অভিহিত হয় এবং উহার কার্য্য পূর্ব্বের কলেজ গৃহেই চলিতে থাকে। উপরোক্ত অর্থে কলেজের নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে কলেজ ঐ গৃহে উঠিয়া যায়।

মিঃ নেথান তখন ঢাকা বিভাগের কমিশনর। কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং রাজা যোগেন্দ্র কিশোরের নির্দ্দেশ অনুসারে ও মিঃ নেথানের সম্মতিতে এই কলেজ "আনন্দ মোহন কলেজ" নামে অভিহিত হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় পূর্ব্বাপর এই কলেজের উন্নতির জন্য সমভাবে যত্ন করিতেছেন। প্রিন্সপাল বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী এই কলেজের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ১৯১০ সনের ২৮শে আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। অক্টোবর মাসে কলেজ নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হয়। পরিতাপের বিষয় তিনি এক দিনের জন্যও এই নূতন গৃহে অধ্যক্ষতা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই কলেজটীকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিবার চেষ্টা হইতেছে। জন সাধারণ ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এক কালীন ২৫ হাজার টাকা ও মাসিক আরো ৫০০ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভরসা আছে আগামী বৎসর এই কলেজে বি, এ, এবং বি, এস, সি শ্রেণী খোলা হইবে।

সাহিত্য সেবক।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ মজুমদার বংশে ১৮৮৮ সনের ৯ই মার্চ্চ অবিনাশ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মজুমদার। অবিনাশ বাবু ১৯০৭ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এ, পাস করিয়া ঢাকা কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তদবধি ঢাকা কলেজেই আছেন। ১৯১২ সনে ইনি বি, এল পাস করিয়াছেন। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের ইনি একজন প্রধান পরিচালক। ঢাকার "প্রতিভা"ও ইঁহারই সম্পাদকতায় পরিচালিত হইতেছে।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায়—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কায়স্থ-পল্লি গ্রামে ১২৮৭ সালে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম—শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায়; অবিনাশ বাবু এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াই বিষয় কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন। ইনি ময়মনসিংহ সারস্বত সম্মিলনে এক প্রবন্ধ লিখিয়া একপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ। ইহার পর তিনি আরতিতে প্রবন্ধ লিখিতেন। এখন—সম্মিলন,তোষিণী,প্রীতি, সৌরভ প্রভৃতি মাসিক পত্রে সময় সময় লিখিয়া থাকেন। ইনি এক সময় ময়মনসিংহ সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীঅমৃত চন্দ্র দত্ত—বঙ্গাব্দ ১২৬১ সালে (১৮৫৪) ৫ই আশ্বিন ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ শ্রীবাড়ী গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন বানাইল। বর্ত্তমান বাসস্থান ময়মনসিংহ ব্রাহ্মপল্লি। পিতার নাম ৺ব্রজ নাথ দত্ত। দত্ত মহাশয় ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পাঠ করেন। এণ্টেন্স পাস করিয়া কলিকাতা জেনারেল এসেম্লিজ ইনিষ্টিটিউসনে এফ, এ, পড়িয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িবার সময় স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় পাঠ পরিত্যাগ করেন।

দত্ত মহাশয় বাল্য কাল হইতেই সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। মাইনার পরীক্ষায় তাঁহার বাঙ্গালা রচনা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গণ্য হওয়ায় পর হইতেই তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৭৭ সনে তিনি ভারত মিহির সংবাদ পত্রের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সন

হইতে তিনি কতিপয় বৎসর উক্ত পত্রের সম্পাদকও ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত সঞ্জীবনী পত্রিকার অন্যতর পরিচালক ছিলেন। ১৮৭৮ হইতে ১৯০৪ সন পর্য্যন্ত ইনি চারুবার্ত্তার সম্পাদক এবং অতঃপর চারুমিহিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদকের কার্য্য করেন।

১৮৭৭ সনে এই সহরে সারস্বত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ সনে অমরবাবু ইহার কোষাধ্যক্ষ হন ও তৎপর কিছুদিন অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি এই সমিতি পরিচালন করেন। ১৮৮৪ সনে ময়মনসিংহ নগরে যে সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইনি উহার একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ছিলেন।

ময়মনসিংহ ইনিষ্টিটিউসন বা সিটিকলেজিয়েট স্কুলের ও তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা। সিটিকলেজ (বর্ত্তমান আনন্দ মোহন কলেজ) প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহাকে অগ্রগণ্য দেখা গিয়াছে। ময়মনসিংহ সিটিস্কুলের তিনি একজন শিক্ষক। অমর বাবু "লহরী" "অরূপা" "হরিবল্লভের স্নেহ" প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছেন। "হাজি মহম্মদ মহসিন" তাঁহার লিখিত জীবন চরিত। সময় সময় তাঁহার প্রবন্ধ সৌরভে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী—মুক্তাগাছার আচার্য্য জমিদার বংশে ১২৯৮ সালে অমরেন্দ্রনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী। ইনি 'আরতি"তে ক্ষুদ্র গল্প লিখিতেন।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বালিগাঁ গ্রামে ১২৯৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ। অমূল্যকৃষ্ণ বি, এ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন, এবং কলিকাতা হইতে পরিচালিত 'প্রীতি' নামক মাসিক পত্রের একজন পরিচালক ও লেখক। 'বিদ্যাসাগর' নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

অধর।

সাগর সেচিয়া জল তোলে বেলা ভূমে
অদ্রিকুল উর্দ্ধে ধায় অশেষ উদ্যমে,
নদ নদী নিরবধি প্রতি দিকে ধায়,
অযুত অযুত চক্ষে নীলাম্বর চায়।

সমীর ভ্রমিছে সদা উন্মত্ত আকার,
সজোরে জলদ দল করে হাহাকার,
প্রকাশে পাদপে গুল্মে সেই আকুলতা।
শাখে থাকি ডাকে পাখী "কোথা তুমি কোথা" ?
ধ্যানে যোগে জ্ঞানে কর্ম্মে মানব নিচয়--
খুঁজিতেছে নিশিদিন হইয়া তন্ময়।
কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূল করিয়ে কল্পনা
হাসে কাঁদে গান করে, করে উপাসনা।
সবেই কহিছে কিন্তু "সে বড় সুন্দর"
যদিও অনাদি কাল হইতে অধর !

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

সাধন তত্ত্বের শেষ কথা ।

কবিবর দান্তে তাঁহার "প্রেতপুরীর" (Inferno) প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, জীবনের মধ্য পথে ঘোর অরণ্যে আমি পথ হারাইলাম ; স্মরণ করিতে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা. মৃত্যু তাহার তুলনায় কিছুই নহে। দান্তের পূর্ব্বে ও পরে অনেক কবি জীবনে এই অবসাদ অনুভব করিয়াছেন। জীবনের এই সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া কেহ—

"মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান
মেঘবরণ তুঝ মেঘ জটাজুট
মৃত্যু অমৃত করে দান"

বলিয়া মৃত্যুকে আশ্রয় করিতে চাহিতেছেন। বৈতরণী পারে দাঁড়াইয়া চিত্তের এই অবস্থা কি ভয়ঙ্কর। কোন কবি জীবনের শেষ মূহূর্ত্তে লিখিয়াছেন "একি চিত্র ভয়ঙ্কর চিত্ত কাঁপে ডরে. আসিলাম বুঝি এবে ভবসিন্ধু পারে"। আবার কেহ

"কে ডাকিছে উচ্চৈঃস্বরে
দ্বার রুদ্ধ অন্ধকারে
পশ্চাতেতে মায়ের ক্রন্দন ॥"

শুনিয়া ঘোর অন্ধকারে আশার বাণী লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছেন।

দান্তের "প্রেতপুরী" অবসদের গান নহে, আশার কাহিনী। তিনি অচিরেই পর্ব্বত শিখরে প্রভাত কিরণ ছটা দেখিতে পাইলেন এবং কবি ভার্জ্জিলের সহায়তায় ঊর্দ্ধলোকে পৌছিলেন, প্রেমের দেবতা বিএট্রিসকে পাইলেন।

বাল্যের আশা ও যৌবনের অতৃপ্ত কামনার অবসানে ব্যর্থ-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন মানুষ গন্তব্য-পথ খুঁজিয়া পায় না, আপনার শক্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। "বাসনা জড়িত" হৃদয় যখন সংসার সাগর-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে অবসন্ন হইয়া জীবনের পরিণতি অনন্ত আঁধারে ডুবিতে যায় তখন তাহার রক্ষার উপায় কি?

"আশার ছলনে ভুলি কি কখন লভিনু হায়!
তাই ভাবি মনে
জীবন প্রবাহ ঐ কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে"?
"রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি
জাগিবি রে কবে?"

মধুসূদনের জীবন প্রবাহ ফিরিলনা, দুঃখ রজনী প্রভাত হইল না।

দান্তে. কবি ভার্জ্জিলের ন্যায় সৎগুরুর আশ্রয়ে নরকপথ অতিক্রম করিয়া স্বর্গের পথে মর্ত্তে ফিরিয়াছিলেন। বহুদিন বিপদ-সঙ্কুল জলপথে ভ্রমণের পর ঘাটে প্রত্যাগত ছিন্নপাল ভগ্নহাল তরণীর ন্যায় তাঁহার জীবন শান্তিক্রোড় লাভ করিয়াছিল।

মানব হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী কোন্ সময়ে কি ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইলে বাজিয়া উঠেবে তাহা কে জানে? ঝঞ্ঝাবাতে নির্ব্বাপিত হৃদয়-কক্ষের স্নিগ্ধ আলো কখন জ্বলিয়া উঠিবে, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি কখন মূলধারে জাগিয়া উঠিবে কে বলিতে পারে? সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি নাই। তাই কবি গাহিতেছেন—

"কোথায় আলো? কোথায় আলো?
বিরহানলে তারে জ্বালো"

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এক সময় নবদ্বীপ ও শ্রীক্ষেত্রে এই বিরহানল জ্বলিয়াছিল। এই বিরহানলে এক সময়ে নিমাইর পাণ্ডিত্ব ও আমিত্ব পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল।

"সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় স্থির ভ্রমে বেড়ায়, তাপিত প্রাণ শীতল হয়, স্থান কোথায় আছে; তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে।

নাহিকো ওর দুখের অন্ত, হয়েছে পথ শ্রান্ত
সদা তার ভ্রান্ত নয়ন ঝুড়তে আছে,
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার
যাবজ্জীবন তাবৎ আছে॥"

এই বিরহানলে দগ্ধ হইয়া ও প্রিয়তমের আসার আশায় বসিয়া থাকাই কি সাধন তত্ত্বের শেষ কথা?

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার